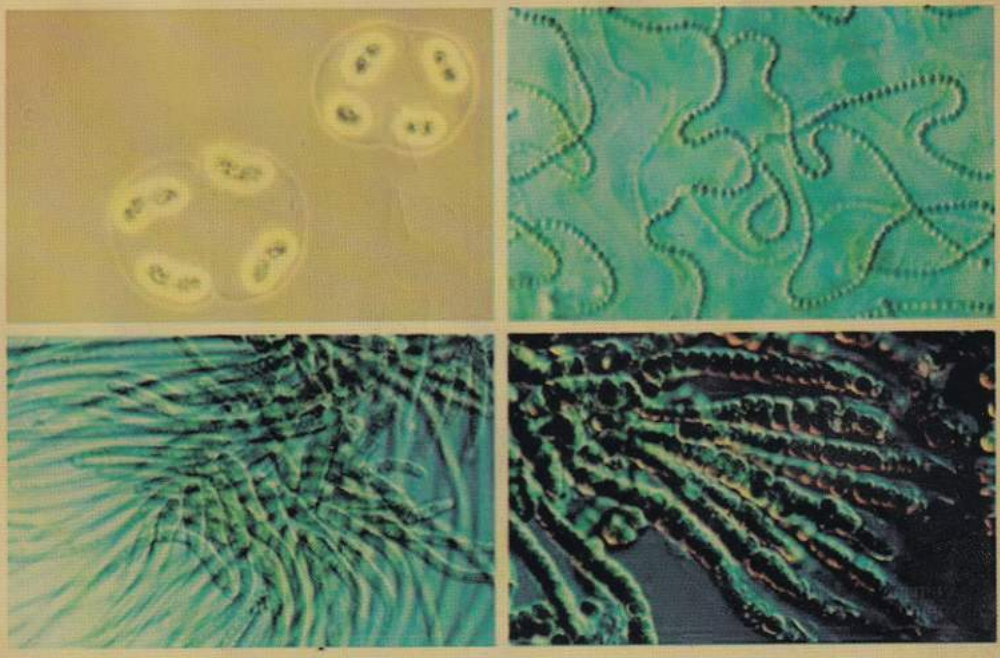
মহাবিশ্বে মানুষ
পুস্তকমালা

চারশত কোটি বছরের পৃথিবী ও প্রাণ

মুহাম্মদ ইব্রাহীম





মহাবিশ্বে মানুষ

পুস্তকমালা

চারশত কোটি বছরের পৃথিবী ও প্রাণ

আধুনিক বিজ্ঞান নিখুত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে পৃথিবীর বয়স হিসাব করে বের করেছে সাড়ে চার শত কোটি বছর, আর প্রাণের উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছে প্রায় চার শত কোটি বছর আগে থেকে। এই পুরো সময়ে পৃথিবী ও প্রাণের ইতিহাস অতি ঘনিষ্ঠভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করেছে। পৃথিবীর শৈশব উল্কা-ধূমকেতুর সঙ্গে অনবরত সংঘর্ষ এবং আবহাওয়ার চরম উথাল পাতালের মধ্যে কাটলেও সে সময়েই তৈরি হয়েছিল প্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র। এখানে প্রথম প্রাণের উন্মেষ ঠিক কীভাবে ঘটেছিল তার পূর্ণ উদ্ঘাটন এখনো বিজ্ঞানীদের দুরূহ গবেষণার অন্তর্গত। কিন্তু এ সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব খাড়া করা ইতোমধ্যে সম্ভব হয়েছে। প্রাণের প্রারম্ভে সরলতম ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে তার দীর্ঘ বিবর্তনে যে বিপুল জীব-বৈচিত্রের সমারোহ দেখা দিয়েছে তাকে এখন আমরা অনেক বেশি নিশ্চয়তা নিয়ে অনুসরণ করতে পারছি। এর কারণ সর্বাধুনিক ডিএনএ ভিত্তিক জেনেটিক উদ্ঘাটনগুলো বিবর্তন প্রক্রিয়াকে অনেক প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছে, যার বিস্তারিত এই বইয়ে আমরা দেখবো। আরো দেখবো পৃথিবীও এর মধ্যে কীরকম ব্যাপক ভাবে বার বার বদলেছে, যা জীবের সমারোহ সৃষ্টি যেমন করেছে তেমনি ঘটিয়েছে বড় বড় জীব বিলুপ্তিরও ঘটনা।

এ সবের পেছনে কার্যকারণগুলো অত্যন্ত চমকপ্রদ, আর এর মধ্যে দিয়ে বুদ্ধির অভিযাত্রায় মানুষের আবির্ভাব হতে পেরেছে এখানে। অথচ আজ আমরাই আবার পৃথিবীর বাসযোগ্যতার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছি, নিজেদের ক্ষমতা ও প্রযুক্তির অপব্যবহারে।

প্রচ্ছদ ॥ মোবারক হোসেন লিটন

পুস্তকমালা

মহাবিশ্বে মানুষ

দ্বিতীয় বই

চারশত কোটি বছরের পৃথিবী ও প্রাণ

মুহাম্মদ ইব্রাহীম



মহাবিশ্বে মানুষ । দ্বিতীয় বই

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১ ।
প্রকাশক : আহমেদ মাহ্‌ফুজুল হক ।
সুবর্ণ । বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (দোতলা) রুম নং ২৩৫ ।
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৭১২২৪১৬ ।
পৃষ্ঠা বিন্যাস : পারফর্ম কম্পিউটার্স, ১০৫ ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০
মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টার্স । ৩৬ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন । স্বত্ব : লেখক ।

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984 70297 0054-9

উৎসর্গ

যাদের সঙ্গে বিজ্ঞান আলোচনা করে সব সময়
অসীম আনন্দ লাভ করেছি,
যাদের অনুসন্ধিৎসু মন ও স্বপ্নভরা চোখ
সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত করে,
যুগে যুগে যারা মহাবিশ্বে মানুষের স্থানটিকে
উজ্জ্বলতর করে তোলার প্রয়াস নিয়েছে, সেই–
তরুণ-তরুণীদেরকে

পুস্তকমালার ভূমিকা

প্রাণিজগতে আমাদের যে প্রজাতি তার বৈজ্ঞানিক নাম নিজেরা দিয়েছি হোমো সেপিয়েন্স অর্থাৎ 'জ্ঞানী মানুষ'। অন্য সব প্রজাতিকে ছাড়িয়ে যে অনন্যতা আমরা লাভ করেছি তার বড় প্রকাশ উচ্চতর চিন্তার ক্ষমতা, এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে মহাবিশ্বকে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করার আগ্রহ ও সক্ষমতা। নিজেদের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে আত্মঅনুসন্ধানও এই উদ্ঘাটন চেষ্টার অন্তর্ভূক্ত। আমরা কারা, কোথা থেকে এসেছি, কেমন করে চিন্তা করি, অন্য সবকিছুর সঙ্গে আমাদের কী রকম সম্পর্ক, ভবিষ্যতে কী সংকট ও কী সম্ভাবনাগুলো আসতে পারে – বিজ্ঞান এ সব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং এখন উত্তরগুলোকে সূক্ষ্মভাবে প্রমাণিত করতে পারছে। সামনে যে তা আরো শাণিত হবে তাও স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। 'মহাবিশ্বে মানুষ' এই পুস্তকমালা এসবকেই সবার জন্য সহজভাবে পরিবেশন করার প্রয়াস নিয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরে লেখক এ বিষয়গুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কিছু বিজ্ঞান-বক্তৃতা দিয়েছেন সর্ব-সাধারণের জন্য। 'সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান' নামের এই বক্তৃতাগুলো প্রতি মাসে ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং চ্যানেল আই কর্তৃক টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়েছে। পুস্তকমালার বইগুলো তার ভিত্তিতেই রচিত। বক্তৃতার সময় তোলা শ্রোতাদের প্রশ্নত্তোরগুলোও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একেবারেই সাম্প্রতিক বিজ্ঞান এসব নিয়ে আমাদের জ্ঞানের সীমান্তটি যেখানে এনে দিয়েছে, সকল জটিলতা সত্ত্বেও তাকেই সহজ ভাষায় উপভোগ্য করার চেষ্টা এতে রয়েছে। মহাবিশ্বের ক্রম বিকাশকে বুঝার ও তাতে আত্মঅনুসন্ধানের কিছু স্বাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ও ধরিত্রীর ভবিষ্যতের স্বার্থে আমাদের জীবন ভঙ্গির অনেক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও এর মধ্যে অনিবার্যভাবে এসেছে। সব মিলে পুস্তকমালাটি আগ্রহী সবার জন্য, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের জন্য, চিন্তার ও আনন্দের খোরাক যোগাবে বলেই বিশ্বাস।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

পুস্তকমালার অন্যান্য বই

মহাবিশ্বের বয়স ও আমাদের মহাজাগতিক শিকড়

আফ্রিকা থেকে জ্ঞানী আমরা

আমরা কী ভাবে চিন্তা করি

জীববৈচিত্র ও আমাদের ভবিষ্যৎ

উদ্ঘাটিত ডিএনএ, উৎসারিত সম্ভাবনা

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন

নূতন আবাস, নূতন পড়শীর খোঁজে

ভূমিকা

এই বইয়ের কাহিনী শুরু পৃথিবীর জন্মের সময় থেকে। মহাবিশ্বের বয়স প্রায় হাজার কোটি বছর পার হবার পর এর বিশাল ব্যাপ্তির খুবই সাধারণ এক কোণে একটি খুবই সাধারণ তারার সঙ্গে জন্ম নিয়েছিল নগণ্য এই গ্রহ। কিন্তু এটিই আমাদের জন্য কালক্রমে সর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এখানে প্রাণের উন্মেষ হয়েছিল এবং সেই প্রাণের বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এখানে আমরা এসেছি। আসলে আমরা আমাদের কাহিনী বলতে চেয়েছি। কিন্তু আমাদের কাহিনীর সম্পূর্ণতার জন্য পৃথিবী ও প্রাণের চারশত কোটি বছরের ইতিহাসকে পরিক্রমণ করা আমাদের জন্য জরুরী। শুধু তাই নয় আমাদের কথা জড়িয়ে আছে পুরো মহাবিশ্বের ইতিহাসের সঙ্গেও, যে কারণে সেটিকেও আমরা যথাসাধ্য পরিক্রমণ করেছি এর আগে। আমাদের আসার পটভূমিটি কী ভাবে তৈরি হয়েছে তা ধারাবাহিক ভাবে দেখতে গিয়ে একটি জিনিস খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হলো পৃথিবীর আর প্রাণের ইতিহাস খুবই ঘনিষ্ঠভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করেছে, এখনো করছে। যেমন আমরা এখানে দেখতে পাবো পৃথিবীর শৈশবের উথাল পাতাল অবস্থা শুরুতে প্রাণের আসাকে কিছু বিলম্বিত করলেও, তা প্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে সহায়ক হয়েছে– প্রয়োজনীয় পানি, বায়ুমণ্ডল, উষ্ণতা, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদির আয়োজনের মধ্য দিয়ে। এর অনেক খানিই ভাগ্যক্রমেই ঘটেছে বলতে হবে– কারণ পরিস্থিতির কিছুটা হেরফেরের জন্য আমাদের প্রতিবেশী শুক্র ও মঙ্গল গ্রহ তেমন প্রাণের উপযুক্ত হতে পারেনি তাও আমরা এখানে দেখবো।

প্রাণের উন্মেষের প্রক্রিয়াটি বিজ্ঞানীদের অত্যন্ত দুরূহ গবেষণার অন্তর্গত– কারণ সেই উন্মেষ কোন সহজ সাক্ষ্য রেখে যায়নি। তা সত্ত্বেও চমকপ্রদ সব পরীক্ষণ ও আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রাণের উন্মেষ প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব খাড়া করা এখন সম্ভব হয়েছে, যা আমরা দেখবো। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে সর্বাধুনিক জেনেটিক বিজ্ঞান। একই ভাবে ক্ষুদ্র এককোষী ব্যাকটেরিয়া হিসেবে প্রাণের শুরু থেকে তার দীর্ঘ বিবর্তনে যে বিপুল জীববৈচিত্রের সমারোহ পরে দেখা দিয়েছে তাকে গত প্রায় দু'শ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা ক্রমাগত নিঁখুত ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে আসছেন। ডিএনএ উদ্ঘাটন ভিত্তিক জেনেটিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কারগুলো এখন সেই বিবর্তন প্রক্রিয়াকে

অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখন অনেক সাক্ষ্যের মধ্যে শুধু সকল জীবের অভিন্ন জেনেটিক কোডের উদাহরণটিও যদি নিই, তার থেকেই স্পষ্ট হতে পারছে যে আদিতে তাদের অভিন্ন পূর্বসূরির মধ্যেই সকল প্রাণের উৎস। এ বইয়ে এই আধুনিকতম আবিষ্কারগুলোর সহায়তায় জীব বিবর্তন প্রক্রিয়ার অনিবার্যতাকে সহজবোধ্য করে তোলার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। তাই বইয়ের অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে জীব বিবর্তনের স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতির কথা।

আর বইয়ের বাকি অংশ জুড়ে রয়েছে পৃথিবী ও প্রাণের ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক ইতিহাস– আমরা হোমো সেপিয়েন্সদের আসা সহ। পরস্পরের সঙ্গে ওতোপ্রোতো ভাবে গ্রথিত পৃথিবী ও প্রাণের এই ইতিহাস খুবই চমকপ্রদ। এর মধ্যে যেমন রয়েছে মাঝে মাঝে বিরাট গণ-বিলুপ্তির মাধ্যমে প্রাণের জন্য সংকটের কালগুলো, আবার তার সঙ্গেই রয়েছে নূতন নূতন বৈচিত্রে নূতন নূতন সম্ভাবনায় প্রাণের ঝলকিয়ে উঠার কাহিনী। এ সবের পেছনে কারণ যুগিয়েছে মহাদেশগুলোর চলাচল, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রচণ্ড দৈব-দুর্বিপাক ইত্যাদির মতো ঘটনা। ঘটনাগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও এই বইয়ের একটি প্রধান উপজীব্য। এর মধ্যে চমকপ্রদ একটি দিক হলো বুদ্ধির ধারাবাহিক অভিযাত্রায় মানুষের আগমন। অবশেষে আমরা দেখবো এ বুদ্ধিকে নিজেদের উন্নয়নে আমরা অবিশ্বাস্য রকম কাজে লাগিয়েছি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সৃষ্টি করেছি পুরো জীব-বৈচিত্রের জন্য এমনকি পুরো পৃথিবীর বাসযোগ্যতার জন্য এমন কিছু বড় হুমকি যা প্রাণের চারশত কোটি বছরের ইতিহাসে অন্য কোন জীব করেনি।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

পৃথিবীর শৈশব ১২
পৃথিবী ও প্রাণের বয়স ২৩
প্রাণের উন্মেষ ৩০ জীবন মানে বিবর্তন ৪৮
বিবর্তনের মূলে জেনেটিক বিবর্তন ৫৬
নূতন নূতন প্রজাতি সৃষ্টি ৭২ বিবর্তনের গতি-প্রকৃতি ৭৯
ক্ষুদ্র জীবন উঠলো মেতে ৮৮
পৃথিবী পৃষ্ঠের চলাচল ১০১
কোটি বছরের দিন ১১১ হঠাৎ প্রাণের ঝলকানি ১১৭
অবশেষে স্থলে জীব ১২৪ বনের যুগে জীব বৈচিত্র ১২৯
ডাইনোসরের রাজত্ব ১৩৬
ফুল ফোটার দিনে মাটিতে আর আকাশে ১৪৪
সেই বিধ্বংসী উল্কা ও তারপর ১৫১
স্তন্যপায়ী ইতিহাস ১৫৮
প্রাইমেট বিকাশে মানুষের পদধ্বনি ১৩৩
মানুষ, পৃথিবী ও প্রাণ ১৭০
প্রশ্নোত্তর ১৭৭

চারশত কোটি বছরের
পৃথিবী ও প্রাণ

পৃথিবীর শৈশব

উথাল পাথালের মধ্যে শিশু পৃথিবী

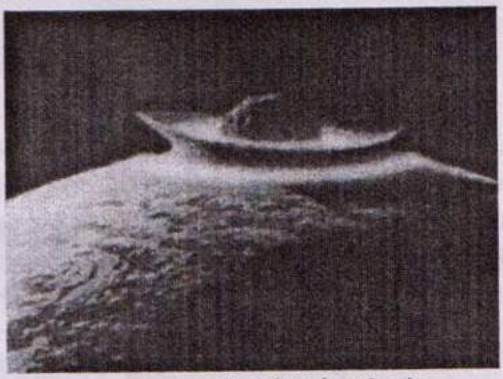
পৃথিবীর জন্ম আদি সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে থাকা 'সংগ্রহ চাকতিতে'। এটি ছিল গ্যাস আর ধুলি-কণার মেঘে গড়া যা দিয়ে এর কেন্দ্রে সূর্য গঠিত হচ্ছিল, আর বাইরের দিকে পৃথিবী সহ সব গ্রহও গঠিত হচ্ছিল। সেখানে ধুলি-কণা ও ছোট বড় ডেলা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে হতে পৃথিবী তার বর্তমান আকার নিয়েছে প্রায় সাড়ে চারশত কোটি বছর আগে। ঐ জন্মকালটি আগাগোড়া কেটেছে পৃথিবীর গঠনকারী এসব উপাদানগুলোর মধ্যে ঠোকাঠুকিতে। তা ছাড়া গঠিত হবার পরও অন্যান্য ছোট বড় বস্তুখণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষ তার হয়েই চলেছিল। এমনকি মঙ্গল গ্রহের আয়তনের একটি তৎকালীন গ্রহের সঙ্গে সংঘর্ষ হবার ফলে এ সময় পৃথিবীর সঙ্গী চাঁদেরও সৃষ্টি হয়েছিল। এরকম সংঘর্ষ পরে কমলেও জন্মের প্রায় একশ' কোটি বছর পর্যন্ত সময় পৃথিবীর কেটেছে নানা রকম চরম ঝড়ঝাপটার মধ্যে। তাই পৃথিবীর শৈশব এক উথাল পাথালের মধ্যে কাটানো শৈশব।

পৃথিবীর সংঘর্ষগুলো হচ্ছিল ছোট বড় নানা উল্কা আর ধূমকেতুর সঙ্গে। উভয়েই সৌরমণ্ডলের নানা ভগ্নাংশে গড়া। এখনো যে সব সময় উল্কা বৃষ্টি হচ্ছেনা বা ধূমকেতু আমাদের কাছে আসছেনা তা নয়। তবে সেদিনের তুলনায় এ কিছুই নয়। বিশেষ করে পৃথিবীর প্রথম ৫০ কোটি বছর অসংখ্য বড় বড় উল্কা আর ধূমকেতু পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার ঘটনায় জর্জরিত ছিল। এর পরের ৫০ কোটি বছরে অবশ্য এরা সংখ্যায় ও আয়তনে ধীরে ধীরে কমে এসেছিল।

ঐ শৈশবে পৃথিবীর আবহাওয়া ছিল প্রায় একটানা ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ। সারাক্ষণ বজ্র বিদ্যুতের গর্জন ও চমকানি, অঝোর বৃষ্টি আর ঝড়। তবে এসব আবহাওয়ার বিষয় থাকলে বায়ুমণ্ডল ও পানি থাকতে হয়। পৃথিবীতে বাতাস আর পানি কোথা থেকে এসেছিলো, আর ঐ শৈশবে এগুলো কী রূপে ছিল? জন্মের সময় ঐ ভয়াবহ সংঘর্ষগুলোর কারণে পৃথিবী খুবই উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল। প্রথমে এসব সংঘর্ষে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ উত্তপ্ত হলেও তাপ পরিবহনে এ উত্তাপ অভ্যন্তরে কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছেছিল। পুরো ভূগোলক তখন এতই উত্তপ্ত যে সব বস্তু গলে গিয়ে ভারী লোহা কেন্দ্রের দিকে আর অপেক্ষাকৃত হালকা সিলিকেট গঠিত শিলা উপরে ভূত্বকের দিকে ভেসে উঠেছিল– আমাদের পরিচিত ব্লাষ্ট ফারনেসে যেমন হয়, লোহা তৈরির সময়। লোহা নিচে যায় আর সিলিকেট গাদ ভেসে উঠে। ব্লাষ্ট ফারনেসের মত অতি উত্তপ্ত অবস্থায় পৃথিবীতে স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডল বা জলভাগ না থাকারই কথা। কিন্তু শীতলতর হবার পর কোন না কোন উৎস থেকে এগুলো

এসেছে। এর জন্য প্রধানত দুটি তত্ত্ব রয়েছে। একটি হলো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত তত্ত্ব। সেই উথাল পাথালের সময় এগুলোর সংখ্যাও ছিল অনেক। অগ্ন্যুৎপাতে নির্গত গ্যাসের মধ্যে কী ছিল তা আজকের পরিস্থিতি থেকে আন্দাজ করা হচ্ছে– ষ্টিমের আকারে জলীয় বাষ্প ৬০%, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ৩০%, বাকি ১০% সালফার-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন। অভ্যন্তরে গলিত বস্তুর সঙ্গে এসব মিশ্রিত ও আটকে ছিল, সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে এসেছে। স্পষ্টত এর থেকে সৃষ্ট বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প আর কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আধিক্যটিই বেশি ছিল। অগ্ন্যুৎপাতের উপর নির্ভরশীল এই তত্ত্বটিতে অবশ্য বর্তমান আগ্নেয়গিরির তথ্য থেকে অতীতের অবস্থা কল্পনা করা হয়েছে, এর কোন সমসাময়িক সাক্ষ্য নাই।

অন্য প্রতিযোগী তত্ত্বটি হলো পৃথিবীর জলভাগ ও বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত আদি পৃথিবীতে ধূমকেতু বাহিত হয়ে। ধুমকেতুর জন্ম সৌরমণ্ডলের বাইরের দিকে শীতল দূরবর্তী জায়গায়। এর কঠিন বস্তুর অনেকখানি গড়া জমাট বরফ ও জমাট কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বরফে। সেই সঙ্গে থাকে যথেষ্ট পরিমাণে জমাট বাঁধা এমোনিয়া যা পরে হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনে পরিণত হয়েছে। ধূমকেতুতে আরো ছিল প্রচুর ফর্মালডিহাইড। পৃথিবীর শৈশবে অসংখ্য বিশালকায় ধূমকেতু যে পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়েছিল তার বহু প্রমাণ রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সমবয়সী চাঁদের দিকে তাকালে ও তার প্রকাণ্ড খাদগুলো দেখলে সেই সাক্ষ্য আমরা সরাসরি দেখতে পাই কারণ চাঁদেও একই ঘটনা ঘটেছিল– উল্কা ও ধূমকেতু সেখানেও আছড়ে পড়ে খাদ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু চাঁদ তার কম মাধ্যাকর্ষণে বাইরের পানি ও বাতাস রক্ষা করতে পারেনি (অবশ্য সাম্প্রতিকতম কিছু পরীক্ষা চাঁদের শিলা গর্ভে বরফের সন্ধান পেয়েছে)। আর পৃথিবীর খাদগুলো ভর্তি হয়ে গেছে ধূমকেতুর আনা পানিতে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা অগ্ন্যুৎপাত তত্ত্ব ও ধূমকেতু তত্ত্ব উভয়টিকে প্রায় সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন ভূপৃষ্ঠের জলভাগ ও বায়ুমণ্ডলের উৎস হিসাবে। মোটামুটি অর্ধেক পানি ও গ্যাস অভ্যন্তর থেকে এবং বাকি অর্ধেক ধূমকেতু বাহিত হয়ে বাহির থেকে এসেছে এটিই এখন মনে করা হয়। ঐ উত্তপ্ত ষ্টীম বা বাষ্প থেকে তরল পানি সৃষ্টি হতে অবশ্য খানিকটা সময় লেগেছে। এটি সম্ভব হয়েছে পৃথিবী-পৃষ্ঠের উত্তাপ যখন পানির স্ফুটনাঙ্কের নিচে নেমে এসেছে ২৩০° সেলসিয়াসে। পানির স্ফুটনাঙ্ক বর্তমানের ১০০° না হয়ে এত বেশি হবার কারণ তখন বায়ুমণ্ডল ছিল অনেক বেশি ঘন ও অনেক পুরু, ফলে তার চাপও ছিল অনেক বেশি– সর্বোচ্চ অবস্থায় আজকের ৩০ গুণ। অধিক চাপে পানির ফুটনাঙ্কও বেশি, যেমনটি প্রেশার কুকারের মধ্যে হয়ে থাকে।



ধূমকেতুর সংঘর্ষে পৃথিবী পৃষ্ঠের পরিবর্তন



প্রথম যুগের নিরন্তর ঝড়ে জলরাশি ও বায়ুমণ্ডল

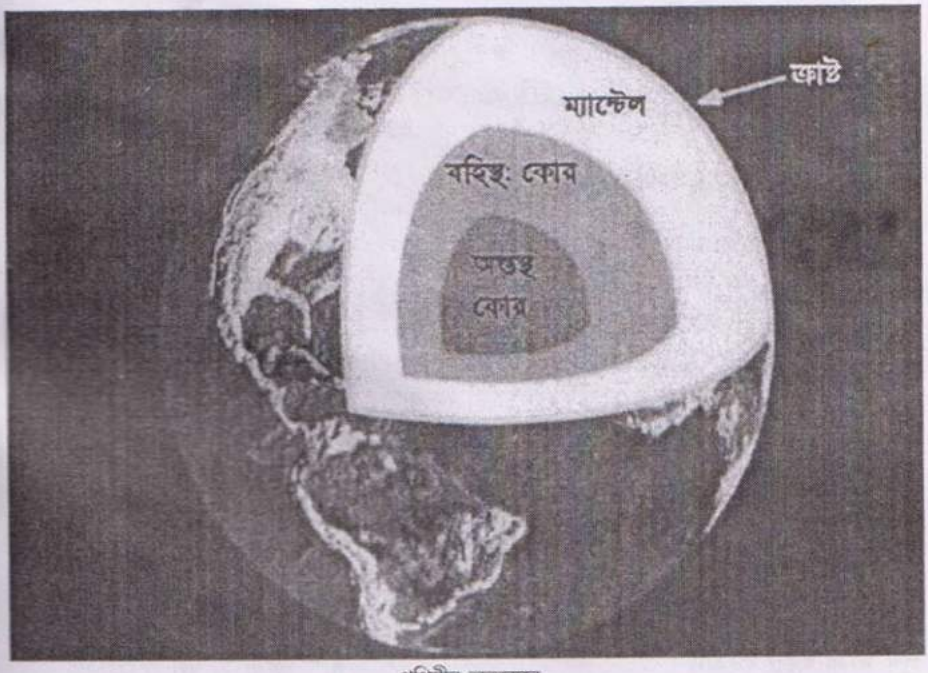
ঐ বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন মোটেই ছিলনা – যে অক্সিজেন আজকে আমাদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ। বায়ুমণ্ডলের সিংহভাগই গড়া ছিল জলীয় বাষ্প আর কার্বন-ডাই-অক্সাইডে। বায়ু চাপ অবশ্য পরে ধীরে ধীরে কমে এসেছে– এখনকার ২০ গুণে, ১০ গুণে, পরে আরো কমে। উত্তাপও কমেছে ভূপৃষ্ঠের। কিন্তু সেদিনের উত্তাপে সমুদ্রের পানি অত্যন্ত গরম, প্রায় ফুটন্ত অবস্থায় ছিল। কাজেই আকাশে মেঘ আর জলীয় বাষ্পের কমতি ছিলনা। তাই বৃষ্টিপাতও ছিল প্রচুর যার অনেকখানিই ছিল কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বদৌলতে এসিড বৃষ্টি। সেই সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ, ঘূর্ণি, ঝড় লেগেই ছিল। আর ছিল ফর্মালডিহাইডের ঘন কুয়াশা। উথাল পাথালের আর একটি উৎস ছিল অতি জোরালো জোয়ার ভাটা। পৃথিবী ও চাঁদ উভয়ের শৈশব কাল সেটি। চাঁদ গঠিত হবার পর পৃথিবী থেকে বেশি দূরে যেতে পারেনি তখনো– এদের পরস্পরের দূরত্ব এখনকার মাত্র এক তৃতীয়াংশ। কাজেই জোয়ারের টান ছিল প্রায় ৩০ গুণ বেশি। প্রতি জোয়ারে উত্তপ্ত পানিতে পৃথিবীর বিশাল অংশ ডুবে যেত, আর আবার ভাটার টানে এ পানি সরে যেত। পানির ফুলে উঠা আর নেমে যাওয়ার এই উথাল পাথালটিও কম ছিলনা।

অভ্যন্তরের অবস্থা

পৃথিবীর বাইরে যখন প্রবল অস্থিরতা চলছে এর ভেতরটা কিন্তু তখন এক ধরনের স্থিতি পাচ্ছে। শুরুতে বাইরের থেকে উত্তাপ গিয়েই ভেতরকে উত্তপ্ত করেছিল, অথচ ভেতরের উত্তাপটিই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে, বাইরেরটি নয়। বায়ুমণ্ডলে তাপ বিকিরণ করে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ ও উপরের অল্প পুরু ত্বক অঞ্চলটি আজকের সাধারণ উত্তাপে চলে এলেও ভেতরটি কিন্তু এখনো প্রচণ্ড উত্তপ্ত। উপরের ত্বকটি একটি তাপ অন্তরক হিসাবে কাজ করাতে ভেতরের বেশি তাপ বাইরে যেতে পারেনি। একটু একটু করে সে কিছু তাপ হারিয়েছে বটে, কিন্তু ভেতরে নানা তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে কণিকা ও শক্তি নির্গত হবার

ফলে উত্তাপ সেখানে বহু কোটি বছরেও তেমন কমতে পারেনি। ভূপৃষ্ঠে থেকে আমাদের পক্ষে বাইরের খবর জানা যত সহজ, পৃথিবীর ভেতরের খবর জানা তা মোটেই নয়। উন্মুক্ত আকাশ পর্যবেক্ষণে আমরা মহাবিশ্বের সুদূর আনাচে কানাচের থেকেও অনেক তথ্য পাচ্ছি– অথচ সে তুলনায় আমাদের নিজের ছোট পৃথিবীটির মাটির নিচে কী হচ্ছে, কী হয়েছিল, তা জানা খুব দুরূহ। আসলে গভীর খনিতে বড় জোর কয়েক কিলোমিটার নিচে নামার বেশি ভূগর্ভের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সরাসরি কোন অভিজ্ঞতা নাই।

তারপরও আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে আমরা মোটামুটি জানতে পেরেছি। এর তিনটি স্তর বেশ সুস্পষ্ট ভাবে পৃথক। একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে 'কোর' বা কেন্দ্রীয় অঞ্চল। এটি আবার দুভাগে বিভক্ত। একেবারে ভেতরে অন্তস্থ কোর, কেন্দ্র বিন্দু থেকে ১৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উপরের জায়গা। এটি অত্যন্ত উত্তপ্ত হলেও উপরের চাপের কারণে কঠিন অবস্থায় আছে। তার উপরের ১৮০০ কিলোমিটার বহিস্থ কোর। এই জায়গাও খুবই উত্তপ্ত, কিন্তু চাপ কম হওয়ার কারণে এটি তরল। আসলে উভয় ক্ষেত্রে উত্তাপ প্রায় ৫০০০০ সেলসিয়াস। উভয়েই ভারী লোহা দিয়ে গড়া। ঐ উত্তাপে লোহা তরল না কঠিন থাকবে তা নির্ভর করে চাপ ও তাপের পরস্পর কমবেশি হবার উপর। কোরের বাইরে যে ম্যান্টল স্তর সেখানে কিন্তু চাপ কম হওয়া সত্ত্বেও একই সঙ্গে তাপও কম বলে তার অধিকাংশ কঠিন। এই স্তরটি সবচেয়ে পুরু– প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার। কিন্তু এর উপরের দিকে ৭৫ কিলোমিটার থেকে ২৫০ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত অল্প পুরু অংশ আধ-গলা চটচটে অবস্থায় রয়েছে। এমনটি হবার কারণ এখানকার ১১০০০ সেলসিয়াস উত্তাপ ও সঠিক চাপের একটি বিশেষ সমন্বয়। এর



পৃথিবীর অভ্যন্তরে

উপরের কঠিন ভূত্বকের নড়াচড়ার সুযোগ করে দিয়েছে এই আধগলন্ত অংশ। এই নড়াচড়াই মহাদেশগুলোকে কোটি কোটি বছর ধরে এক দিক থেকে অন্য দিকে খুব ধীরে চলাচলে রেখেছে– কখনো একত্র করেছে, কখনো আলাদা করেছে। ভূগোলকের সবচেয়ে উপরের এই অংশ ক্রাষ্ট বা ভূত্বক। এটি একেবারেই পাতলা একটি স্তর– গড়পড়তা মাত্র ৪০ কিলোমিটার পুরু তারও আবার ১০ কিলোমিটারের মত অংশ কম সমুদ্রতলে। ভূগোলকের আয়তনের তুলনায় এই ত্বক কমলা লেবুর উপর তার ছিলকার চেয়ে বেশি পুরু নয়। তবুও পুরো পৃথিবীর মধ্যে এটিই কিছুটা আমাদের পরিচিত জগত।

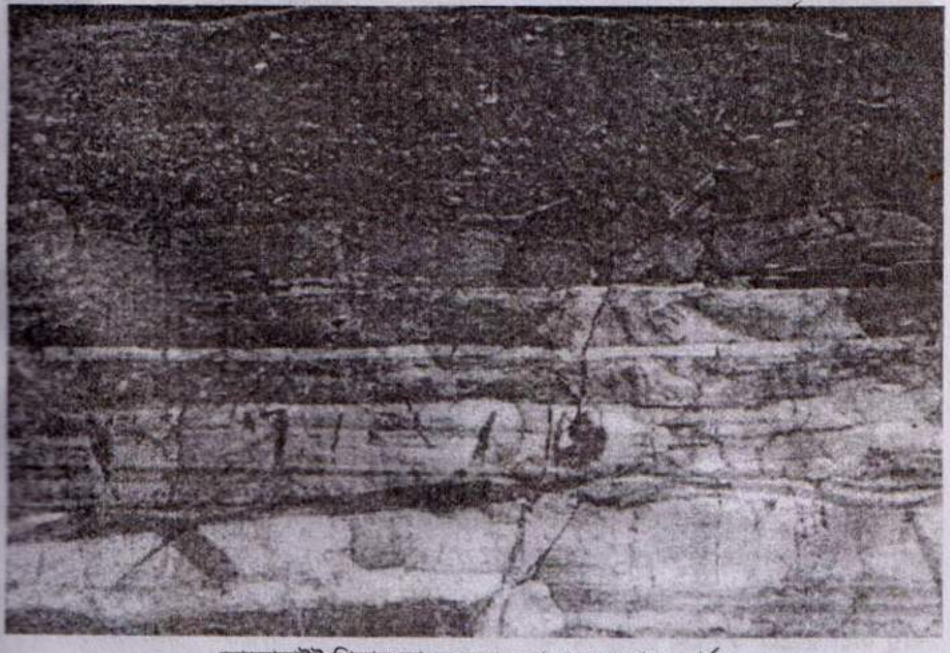
সরাসরি পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের সুযোগ না থাকায় ভূগোলকের অভ্যন্তর সম্পর্কে আমাদের জানার প্রধান উপায় হলো এর মধ্য দিয়ে ভূকম্পন চালনা করা। এ এক রকম শব্দ তরঙ্গের মত। এ তরঙ্গ বিভিন্ন স্তর থেকে প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হয়ে ফিরে আসে। ফিরে আসা তরঙ্গের প্যাটার্ন থেকে বিভিন্ন স্তরের পুরুত্ব, ঘনত্ব, কাঠিন্য কী রকম তা নির্ণয় করা সম্ভব। এখানে কোর, ম্যান্টল, ক্রাষ্ট ইত্যাদি নানা স্তর সম্পর্কে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার অনেকটা তথ্য এভাবেই আমরা জানতে পেরেছি। আলোর ক্ষেত্রে আমরা যে রকম জানি যে এক প্রকার মাধ্যম থেকে অন্য প্রকারের মাধ্যমে প্রবেশ করার সময় মাধ্যম দুটির গুণের তারতম্যের উপর নির্ভর করে আলো প্রতিসরিত বা প্রতিফলিত হয়, এও অনেকটা সে রকম। জটিল তরঙ্গ প্যাটার্নের সূক্ষ্ম পরিমাপের মাধ্যমে তরঙ্গের পথে পড়া এ মাধ্যমগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি।

গ্রীন হাউজের ও এসিড বৃষ্টির আশীর্বাদ

আজ গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার কারণে আমরা খুব উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি। মানুষের সৃষ্ট নানা কারণে বেশ কিছু বছর ধরে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়ছে যা সৌর বিকিরণের তাপকে ভূপৃষ্ঠের কাছে বেশি আটকিয়ে রেখে এর গড়পড়তা উষ্ণতা অল্প অল্প করে ক্রমে বাড়িয়ে তুলেছে– এটিই আমাদের উদ্বেগের কারণ। কিন্তু সুদূর অতীতে আরো তীব্র গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া আরো বহুবার পৃথিবীতে এসেছে এবং এর ভয়াবহ ফলশ্রুতিও ঘটেছে– যেগুলোর জন্য অবশ্য মানুষ দায়ী নয়। তবে পৃথিবীর শৈশবে তীব্র গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল যেটি পৃথিবীর জন্য এবং পরবর্তীতে আমরা সহ সব জীবের জন্য বড় আশীর্বাদই বলতে হবে, কারণ এর ফলেই পৃথিবী জীবনের উপযুক্ত হতে পেরেছিল। আবার আরো সৌভাগ্যের কথা হলো এই গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া যেন লাগাম ছাড়া ভাবে অতিরিক্ত হয়ে গিয়ে হিতে বিপরীত না ঘটাতে পারে, তারও একটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থা পৃথিবীর শৈশবে সৃষ্টি হয়েছিল। সেটি না হলেও পৃথিবীতে জীবন সম্ভব হতো না। সেদিনকার বায়ুমণ্ডল যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্পের ঘন পুরু আবরণ ছিল তা আমরা দেখেছি। এমন অবস্থায় খুবই তীব্র গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়াটিই স্বাভাবিক। এর ফলে পৃথিবী স্বাভাবিক ভাবে যেভাবে দ্রুত তাপ হারিয়ে শীতল হয়ে পড়ার কথা তা হয়নি। এই গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর জলবায়ুকে সেদিনের উত্তাপে ধরে রেখেছিল। মনে রাখতে হবে সেদিন সূর্যের তেজও আজকের তুলনায় কম ছিল। কারণ সূর্যেরও তখন শৈশব– যে শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া তার বিকিরণকে প্রখর করে তোলে তা তখনো পূর্ণ মাত্রা লাভ করেনি। আজকের মাত্র ৭০ শতাংশ উত্তাপ তার সেদিন ছিল। ঐ কম

প্রখর সূর্য তাপে পৃথিবী তাপ পাচ্ছিল কম। একারণেও পৃথিবী খুব দ্রুত তার তাপ হারিয়ে ফেলতো যদি না গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া তখন তীব্র হতো। আর এভাবে তাপ হারালে পৃথিবী অতি শীতল হয়ে প্রাণের অনুপযোগী একটি গ্রহে পরিণত হতো।

তবে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া ক্রমবর্দ্ধমান জিনিস। এটি যদি ওভাবে চলতেই থাকতো তা হলে ধীরে ধীরে পৃথিবীর উপরিভাগ অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে পড়তো। উত্তাপ ক্রমে পানির স্ফুটনাঙ্ক ছাড়িয়ে যেত এবং তরল পানি আর পৃথিবীতে থাকতো না। সে অবস্থায়ও পৃথিবী প্রাণের বসবাসযোগ্য থাকতোনা। হয়তো এতে প্রাণের আবির্ভাবই ঘটতোনা। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তা হয়নি। এর হাত থেকে সেদিন পৃথিবীকে রক্ষা করেছিল যেই জিনিসটি সেটিও আজকের দিনে আমাদের আর একটি বড় উদ্বেগের কারণ– এসিড বৃষ্টি। সেদিন এসিড বৃষ্টিই পৃথিবীকে অতি উত্তপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে। বায়ুমণ্ডলে মেঘের পানির কণায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রচুর দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক এসিডে পরিণত হয়। বৃষ্টির সঙ্গে এই কার্বনিক এসিডের ভূপৃষ্ঠে আসাটাই এসিড বৃষ্টি। পৃথিবীপৃষ্ঠে তখন প্রচুর সিলিকেট শিলা। কার্বনিক এসিডের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এটি তৈরি করেছে এক দিকে সিলিকন-ডাই-অক্সাইড যা বালির উপাদান, অন্যদিকে কার্বনেট যৌগ– প্রধানত ক্যালশিয়াম কার্বনেট অথবা ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট। প্রথমটি চক বা চূণা পাথর রূপে এবং দ্বিতীয়টি ডেলোমাইট শিলা রূপে আজ পৃথিবীতে প্রচুর রয়েছে – সেদিন সিলিকেট থেকে ওভাবে তৈরি হয়ে। এদের অনেকখানি পানির দ্বারা ক্ষয়িত ও বাহিত হয়ে কালক্রমে পাললিক শিলায় পরিণত হয়েছে। আজকের বিপুল পাললিক শিলাই সেদিনের সেই অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং এসিড বৃষ্টির সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাছাড়া এই পাললিক শিলার পরতে পরতেই ঘটতে পেরেছিল আদি প্রাণের বিস্তার। এখন পৃথিবী



ডোলোমাইট শিলায় আবদ্ধ হয়েছে বায়ুমণ্ডলের প্রচুর কার্বন

জোড়া পাললিক শিলার পরিমাণ থেকে সেদিনের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ আন্দাজ করা যাচ্ছে।

এসিড বৃষ্টির কারণে এভাবে আকাশের কার্বন ভূমিতে এসে এখানকার শিলায় আটকা পড়েছে– যার ফলে বায়ু মণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমে গিয়ে একটি মাত্রার মধ্যে ছিল। অবশ্য এ প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড একেবারে কমে গিয়ে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়াকে নগণ্য হয়ে উঠতে দেয়নি সেদিনের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরির অসংখ্য অগ্ন্যুৎপাতের মাধ্যমে শিলায় আটকানো কার্বনের একাংশ আবার

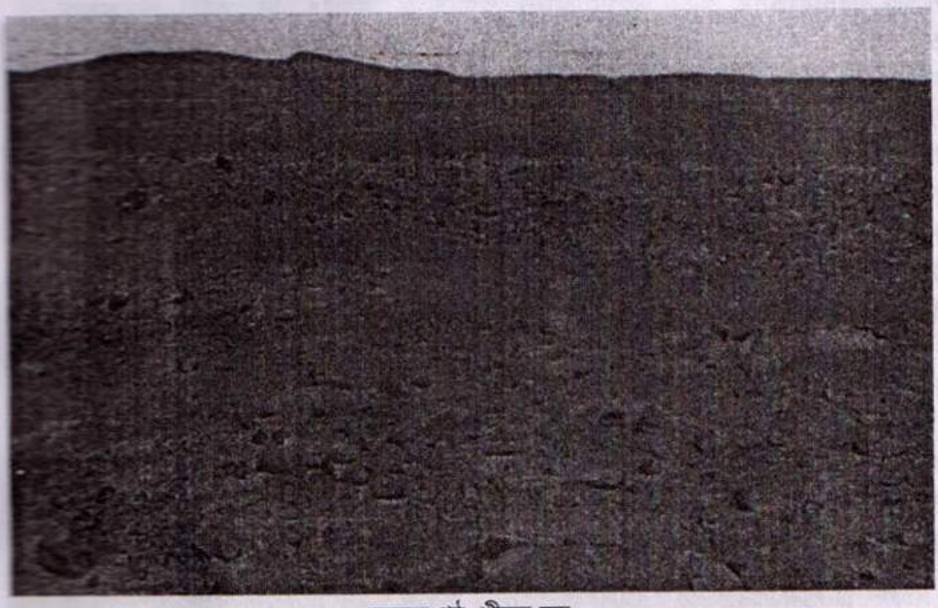


শুক্রের পৃষ্ঠ: তপ্ত মরু

কার্বন-ডাই-অক্সাইড রূপে বায়ুমণ্ডলে ফেরত গেছে। যদি তা না হতো তবে পৃথিবীর শীতল হয়ে পড়ার আশঙ্কাটি আবার ফিরে আসতো। এসিড বৃষ্টির মাধ্যমে সেদিনের গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া সংযত না থাকলে কী ঘটতে পারতো তা শুধু আমাদের তাত্ত্বিক চিন্তার ব্যাপার নয়। চোখের সামনে এর পরিণতি আমরা দেখতে পাচ্ছি শুক্র গ্রহের ক্ষেত্রে।

সূর্য থেকে শুক্রের দূরত্ব অপেক্ষাকৃত কম, তাই এতে সূর্যের তাপ পৃথিবীর থেকে অনেক বেশি। ফলে ঐ গ্রহের উত্তাপ কখনোই পানির স্ফুটনাঙ্কের নিচে নেমে আসতে পারেনি। এর মানে হলো জলীয় বাষ্প সেখানে পানি হিসাবে জমতে পারেনি। সব জলীয় বাষ্প শুক্রের বাতাসেই ছিল, আর ছিল সব কার্বন-ডাই-অক্সাইড। সেখানে তাই গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা পৃথিবীর থেকে বেশি হয়েছে– সূর্যের তাপে ইতোমধ্যে তপ্ত শুক্র গ্রহের উত্তাপ তাতে ক্রমে বেড়েই চলেছে। কিন্তু জলীয় বাষ্প পানি হয়ে জমতে পারেনি বলে এসিড বৃষ্টির মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের কার্বন সেখানে কমতে পারেনি, আটকা পড়তে পারেনি শুক্র পৃষ্ঠের শিলাতে। ফলে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া কমে আসার কোন সুযোগ সেখানে আসেনি। এখনো সেখানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সর্বস্ব বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর বায়ু চাপের ৬০ গুণ বেশি। আর এর পৃষ্ঠদেশের উত্তাপ প্রায় ৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আজ শুক্র গ্রহ সম্পর্কে যে সব গবেষণা চালানো হচ্ছে, মহাশূন্য থেকে এর যে সব তথ্য ও ছবি আমরা পাচ্ছি, সবই দেখিয়েছে যে এই গ্রহটি একটি উত্তপ্ত মরু ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাণ সৃষ্টির কোন সুযোগ সেখানে তাই আসেনি।

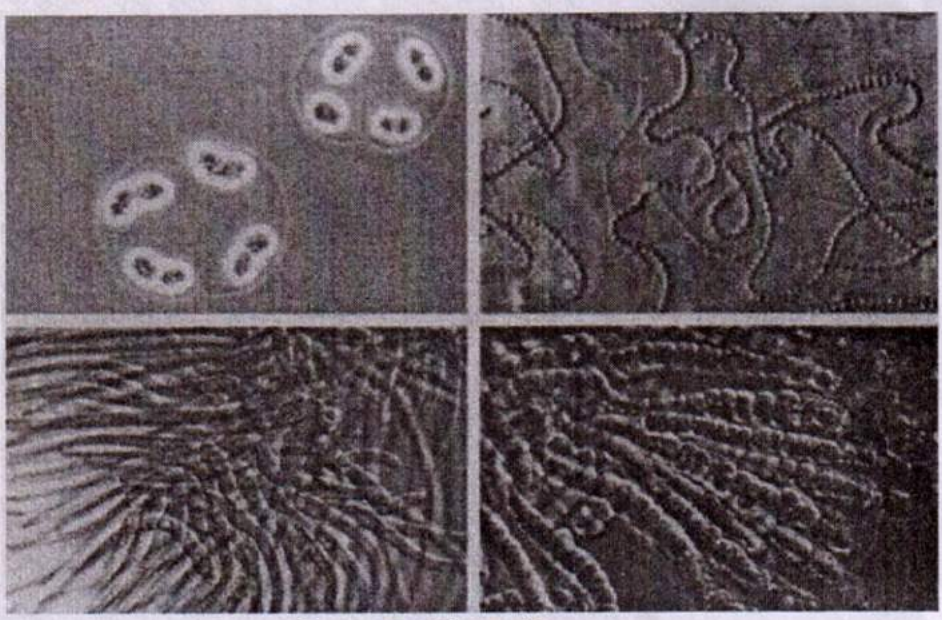


মঙ্গলের পৃষ্ঠঃ শীতল মরু

অন্যদিকে মঙ্গল গ্রহে ঘটেছে এর বিপরীত। এখানেও পৃথিবীর মত গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল, এর ফলে এর পৃষ্ঠের উত্তাপও বেড়েছিল, কাজেই শুরুতে ভালই ছিল এর উত্তাপ। কিন্তু এর আয়তন অনেক ছোট, পৃথিবীর এক দশমাংশের মত। ফলে এর মাধ্যাকর্ষণও অনেক কম। তাই এর বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড এটি ধরে রাখতে পারেনি। এভাবে সেখানে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া দুর্বল হয়ে গেছে, মঙ্গল পৃষ্ঠের উত্তাপ বজায় থাকেনি। গ্রহটি সূর্যের থেকে অপেক্ষাকৃত দূরেও বটে। ওদিকে ছোট বলে এর অভ্যন্তরের উত্তাপও মঙ্গল ধরে রাখতে পারেনি, সবই পরিবাহিত হয়ে হারিয়ে গেছে। ফলে অভ্যন্তর থেকে অগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যে নূতন করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আসবে সেই সুযোগ ছিলনা। দুর্বল থেকে দুর্বলতর গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার কারণে শেষ অবধি মঙ্গল গ্রহ একেবারে শীতল জমে যাওয়া একটি মরুতে পরিণত হয়েছে। ফলে এখানেও আমাদের পরিচিত প্রাণের সুযোগ থাকেনি। শুক্র আর মঙ্গলের অবস্থা চোখের সামনে দেখে আমরা পৃথিবীর ভিন্ন অতীতের জন্য আমাদের সৌভাগ্যটি উপলব্ধি করতে পারি। পৃথিবী সূর্য থেকে সঠিক দূরত্বে সঠিক সাইজে ছিল বলেই গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার আর এসিড বৃষ্টির ভারসাম্যের সুবিধা এটি ভোগ করতে পেরেছে। কাজেই এমন অনুকূল পরিস্থিতি এখানে সৃষ্টি হয়েছিল যে পৃথিবীতে ঘটতে পেরেছিল প্রাণের উন্মেষ।

পৃথিবী ও প্রাণ একে অপরকে বদলিয়েছে

প্রাণের উন্মেষ ঘটেছে পৃথিবীর শৈশবেই সেই উথাল পাথালের দিন না ফুরাতেই। প্রাণের এই উন্মেষ সম্পর্কে যে তত্ত্ব এখন মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত তার কিছুটা বিস্তারিত আমরা পরে



নীলসবুজ ব্যাকটেরিয়া (অনুবীক্ষণে দেখা)

দেখবো। দেখবো প্রাণের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল সমুদ্রের গরম পানির সান্নিধ্যে খুব সম্ভব সমুদ্রতলের খনিজ সমৃদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণের কাছে, কাদার কণার ফাঁকে। পৃথিবীর উত্তপ্ত অবস্থা, ঝড় ঝঞ্ঝা, বজ্র-বিদ্যুৎ অক্সিজেনবিহীন বায়ুমণ্ডল এই সব কিছু – সেদিন প্রাণের উন্মেষের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। এরপর থেকে প্রাণের বিকাশে পৃথিবীর এই সব পরিবেশ বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়েছে। জীবের জন্য অত্যাবশ্যকীয় শক্তি, জৈব পদার্থ সমন্বয়ে পুষ্টিদ্রব্য, অনুকূল আবাস, সবই এসেছে পৃথিবীর পরিবেশ থেকে। সেই পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবেরও বিবর্তন ঘটেছে। এটি বুঝতে আজ আমাদের কষ্ট হয়না। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো পৃথিবী যেরকম প্রাণকে বদলিয়েছে, প্রাণও তেমনি পৃথিবীকে বদলিয়েছে। পৃথিবী ও প্রাণের মেল বন্ধন দ্বিপাক্ষিক, এবং খুবই গভীর।

পৃথিবীর শৈশবে বাতাসে অক্সিজেন ছিলনা এটি নিশ্চিত। এটি আমরা বুঝতে পারি প্রাচীনতম লৌহ শিলার যত নির্দশন আমরা খুঁজে পাই সেগুলোর কোনটি আয়রন অক্সাইড রূপে নয়। কিন্তু পরবর্তীগুলো সব অক্সাইড অবস্থায় পাওয়া যায়। মুক্ত অক্সিজেনের আবহে থাকলে যে কোন ধাতু অক্সাইডে পরিণত হয়– লোহা তো বটেই। কিন্তু সেই প্রথম যুগে বায়ুমণ্ডলে ছিল অক্সাইড করার মত জারণ গ্যাস নয় – বরং বিজারণ গ্যাস (রিডিউসিং) এমোনিয়া, হাইড্রোজেন, মিথেন এবং কার্বন-মনো-অক্সাইড। এক পর্যায়ে অবশ্য কিছু কিছু অক্সিজেন মুক্ত হতে শুরু করেছিল। এটি

এসেছিল পানি থেকে– সূর্যের আলোর ক্রিয়ায় কিছু কিছু পানি বিশ্লিষ্ট হতে থাকে– অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে। এই অল্প অক্সিজেন কিন্তু বাতাসে থাকেনি– পৃথিবীপৃষ্ঠে নানা ধাতব ও অন্যান্য পদার্থকে জারিত (অক্সিডাইজ) করতেই তা ব্যবহৃত হয়ে গেছে। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন এনেছে একেবারে প্রথম যুগের কিছু ব্যাকটেরিয়া নীলসবুজ ব্যাকটেরিয়া। এরা বাতাসের ও পানির কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করেছে সূর্যের আলোর শক্তিতে, যেই সালোক সংশ্লেষণ পরবর্তী কালের উদ্ভিদ জগতে আরো বিস্তৃত হয়েছে। সেই সময় ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা ঘটলেও এত ব্যাপক ভাবে এটি ঘটেছে যে ভূপৃষ্ঠের সব কিছুকে জারিত করেও প্রচুর বাড়তি অক্সিজেন বাতাসে যেতে পেরেছে। সেই প্রথম যুগের চূণাপাথর জাতীয় শিলা ষ্ট্রমাটোলাইটের বহু নমুনা এখনো রয়ে গেছে অগভীর সমুদ্রে। এদের পরতে পরতে সে সময়ের নীলসবুজ ব্যাকটেরিয়ার ফসিল রয়ে গেছে। এসব ফসিলের পরিমাণ ও বয়স নির্ণয় থেকে আমরা অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি সম্পর্কে এক রকম ধারণা পাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর আড়াইশ' কোটি বছর বয়স পর্যন্ত বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ খুবই নগণ্য ছিল, তারপর দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। হয়তো আগে পৃথিবীর সব ধাতব ও অন্যান্য শিলাকে জারিত করে অক্সাইডে পরিণত করতে এবং সব পানিকে অক্সিজেনে সম্পৃক্ত করতে এর দীর্ঘ সময় লেগে গেছে। কিন্তু সব অক্সিজেন এসেছে জীবের কাজের দ্বারাই। প্রাণ না আসলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অক্সিজেন সমৃদ্ধ হতোনা। অন্যদিকে এমোনিয়া ভেঙ্গে বাতাসে নাইট্রোজেন গ্যাস এসেছে। আর এমোনিয়া জাত হাইড্রোজেন হালকা বলে পৃথিবী তা ধরে রাখতে পারেনি বাতাসে।

প্রথম যুগের জীবের জন্য অবশ্য বাতাসের এই অক্সিজেন সুখকর হয়নি। তাদের যে শক্তি সংগ্রহ পদ্ধতি ছিল তাতে অক্সিজেন কোন সাহায্য তো করতই না, বরং এটি ছিল তাদের জন্য ক্ষতিকর বিষের মত। নীলসবুজ ব্যাকটেরিয়া নিজেদের সৃষ্ট অক্সিজেন থেকে রক্ষা পেত এক ধরনের প্রতিরক্ষা এনজাইম সৃষ্টি করে। অন্য অনেক ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনের ফলে ধ্বংস প্রাপ্তও হয়েছে। তার বহু পর আরো বহু বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণি যখন শ্বাস গ্রহণ করে শক্তি তৈরি করতে অভ্যস্ত হয়েছে শুধু তখনই অক্সিজেন জীব-বান্ধব হতে পেরেছে, এবং সে রকম জীবের জন্য অপরিহার্যও হয়ে উঠেছে। যথেষ্ট অক্সিজেন বাতাসে আসার আগে পর্যন্ত জীবন পানিতে সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ স্থলে তখন জীবের জন্য মারণ রশ্মি আলট্রা ভায়োলেট সরাসরি সূর্য থেকে প্রচুর এসে পড়েছিল। সমুদ্রে পানি ভেদ করে বেশি আল্ট্রা ভায়োলেট ঢুকতে পারতনা বলে সেখানে এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা ছিল। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ার পর আলট্রা ভায়োলেটের ক্রিয়ায় তার একাংশ দুই অক্সিজেন পরমাণুর অক্সিজেন গ্যাস হিসাবে না থেকে তিন অক্সিজেন পরমাণুর ওজোন গ্যাস তৈরি করেছে। উর্দ্ধ বায়ুমণ্ডলের এই ওজোন স্তর আলট্রা ভায়োলেটকে শোষণ করে একে ভূপৃষ্ঠে আসতে বাধ সেধেছে। তারপরেই হয়েছে স্থলভাগ জীবনের উপযুক্ত। অন্যদিকে এসিড বৃষ্টির ফলে যে ক্যালশিয়াম কার্বনেট বা চক জাতীয় শিলা তৈরি হতে আমরা দেখেছি সেগুলো আত্মস্থ করে জলভাগে আসতে পেরেছে খোলসওয়ালা প্রাণি। আবার প্রাণির এই চক জাতীয় খোলস থেকেই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর অনেক জায়গার চূণাপাথর জমা দ্বীপ। এভাবে পৃথিবী ও প্রাণ বরাবর একে অন্যকে গড়ে তুলেছে। উভয়ের মিলিত চারশত কোটি বছরের ইতিহাসে এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

এসবের বিস্তারিত আমরা পর্যায়ক্রমে দেখবো। পৃথিবীর সেই শৈশবে প্রাণের উন্মেষ ঘটেছে পৃথিবীতে উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল বলে। আর একবার যখন প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে তখন পৃথিবীর নিজের ইতিহাসেও তা অমোঘভাবে প্রভাব রেখে চলেছে। সূচনা থেকেই পৃথিবী আর প্রাণের ইতিহাস এক সূত্রে গাঁথা।

পৃথিবী ও প্রাণের বয়স

আগেকার ধারণা

পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে মানুষের চিরাচরিত ধারণাগুলো ছিল অদ্ভুত রকমের ভুল। মধ্যযুগের খৃষ্টীয় পুরোহিতদের মত ছিল পৃথিবীর বয়স ছয় হাজার বছর– তাই অন্য অনেকেরও তখন এটিই ছিল বয়স সম্পর্কে ধারণা। এর পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিলনা। আর মানুষের নিজেদের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে তখন জ্ঞান এত কম ছিল যে একেই পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে বেশ স্বাভাবিক মনে করা হতো। কিন্তু সপ্তদশ শতকের দিকে বিজ্ঞানীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে পৃথিবীর বয়স এর চেয়ে অনেক বেশি হতে বাধ্য। এটি বুঝতে পারার কারণ প্রধানত সে সময় ভূতত্ত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ। পলি জমার যে হার তখন বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন তাতে ইতোমধ্যে সৃষ্ট পাললিক শিলাকে ব্যাখ্যা করতে হলে তার জন্য সময় দিতে হবে ছয় হাজার বছরের অনেক অনেক বেশি। অবশ্য কত বেশি সেটি তখনকার মত বুঝা গেলনা।

ভূতত্ত্ববিদরা এসময় লক্ষ্য করলেন যে পাললিক শিলার স্তরে স্তরে নানা প্রাচীন জীবের ফসিল পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই বুঝতে পারলেন ফসিল পাওয়ার স্তর যত নিচে সেই ফসিল তত প্রাচীন। ফসিল স্তরের অবস্থান থেকে স্তরগুলোর তুলনামূলক বয়স সম্পর্কে একটি আন্দাজ পাওয়া গেল। অবশ্য এদের আসল বয়স তখনো জানা গেলনা বলে এতে পৃথিবীর বয়স জানার কোন সুরাহা হলোনা। তবে এইটা ভালভাবেই বুঝা গেল যে পৃথিবীর বয়স ধারণা বহির্ভূতভাবে অনেক বেশি – বহু লক্ষ, এমন কি বহু কোটি বছরেও যা গড়াতে পারে।

অতীতের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা

জীব বিবর্তনের আবিষ্কারক ডারউইন পৃথিবীর বয়স জানার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা চালান। ইংল্যান্ডের উপকূলে সমদ্রের দ্বারা চূণাপাথর ক্ষয় পেতে পেতে যে খাড়া পাড় সৃষ্টি হয়েছে তিনি বছর বছর তার ক্ষয়ের হার লক্ষ্য করেন। তিনি ধরে নিলেন যে অতীতে এই হার সব সময় এ রকমই ছিল। এখান থেকে তিনি বর্তমান অবস্থা সৃষ্টি হবার জন্য যতখানি ক্ষয় প্রয়োজন হয়েছে তা ঘটতে কত বছর লাগতে পারে তার একটি মোটামুটি হিসাব করেন। এতে দাঁড়ায় ৩০ কোটি বছরে। এর ভিত্তিতে ডারউইন বলতে পারলেন পৃথিবী অন্তত ৩০ কোটি বছরের চেয়ে বেশি প্রাচীন।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন পদার্থবিদ্যার তাপীয় তত্ত্ব নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনিও পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন ভিন্ন এক পদ্ধতিতে। তিনি ধরে নিলেন পৃথিবীর শুরুতে এর অভ্যন্তর ভাগ একটি অত্যন্ত উত্তপ্ত ধাতব গোলক ছিল– এবং তা তার পুরো বয়স জুড়ে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। এই আয়তনের একটি ধাতব গোলাক উজ্জ্বল সাদা তপ্ত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হতে যে সময় তাত্ত্বিক হিসাবে লাগার কথা সেটি তিনি হিসেব করে ফেললেন। এতে প্রথম যে ফলাফল পেলেন তা কয়েক লক্ষ বছরের বেশি না হলেও, সব দিক বিবেচনা করে যখন পুনরায় হিসেব করলেন এখন বয়স দাঁড়ালো ৪০ কোটি বছর। কেলভিন ভূগর্ভে গভীর খনির নিচে বিভিন্ন গভীরতায় উত্তাপ মেপে তার থেকে পৃথিবীর শীতল হবার প্রকৃত হারটি বের করেছিলেন। কিন্তু সে সময়েই ভূতত্ত্ববিদরা ফসিলের পরম্পরায় থেকে স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছিলেন যে পৃথিবীর বয়স হিসাবে ৪০ কোটি বছর মোটেই যথেষ্ট নয়। এটি তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন হতে বাধ্য। কেলভিন নিজেও বুঝতে পারলেন এত সাবধানে হিসেব করেও তিনি ঠিক বয়স পাচ্ছেন না। তিনি বড় যে ভুলটি করেছিলেন তা জানার কোন উপায় সেদিন তাঁর ছিলনা। তিনি ধরে নিয়েছিলেন পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ তার পুরো বয়স জুড়ে শুধু শীতলই হয়েছে– তার মধ্যে উত্তপ্ত হবার কোন নূতন কোন উৎস ছিলনা। কিন্তু আধুনিকতর বিজ্ঞান পরে দেখিয়েছে যে ভূগর্ভে বহু তেজস্ক্রিয় পদার্থ রয়েছে যেগুলো থেকে ক্রমাগত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটছে যা ভূগর্ভে নূতন তাপ যোগ করছে। কাজেই আসলে বর্তমান অবস্থায় শীতল হতে লেগে গিয়েছে অনেক বেশি সময়।

আরো একটি পদ্ধতি ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছে পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ের জন্য। সমুদ্রতলে পাললিক শিলা প্রতি বছর কতখানি জমতে পারে এবং সমুদ্র তলে জমা এরকম শিলার পুরুত্ব কতখানি তার থেকে বয়স বের করা হয়েছে। কিন্তু এতেও বয়স যা পাওয়া গেছে তাও খুব অপ্রতুল। পরে অবশ্য বুঝা গেছে এক্ষেত্রে ভুলটা কী হয়েছে। এই পদ্ধতিতে মনে করা হয়েছে যে সমুদ্র তলে শিলা স্তরে পৃথিবীর আদিকাল থেকে যেমনি ছিল তেমনি আছে, শুধু উপর থেকে পলি জমেছে বছর বছর। কিন্তু আসলে সমুদ্র তলে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, এখনো ঘটছে। মহাদেশ ও সমুদ্র তল নিয়ে গড়া এক একটি প্লেইট ক্রমাগত সরে যাচ্ছে, একের সঙ্গে অন্যের সংঘর্ষ হচ্ছে, কোথাও ফুলে উঠছে, কোথাও আবার ভূগর্ভে ঢুকে পড়ছে। কাজেই পাললিক শিলার পুরুত্ব যা পাওয়া গেছে তা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের।

অবশেষে সফল পদ্ধতি– তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়

আজকাল প্রত্নতাত্ত্বিক অনেক নমুনার বয়স নির্ণয়ের জন্য, অথবা কোন নূতন আবিষ্কৃত ফসিলের বয়স নির্ণয়ের জন্য তেজস্ক্রিয় মৌলের অবক্ষয় হার ব্যবহার করাটিই প্রধান পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। এতে তেজস্ক্রিয়তার একটি বৈশিষ্টের সুযোগ নেয়া হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে সব সময় কিছু কণিকা ভেঙ্গে যাচ্ছে যার ফলে তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলো বেরিয়ে আসছে এবং মৌলটি অবক্ষয়িত হয়ে ভিন্ন মৌলে পরিণত হচ্ছে। এভাবে অবক্ষয়িত হওয়াটি যদিও ইতস্তত ভাবে হয়, কিন্তু একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভর কত সময়ে অবক্ষয়িত হয়ে তার অর্ধেক ভরে পরিণত হবে (অবক্ষয়িত অংশ

ভিন্ন পদার্থ হিসাবে থাকবে) তার একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে যাকে বলা হয় অর্ধ আয়ু। পরবর্তী অর্ধ আয়ু সময়ে এটিও আবার অর্ধেক হবে, এভাবে ক্রমে কমতেই থাকবে। এই অর্ধ আয়ু কয়েক মিনিট থেকে শুরু করে কয়েক হাজার বছরও হতে পারে তেজস্ক্রিয় পদার্থটির উপর নির্ভর করে। এভাবেই অবক্ষয়ের হার থেকে কোন জিনিসের বয়স নির্ণয় করা যায়, যদি গোড়াতে ঐ জিনিসে থাকা কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভর এবং এখন সে ভর কতটে এসে ঠেকেছে তা জানা থাকে।

পৃথিবীর সৃষ্টির সময় থেকেই এখানে ইউরেনিয়াম ছিল, কারণ মহাবিশ্বের যে সব বস্তুপুঞ্জ নিয়ে পৃথিবী তৈরি হয়েছে তার মধ্যে ইউরেনিয়াম অন্যতম। তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ক্রমাগত একের পর এক অন্যান্য বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থে পরিণত হতে হতে শেষ পর্যন্ত সাধারণ সীসায় পরিণত হয়। সীসা তেজস্ক্রিয় নয় বলে এর পর আর কোন পরিবর্তন হয়না, সীসা ঐ পরিমাণেই থেকে যায়। ইউরেনিয়ামের দুটি আইসোটোপ রয়েছে যার দুটাই তেজস্ক্রিয়– ইউরেনিয়াম-২৩৫ এবং ইউরেনিয়াম-২৩৮, পারমাণবিক ভর অনুযায়ীই প্রত্যেকের এই নাম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে একই মৌলের একাধিক রূপ থাকতে পারে যাদের ভর একে অন্যের থেকে সামান্য ভিন্ন। তাদেরকে মৌলের আইসোটোপ বলা হয়। ইউরেনিয়াম-২৩৫ শেষ অবধি সীসা-২০৭ এ, এবং ইউরেনিয়াম-২৩৮ সীসা-২০৬ এ পরিণত হয়। প্রথমটি ঘটে দ্বিতীয়টির ৬ গুণ বেশি হারে। সীসার এই দুইটি আইসোটোপ ছাড়াও আরো একটি আইসোটোপ রয়েছে সীসা-২০৪, যেটি বরাবর সীসা হিসাবেই ছিল, কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবক্ষয়ে তৈরি হয়নি। বিশ্বজন্মের সময় সীসা আছে এমন শিলায় একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে সীসার বিভিন্ন আইসোটোপ ছিল অন্যান্য সব জিনিসের সঙ্গে। তারপর যত দিন গিয়েছে ততই ইউরেনিয়াম অবক্ষয়ের ফলে নূতন ভাবে সৃষ্ট আরো সীসা-২০৭ ও সীসা - ২০৬ এর সঙ্গে যোগ হয়েছে। এখন সে সময়ের কোন শিলার মধ্যে আমরা বর্তমানে তিনটি অনুপাত মেপে ফেলতে পারি। ইউরেনিয়াম- ২৩৫ ও সীসা- ২০৭ এর অনুপাত, ইউরেনিয়াম- ২৩৮ ও সীসা- ২০৬ এর অনুপাত, এবং সীসা- ২০৬ এর সঙ্গে সীসা-২০৪ এর অনুপাত (অথবা সীসা- ২০৭ এর সঙ্গে সীসা- ২০৪ এর অনুপাত)। এই অনুপাতগুলোকে এক একটি ঘড়ি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। শুরুর অনুপাত ও বর্তমানের অনুপাত থেকে হিসাব কষে শুরু থেকে এ পর্যন্ত কত ইউরেনিয়াম অবক্ষয়িত হয়েছে তা এবং সেখান থেকে কত সময় অতিবাহিত হয়েছে তা জানা যায়।

যে কোন সাধারণ সীসাতেই তার বিভিন্ন আইসোটোপগুলো একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে। ইতোমধ্যে ঐ সীসা রাসায়নিক পদ্ধতিতে যত রকমে পরিবর্তিত হোকনা কেন এতে এই অনুপাতের কোন রদবদল হয়না– কারণ রাসায়নিক পরিবর্তন বিভিন্ন আইসোটোপকে আলাদা ভাবে প্রভাবিত করেনা, তার জন্য এগুলোর সবই একই সীসা। কাজেই অনুপাতে পরিবর্তন একমাত্র ঘটতে পারে ইউরেনিয়ামের অবক্ষয়ের ফলে। এই অবক্ষয়ের হার চিরকাল একই এবং হারটি আমাদের জানা। বয়স নির্ণয় করতে সমস্যা তাই একটাই– এমন শিলা খুঁজে পাওয়া যার মধ্যে পৃথিবীর জন্মের সময়ের সীসা রয়েছে, অথচ যার মধ্যে কোন ইউরেনিয়াম সেই সময় ছিলনা। মহাবিশ্বের নানা জায়গায় ইউরেনিয়াম ও সীসা যখন সৃষ্টি হচ্ছিল তখন থেকেই সেখানে সাধারণ সীসা- ২০৪ যেমন

ছিল তেমনি ইউরেনিয়াম থেকে অবক্ষয়িত হয়ে সীসা- ২০৬ এবং সীসা- ২০৭ ও তাতে ক্রমে ক্রমে জমেছে। পৃথিবী জন্মের সময় তাই সীসার সবগুলো আইসোটোপ একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে সীসাতে ছিল। তবে গলিত অবস্থা থেকে জমে কঠিন ভূত্বক তৈরির সময় ইউরেনিয়াম থেকে সীসা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই সেই ইউরেনিয়াম-বিচ্ছিন্ন আদিকালের সীসা রয়েছে এমন শিলার খোঁজ করা হলো দুনিয়ার নানা জায়গায়। এমন আদি শিলায় সীসার আইসোটোপ অনুপাতগুলো পরে আর পরিবর্তিত হবার সুযোগ ছিলনা– তার মধ্যেই অবিকৃত পাওয়ার কথা সেদিনের অনুপাতগুলোর।

ভূতত্ত্ববিদরা অতি প্রাচীন শিলা চিনতে পারেন। বিশেষ করে গ্রীনল্যান্ড থেকে খুবই প্রাচীন এমন গ্যালেনা নামক শিলা পাওয়া গেল যেখানে সীসার আইসোটোপগুলোর অনুপাত পরবর্তীকালের শিলার চেয়ে অনেক ভিন্ন, এবং কোন ইউরেনিয়ামও তাতে নাই, আদি কালেও ছিলনা বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এতে মনে করার কারণ ঘটলো যে এটি সেই আদি সীসার কাছাকাছি পরিস্থিতির কিছু। হয়তো বা পৃথিবীর জন্মের সময়েই গ্রীনল্যাণ্ডের ভূত্বকে পৃথক হয়ে আটকা পড়েছে। কাজেই শুরুতে একেই আদি অবস্থা মনে করে হিসাব করা হলো।

আদি অনুপাত না হয় পাওয়া গেল, একে তুলনা করা হবে যার সঙ্গে সেই বর্তমান অনুপাত কোথায় পাওয়া যাবে? এর জন্য উপযুক্ত আধুনিক শিলা মনে করা হলো অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে যে শিলা ভূগর্ভের গলিতাবস্থায় এক সঙ্গে থাকা ইউরেনিয়াম ও সীসা থেকে তৈরি হয়েছে তাকে। পৃথিবীর জন্মকাল থেকে ইউরেনিয়ামের অবক্ষয়ের ফলে আরো অনেক সীসা- ২০৬ এবং সীসা- ২০৭ এখানে যুক্ত হয়েছে, যদিও সীসা- ২০৪ আগের মতই রয়ে গেছে। অতএব অনুপাতের ঐ তিন ঘড়ি থেকে পৃথকভাবে বয়স পাওয়া গেল এবং এর একটি ঘড়ির থেকে পাওয়া বয়স থেকে অন্য ঘড়িতে পাওয়া বয়সকে যাচাইও করে নেয়া গেল। এভাবে পৃথিবীর বয়স পাওয়া গেল ৩৩৫ কোটি বছর।

কিন্তু বিজ্ঞানীদের মনে সন্দেহ রয়েই গেল। ঐ আদি শিলাও হয়তো যথেষ্ট আদি নয়, এবং তাই যদি হয় পৃথিবীর বয়স হবে আরো বেশি। বুঝা গেল ব্যাপারটি ফয়সালা করার একটিই উপায় রয়েছে– পৃথিবীর শুরুর কালের উল্কাপাত থেকে যে শিলা পাওয়া যায় তার মধ্যেই সীসার আদি অনুপাত মাপা। এগুলোতে থাকা সীসা সেই আসল আদি অনুপাত দেবে কারণ যেই মহাজাগতিক বস্তু দিয়ে পৃথিবী গঠিত হচ্ছিল এই উল্কাও মহাবিশ্বের প্রায় একই অঞ্চলে একই বস্তু দিয়ে তৈরি হয়েছে। এরকম উল্কা এখন বিরল হলেও তা খুঁজে বের করা হলো– যার এমন অংশ যেখানে কোন ইউরেনিয়াম ছিল না। ভূত্বকে প্রোথিত এমন উল্কা খণ্ডকে খুব সাবধানে বাইরের বায়ুমুক্ত ল্যাবরেটরীতে নিয়ে সীসা আইসোটোপ অনুপাত মাপা হলো, বাইরের বাতাসে থাকা সীসার সংস্পর্শে এর আদি অনুপাত কিছু বদলে যেতে পারে এই ভয়ে। সতর্কতার সঙ্গে মাপা এই অনুপাতকেই ব্যবহার করা হলো পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ে। এবার বয়স পাওয়া গেল ৪৫৫ কোটি বছর। অবশেষে ১৯৫৩ সালে এভাবে পৃথিবীর বয়স একেবারে নিখুঁত ভাবে নির্ণিত হয়ে গেল। পরে বহুবার আরো বেশি সতর্কতার সঙ্গে এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর বয়স মাপা হয়েছে, সব সময় একই ফলাফলই এসেছে। পৃথিবীর এই বয়সের উপর

বিজ্ঞানীদের আস্থা এতই দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে দূরের গ্যালাক্সিগুলোর সরে যাওয়ার বেগ পরিমাপ করে মহাবিশ্বের বয়স যখন প্রথম নির্ণিত হলো সবাই নিশ্চিন্তে বলতে পারলেন যে তাতে হিসাব ভুল হয়েছে। কারণ তার বয়স পৃথিবীর বয়সের কম হচ্ছে। পৃথিবীর বয়স এতই সুপ্রতিষ্ঠিত যে ভুলটি তার ক্ষেত্রে হতে পারেনা– বরং ভুল ঐ মহাবিশ্বের বয়সে। শিগ্‌গির একথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং মহাবিশ্বের বয়স নূতন ভাবে নির্ণয় করতে হয়েছে। কিন্তু সাড়ে চারশত কোটি বছরের পৃথিবীর বয়স একেবারেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

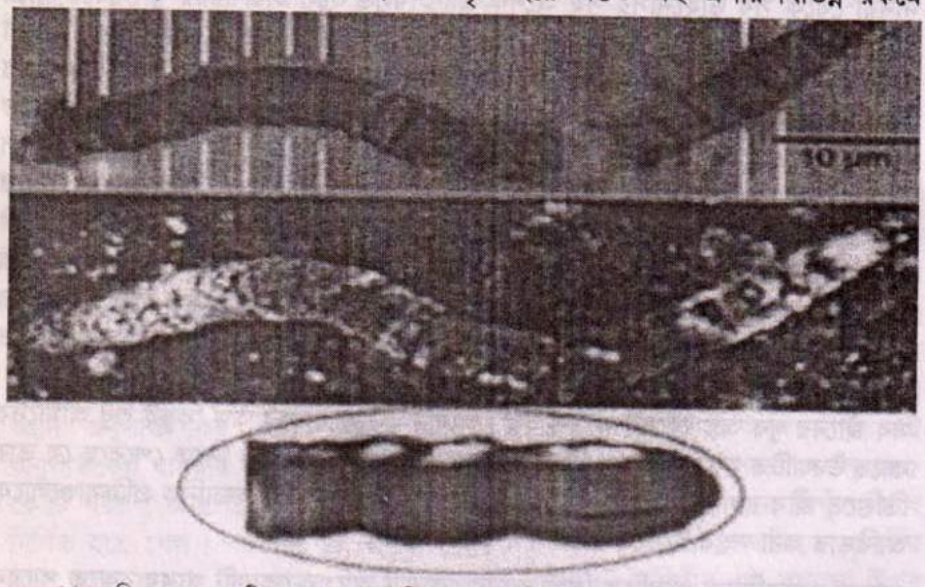
প্রাণের বয়স

অতীত শিলার স্তরে স্তরে উদ্ভিদ আর প্রাণির ফসিল থেকে আমরা জানি পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব অতি প্রাচীন। এসব শিলার এক এক ধরনের স্তরে ফসিলের জীববৈচিত্র এক এক রকমের। যদিও ভূত্বকের পরিবর্তনের ফলে শিলার মধ্যে অনেক ভাঁজ, অনেক উত্থান পতন ঘটেছে– মোটামুটি একই যুগের একই রকম শিলায় একই ধরনের জীববৈচিত্রের ফসিল পাওয়া যায়। যত গভীরের শিলাস্তর ততই প্রাচীন ঐ ফসিল। এগুলো থেকে আমরা এখন জানি পৃথিবীতে সুদূর অতীতে এক এক যুগে এক এক ধরনের জীবের প্রাচুর্য ছিল, যেগুলোর অনেকগুলো বিলুপ্ত হয়েছে, অনেকগুলো আবার পরবর্তী ভিন্ন জীবে বিবর্তিত হয়েছে। ভূতত্ত্ববিদরা শিলাস্তরের প্রাচীনত্বের ভিত্তিতে এক এক যুগের নাম দিয়েছেন, সেই সুবাদে সেই যুগের জীবদেরকেও আমরা সেই নামের ভিত্তিতেই চিহ্নিত করি। এমনিভাবে প্রায় ২০ কোটি বছর আগের জুরাসিক যুগে ছিল পৃথিবীতে ডাইনোসরদের রাজত্ব। সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ক্রেটাশিয়াস যুগের শেষ অবধি তাদের এই প্রাধান্য ছিল। তারপর এক বিশাল উল্কাপাতের প্রতিক্রিয়া হিসাবে সারা দুনিয়া থেকে সব ডাইনোসর সহ অনেক প্রাণি বিলুপ্ত হলে টারশিয়ারি যুগ থেকে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় স্তন্যপায়ীদের প্রাধান্য– যাদের মধ্যে এখন আমরাও রয়েছি। আবার আরো অতীতের দিকে চলে গেলে অনেক অতীতে প্রায় ৫৫ কোটি বছর আগের ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শিলার ভাঁজে আমরা নানা জটিল খোলসযুক্ত বহু বিচিত্র জলজ প্রাণির ফসিল দেখতে পাই। কিন্তু এর কয়েক কোটি বছর পেছনে গেলে আর তেমন চোখে পড়ার মত ফসিল দেখা যায়না। এখন আমরা জানি তখনো বিচিত্র অনেক জীব ছিল, কিন্তু তাদের শরীরে শক্ত এমন কিছু ছিলনা যাতে ফসিলে পরিণত হওয়া সহজ হয়। আসলে সব উদ্ভিদ, প্রাণি বা অন্য জীবের ক্ষেত্রে ফসিলে পরিণত হওয়াটি একটি দৈবাৎ ব্যাপার। অসংখ্য প্রাণির অল্প কিছু নমুনা মাত্র এখানে ওখানে ফসিল হিসাবে হঠাৎ হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের ভিত্তিতেই আমাদেরকে প্রাণের ইতিহাস উদ্ঘাটন করতে হয়েছে। ফসিল সঞ্চিত হতে পারে শুধু পাললিক শিলা স্তরের মধ্যে। এগুলো সব শিলার পনরো শতাংশের বেশি নয়। সব জীবের খুব অল্প অংশই ফসিল হয়। আবার এর মধ্যে খুব অল্প কিছুই শুধু আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়। এই স্বল্প উদ্ঘাটনও এত তথ্য আমাদেরকে দিতে পেরেছে যে তার ভিত্তিতে জীব জগতের প্রায় পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ও তার পেছনের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলোকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে।

যেহেতু ভূতত্ত্ববিদরা পাললিক শিলা স্তরের কোনটি আগের কোনটি পরের বুঝতে পারেন

তাই এদের কোন স্তরে কোন ফসিল পাওয়া গেল সেখান থেকে ঐ জীবগুলোর আপেক্ষিক বয়স সহজে জানা সম্ভব। কোন্ প্রাণি অন্য কোন্ প্রাণির আগে এসেছে সেটি এর থেকে বুঝা যায়। এদের আসল বয়স জানতে হলে আমাদেরকে ঐ শিলাস্তরগুলোর আসল বয়স নির্ণয় করতে হয়। মজার ব্যাপার হলো শিলাস্তরের বয়স থেকে যেমন সেখানকার ফসিলের বয়স নির্ণয় করা যায়, অনেক সময় বিলুপ্ত কী রকম জীবের ফসিল ওখানে রয়েছে তার থেকে শিলাস্তরের বয়সও আন্দাজ করা যায়, যদি অবশ্য জীবটি কোন যুগের সেই তথ্য জানা থাকে। তবে বয়স নির্ণয়ের সব চেয়ে নিখুঁত পদ্ধতি হলো শিলায় থাকা তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবক্ষয় দেখে, যেই পদ্ধতিতে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করা হয়েছে- তার আদিতম শিলার বয়স থেকে, সেই একই রকম পদ্ধতিতে। এভাবেই তার শিলাস্তরের বয়স নির্ণয় করেই আমরা জেনেছি বিভিন্ন যুগের ফসিলের বয়স।

খালি চোখে দেখা যাওয়ার মত ফসিল ক্যাম্ব্রিয়ানের আগের যুগগুলো থেকে তেমন পাওয়া না গেলেও সেখানেও অন্যান্য পরোক্ষ চিহ্ন থেকে জীবের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। অতীতের অনেক আনুবীক্ষনিক জীবের ফসিল মাইক্রোস্কোপের তলায় ধরা পড়েছে। এভাবে সে সময়ের ক্ষুদ্র রেণু এবং অণু-জীবের ফসিল উদ্ঘাটিত হয়েছে। এখন আমরা জানি যে বহুকোষী জটিলতর জীবের বহু আগে বহু কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে ছিল এককোষী ব্যাকটেরিয়া। পৃথিবীর আদি জীব ছিল এই সব ব্যাকটেরিয়া, যার থেকে পরবর্তীতে জটিলতর জীব বিবর্তিত হয়েছে। শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপে এভাবে অনেক প্রাচীন শিলা স্তরেও ব্যাকটেরিয়ার ফসিল ধরা পড়েছে। এ পর্যন্ত প্রাচীনতম ব্যাকটেরিয়া উদ্ঘাটিত হয়েছে অষ্ট্রেলিয়ার কিছু পাললিক শিলা স্তরে যার বয়স সাড়ে তিনশত কোটি বছর। সেখানে প্রায় একই সময়ের এগারটি বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে প্রাণের ইতিহাস এই সাড়ে তিনশত কোটি বছর থেকেও বেশি, কারণ তার আগেই প্রাণ সৃষ্টি হয়ে অন্তত এই এগার বিভিন্ন রকমে



প্রথম ফসিল: ৩৪৭ কোটি বছর আগে অষ্ট্রেলিয়ায় পাওয়া নীল সবুজ ব্যাকটেরিয়া (অণুবীক্ষণে দেখা)

বিবর্তিত হবার সময় পেয়েছে। সরাসরি ফসিল প্রাপ্তির কথা যদি বাদ দিই, তা হলে এ পর্যন্ত প্রাণের প্রাচীনতম পরোক্ষ নমুনা খুঁজে পাওয়া গেছে গ্রীনল্যাণ্ডের ৩৮০ কোটি বছর প্রাচীন পাললিক শিলায়। সাধারণত অজৈব শিলায় কার্বনের দুটি আইসোটোপ কার্বন-১২ এবং কার্বন-১৩ যেই অনুপাতে থাকা দরকার তার তুলনায় সেখানে কার্বন-১২ অনেক বেশি দেখা গেছে। এটি একমাত্র হতে পারে সেখানে জীবের দেহাবশেষ সেই আইসোটোপের উৎস হিসাবে থাকলে। কাজেই পরোক্ষভাবে এখন প্রমাণিত যে পৃথিবীতে প্রাণের বয়স অন্তত ৩৮০ কোটি বছর।

সাধারণভাবে এখন বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে প্রাণের বয়স চারশত কোটি বছরের মত বলে মনে করেন। পৃথিবীর নিজের বয়সই সাড়ে চারশত কোটি বছর। কাজেই পৃথিবী ও প্রাণ মোটের উপর সমবয়সী। পৃথিবীর খুব শৈশবেই এখানে প্রাণের উন্মেষ হয়েছে। সেই থেকে উভয়ের ইতিহাস একেবারে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। সেই যৌথ ইতিহাসের আলোচনা আমাদেরকে শুরু করতে হবে প্রাণের উন্মেষের প্রক্রিয়া জানার চেষ্টার মাধ্যমে।

প্রাণের উন্মেষ

প্রাণ কী?

জড় থেকে জীবকে আলাদা করার বেশ কয়েকটি উপায় রয়েছে– যেমন জীব বৃদ্ধি পায়, নড়াচড়া করে, বংশবৃদ্ধি করে, একত্রে বাস করে ইত্যাদি। এসবের জন্য জীবকে কয়েকটি কাজ আবশ্যিকভাবে করতে পারতে হয়। বাইরে থেকে বস্তু নিয়ে তাকে পরিপাকের মাধ্যমে নিজের দেহে পরিণত করা এর মধ্যে একটি কাজ। তার দেহে এভাবে তৈরি প্রোটিনগুলো নিজেরা প্রসারিত সংকোচিত হয়ে নড়াচড়ার সৃষ্টি করতে পারে। এসবের জন্য যে শক্তি প্রয়োজন তাও জীবকে কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করতে পারতে হবে। তাছাড়া একটি পারিবেশিক ব্যবস্থার মধ্যে (ইকোসিস্টেম) অনেকে মিলে একত্রে থাকাটাও জীবের আর একটি বৈশিষ্ট– যেখানে পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করেই জীবকে থাকতে হয়। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে যে কয়েকটি ন্যূনতম আবশ্যক গুণ জীবকে তার স্বকীয়তা দিয়ে থাকে সেগুলো তিনটি– নিজের প্রতিলিপি তৈরির ক্ষমতা, বিবর্তিত হবার ক্ষমতা, এবং নিজেকে ধারণ করার জন্য একটি আধার তৈরির ক্ষমতা।

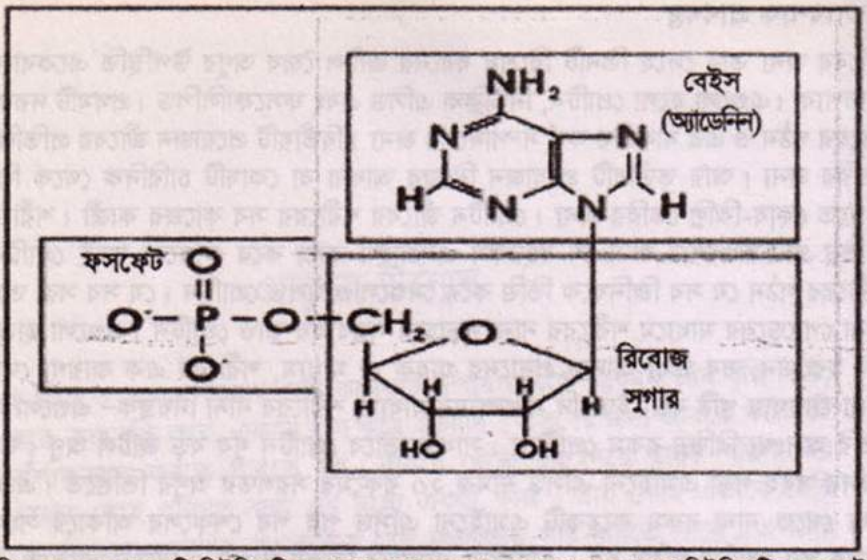
নিজের প্রতিলিপি তৈরির ক্ষমতাই জীবকে বংশবৃদ্ধি করার সুযোগ দেয়। কিন্তু এই প্রতিলিপি খুব সরল প্রকৃতির হলে চলেনা, যেমন একটি ক্ষুদ্র জড় স্ফটিক সঠিক দ্রবণে রাখলে তার থেকে ঠিক তার মতোই আরো স্ফটিক তৈরি হওয়াটি এমনি সরল ব্যাপার। জীবের ক্ষেত্রে যে প্রতিলিপি তার মধ্যে বিবর্তনের সুযোগটিই তাকে অনন্য করে তোলে। অর্থাৎ ঠিক হুবহু প্রতিলিপি তৈরি হবে বটে, কিন্তু তার মধ্যেই সুযোগ থাকবে সামান্য কিছুটা ভিন্নতর হবার। এর ফলে প্রজন্মান্তরে কিছুটা বদলে যাবার একটি সুদূর সম্ভাবনা থাকবে– এটিই বিবর্তন। প্রতিলিপি তৈরি ও বিবর্তিত হবার সুযোগ পাওয়া এই উভয় কাজের জন্যই শক্তির প্রয়োজন, আর প্রয়োজন এ কাজের কাঁচামাল হিসাবে বস্তুর। খোলামেলা পরিবেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে এই শক্তি ও এই বস্তু জীবের পক্ষে প্রয়োজন মত ব্যবহার করা সম্ভব হয়না। তাই প্রয়োজনীয় শক্তি ও বস্তুকে নিজের মধ্যেই নিয়ে আসার সুবিধার্থে জীবের নিজের জন্য একটি আধার দরকার। এটি না থাকলে ওসব শক্তি ও বস্তু বাইরে ছড়িয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। এই আধারটি আসে জীবকোষ রূপে।

প্রথমে দেখা দরকার এই শর্তগুলো পালন করতে হলে জীবের কী ধরনের বস্তু-উপাদান থাকতে হবে। চারশত কোটি বছর আগেও পৃথিবীর শৈশবে এই উপাদানগুলো থাকা প্রাণের উন্মেষের জন্য জরুরী ছিল। এরপর অবশ্য দেখতে হবে জীবকে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেবার জন্য শক্তির উৎস সে সময় ছিল কিনা। তারপরেও অবশ্য প্রশ্ন থাকবে ঐ বস্তু, ঐ শক্তি, গ্রহণ করে জীব হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি তখন সম্ভব ছিল কিনা।

অত্যাবশ্যক প্রাণবস্তু

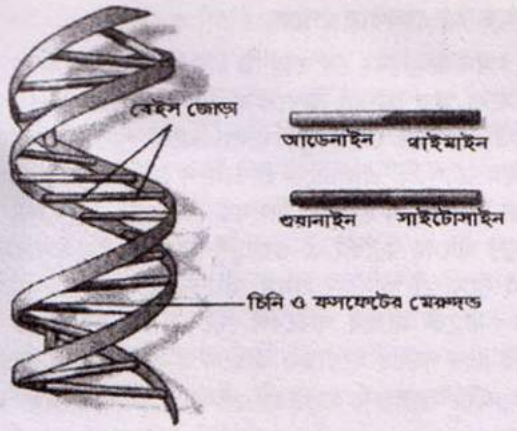
জীবের জন্য তার দেহে তিনটি বিশেষ ধরনের জটিল জৈব অণুর উপস্থিতি একেবারেই আবশ্যক। এগুলো হলো প্রোটিন, নিউক্লিক এসিড এবং ফসফোলিপিড। প্রথমটি দরকার দেহের গঠন ও এর যাবতীয় কর্ম সম্পাদনের জন্য। দ্বিতীয়টি প্রয়োজন জীবের প্রতিলিপি তৈরির জন্য। আর তৃতীয়টি প্রয়োজন নিজের আধার বা কোষটি চারিদিক থেকে ঘিরে রাখতে কোষ-ঝিল্লি তৈরির জন্য। প্রোটিন জীবের শরীরের সব কাজের কাজী। শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলোর জন্য যে বহুরকম এনজাইম কাজ করে সেগুলো সবই প্রোটিন। শরীরের গঠন যে সব জিনিষকে ভিত্তি করে সেগুলোও মূলত প্রোটিন। যে সব সরু তন্তুর টানা পোড়েনের মাধ্যমে শরীরের নানা নড়াচড়া সম্ভব হয় তাও প্রোটিন। এগুলো ছাড়াও সব হরমোন, সব তথ্য আদান প্রদানের গ্রাহক বা মাধ্যম, শরীরের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পুষ্টি বর্জ্য ইত্যাদি সঞ্চালনের মাধ্যম, শরীরের নানা নিয়ন্ত্রক– এগুলো সব তৈরি অসংখ্য বিভিন্ন রকম প্রোটিনে। সাধারণভাবে প্রোটিন খুব বড় জটিল অণু। তবে এদের সবই গড়া এমাইনো এসিড নামক ২০ রকমের সরলতর অণুর ভিত্তিতে। এদের মধ্য থেকে নানা রকম কয়েকটি এমাইনো এসিড পর পর শেকলের আকারে সংলগ্ন হয়েই সব প্রোটিন গঠিত হয়। এমাইনো এসিডের বিভিন্ন সংখ্যা ও বিভিন্ন সমন্বয়ে এক একটি প্রোটিন গঠিত হয়। মূল প্রোটিন অণু শেকলের মত দীর্ঘ হলেও এটি কিন্তু নিজের মধ্যে নিজে নানা ভাঁজ ও গিট্টু খেয়ে বিশেষ বিশেষ আকৃতি নেয়। এই আকৃতি নির্ভর করে এমাইনো এসিডগুলোর পরম্পরায়ের উপর। এক এমাইনো এসিডের বিশেষ বিশেষ অংশের সঙ্গে অন্যটির নানা অংশের বিশেষ আকর্ষণের ফলেই প্রতিটি প্রোটিনের বিশিষ্ট ভাঁজের গঠনটি সৃষ্টি হয়। আর প্রধানত এই ভাঁজের প্রকৃতির কারণেই নানা প্রোটিনের নানা কাজগুলো সম্ভব হয়ে উঠে। মনে রাখতে হবে প্রোটিন অসংখ্য থাকলেও তার উপাদান কিন্তু মাত্র ঐ ২০টি এমাইনো এসিড– যাদের মধ্যে পরস্পর অনেকাংশে মিল রয়েছে।

প্রাণের জন্য দ্বিতীয় অত্যাবশ্যক জিনিসটি হলো নিউক্লিক এসিড – যাকে আমরা ডি এন এ এবং আর এন এ হিসাবেই বেশি চিনি। আসলে ডি এন এ কথাটি ডি অক্সিরিবো-নিউক্লিক এসিড এই পুরো নামের আদ্যাক্ষরে গঠিত। এবং আর এন এ কথাটি রিবো-নিউক্লিক এসিডের এমনি আদ্যাক্ষরে। কাজেই ডি এন এ ও আর এন এ উভয়ে পরস্পর থেকে সামান্য ভিন্ন গঠনের দুই প্রকারের নিউক্লিক এসিড। আধুনিক বিজ্ঞানের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সমূহের একটি হলো এই নিউক্লিক এসিডই যে জীবের প্রতিলিপি তৈরি করার এবং জীবনের নীলনক্সাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে নিয়ে যাওয়ার বাহক তা জানতে পারা, এবং তাদের গঠন উদ্ঘাটনের মাধ্যমে এ কাজের প্রক্রিয়াটি বুঝতে পারা। ডিঅক্সি-রিবোজ এবং রিবোজ হলো খুব কাছাকাছি ধরনের দু'রকমের সুগার (চিনি)। ডি এন এর ক্ষেত্রে ডি-অক্সি-রিবোজ সুগার অণু এবং এক রকম ফসফেট অণুর পরপর সাজানো দীর্ঘ শেকল দিয়ে তৈরি হয় ডি এন এর মেরুদণ্ডটি। ঠিক একইভাবে ফসফেটের সঙ্গে রিবোজ সুগার নিয়ে তৈরি হয় আর এন এর মেরুদণ্ড। শেকলের প্রত্যেকটি ধাপের সুগারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে বেইস নামে পরিচিত একটি অণু– যা চার রকম বিভিন্ন অণুর যে কোন একটি হতে পারে। শেকলের প্রতি ধাপে ঐ চারটি বেইসের যে কোন একটি সংযুক্ত থাকে।



ডিএনএর একক একটি নিউক্লিওটিডঃ পরস্পর শেকলের মত সংলগ্ন অনেকগুলো নিউক্লিওটিডে গড়ে উঠে ডিএনএর একটি সূত্র

এক্ষেত্রে এসে ডি এন এ ও আর এন এর গঠনে কিছু পার্থক্য থাকে। প্রথমে ডি এন এর ক্ষেত্রেই এটি দেখা যাক। ডি এন এর চার রকমের বেইস হলো এডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থাইমিন– সংক্ষেপে A, G, C, ও T। A ও G জীব রসায়নে সুপরিচিত দু'রকম পিউরিন অণু এবং C ও T দু'রকম পিরামিডিন অণু বৈ অন্য কিছু নয়। যে শেকলের কথা বলা হলো ডি এন এ সে রকম দুটি শেকলের বা সূত্রের সমন্বয়ে তৈরি। দীর্ঘ ডি এন এর প্রতিটি সূত্রের প্রতি ধাপে ধাপে এভাবে পর পর থাকে A, G, C ও T এর বিভিন্নটির নানা পরম্পরায়। এই পরম্পরায়ে কোনটির পর কোনটি আছে তাই বলে দেয় জীবের দেহ গঠন ও কাজগুলো কী রকম হবে। এই চার অক্ষরের ভাষাতেই এভাবে রচিত হয় জীবের নীলনক্সার বার্তা। ডি এন এ গড়া পাশাপাশি পরস্পর চারিদিকে পেঁচিয়ে কুণ্ডলি পাকানো এরকম দুটি সূত্রে। দুটি সূত্রের প্রতিটি ধাপে একটি সূত্রের বেইসের সঙ্গে অন্যটির বেইস খুব দুর্বল বন্ধনে জোড়া বেঁধে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি সুন্দর নিয়ম রয়েছে। বেইসগুলোর রাসায়নিক গুণের কারণে A জোড়া বাঁধতে পারে শুধু T এর সঙ্গে, এবং C জোড়া বাঁধতে পারে শুধু G এর সঙ্গে। অর্থাৎ বলতে পারি A ও T পরস্পর সম্পূরক, এবং C ও G পরস্পর সম্পূরক। কাজেই একটি সূত্রে কোথায় কোন্ বেইস আছে জানলে অপর সূত্রে সেই সেই জায়গায় তার সম্পূরকটি থাকবে বলে সেই সূত্রেরও বেইস পরম্পরায় জানা হয়ে যায়। এর মানে দাঁড়াল চার বেইসের ভাষায় লেখা ডিএনএর উভয় সূত্রে জীবের নীলনক্সার একই বার্তাই লিখিত রয়েছে। যদি কুণ্ডলি পাকানো না থাকতো তাহলে আমরা ডি এন এর দুটি সূত্রের মেরুদণ্ড দুটিকে সোজা মইয়ের আকৃতির সিড়ির দুপাশের বাঁশ হিসেবে এবং বেইস জোড়াগুলোকে সেই মইয়ের ধাপ হিসেবে কল্পনা করতে পারতাম। এবার মইটিকে পেঁচিয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে দিলে আমরা পেয়ে যাই ডিএনএর আসল গঠন– কুণ্ডলি পাকানো



দুটি ডিএনএ সূত্রে বেইসজোড়া গুলো

দুই সূত্র– ডাবল হেলিক্স। পদার্থবিদ্যার শক্তিশালী এক্সরে ক্রীষ্টালোগ্রাফি পদ্ধতি এবং রাসায়নিক গুণাগুণের ভিত্তিতে বড় মডেল তৈরির মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে ডি এন এর এই ডাবল হেলিক্স গঠন আবিষ্কার বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই গঠনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল কীভাবে ডি এন এ নিজের প্রতিলিপি তৈরি করে এবং জীবনের নীলনক্সাকে বংশ পরম্পরায়ে নিয়ে যায়।

আর এন এ'র অবশ্য শুধু একটিই সূত্র, ডি এন এর মত দুটি নয়। এর সুগার-ফসফেট মেরুদণ্ডের সুগারটি কিছুটা ভিন্ন সেটি আগেই দেখেছি। এছাড়া তার তিনটি বেইস ডি এন এর মত A, G, ও C থাকলেও চতুর্থটি কিন্তু T এর বদলে অন্য একটি বেইস ইউরেসিল, সংক্ষেপে U। তবে T এর মত Uও A এর সঙ্গেই জোড় বাঁধে। এইটুকু পার্থক্য ছাড়া আর এন এর গঠন ডি এন এর মতই– অবশ্য ডি এন এর একটি সূত্রের মত। তবে উভয়ের কার্যক্রম কিছুটা ভিন্ন। ডি এন এ নীলনক্সার ধারক ও বাহক। আমরা দেখবো কীভাবে একটি ডি এন এ নিজের প্রতিলিপি তৈরি করে নূতন নূতন কোষে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মে একই নীলনক্সা নিয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে আর এন এর কাজ হলো ডি এন এর নীলনক্সার বার্তাকে কার্যকর করা– অর্থাৎ সেই বার্তা অনুযায়ী প্রোটিন তৈরি করা, যে সব প্রোটিন বাকি সব কাজ করবে। কী ভাবে আর এন এ সেটি করে তা আমরা একটু পরে দেখবো।

জীবের জন্য অত্যাবশ্যক তিনটি বস্তুর মধ্যে তৃতীয়টি হলে কোষ ঝিল্লি তৈরির মতো ফসফোলিপিড, এক ধরনের চর্বি। এই ঝিল্লির বৈশিষ্ট হলো এটি জীবের কোষকে পরিবেশ থেকে আলাদা করে সীমাবদ্ধ ছোট জায়গায় তার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বস্তুগুলো ও শক্তিকে কেন্দ্রীভূত রাখতে পারে। অন্যদিকে এটি এই বস্তু ও শক্তি বাইরে থেকে কোষে আসার সুযোগও করে দিতে পারে, এবং বর্জ্য বের করে দিতে পারে। কাজেই ঝিল্লিকে একাধারে অপ্রবেশ্য যেমন হতে হয় তেমনি প্রবেশ্যও হতে হয়– বিশেষ বিশেষ বস্তু আসা যাওয়ার জন্য। চর্বি জাতীয় বস্তু ফসফোলিপিডের গড়া ঝিল্লির বিশেষ গঠনের মাধ্যমেই এটি সম্ভব হয়।

প্রথম জীব এসব বস্তু কোথায় পেলো

যে কোন জীব যখন জন্ম নেয় সে তার ডি এন এ ও প্রাথমিক প্রোটিন পায় তার পূর্বসূরি থেকে (যেমন বাবা-মার শুক্র ও ডিম্বকোষ থেকে)। এভাবে পাওয়া ডি এন এ নীলনক্সা অনুযায়ী পরবর্তী প্রোটিন তৈরি হয় খাদ্য থেকে পাওয়া কাঁচামাল থেকে। প্রোটিনই আবার এনজাইম রূপে ডি এন একে প্রতিলিপি তৈরি করতে এবং আরো প্রোটিন তৈরি করতে সহায়তা করে। একই ভাবে নীলনক্সা অনুযায়ী কোষ ঝিল্লিও তৈরি হয়। এভাবে প্রত্যেক প্রজন্মের জীবের কাছেই ঐ গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বস্তু উপাদান প্রারম্ভিকভাবে পৌঁছে যায়। কিন্তু এই সুযোগটি দুনিয়ার প্রথম জীবের ছিলনা। সে আগের জীব থেকে এগুলো পেতে পারেনি। তাকে অজৈব পরিবেশ থেকেই এগুলো পেতে হয়েছে, আগের কোন নীলনক্সা ছাড়াই প্রাণ গড়তে হয়েছে। তাহলে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো পৃথিবীর শৈশবে প্রাণের শুরুতে এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটি কীভাবে সম্ভব হয়েছিল? অর্থাৎ প্রাণের উন্মেষ কীভাবে হলো?

এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেবার সুযোগ আমাদের নাই– কারণ পৃথিবীর সেই আদি প্রাণ কোন চিহ্ন রেখে যায়নি আমাদের জন্য। তবে বিজ্ঞানীদের নানা পরীক্ষা ল্যাবোরেটরীতে প্রমাণ করেছে যে পৃথিবীর সেই আদি পরিস্থিতিতে প্রাণের আবশ্যকীয় উপাদানগুলো একত্র হতে পারাটা সম্ভব ছিল। রসায়নবিদরা দেখিয়েছেন যে প্রাণিদেহের বাইরে ল্যাবোরেটরীতে ঐ গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগুলোর সংশ্লেষণ সম্ভব। শুধু তাই নয় তাঁরা দেখিয়েছেন যে পৃথিবীর ঐ শৈশবের দিনগুলোর যে রকম পরিস্থিতির কথা এখন মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত, সে রকম পরিস্থিতি ল্যাবোরেটরীতে পরীক্ষণ পাত্রের মধ্যে সৃষ্টি করলে সেখানে এর কোন কোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়ে যায়। অর্থাৎ এটি প্রমাণ করছে যে সেদিনের পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে এভাবেই এগুলো তৈরি হয়ে প্রাণ সৃষ্টির আবশ্যক বস্তুগুলির উপাদান অন্তত যোগান দিতে পেরেছিল।

এ ধরনের গবেষণায় প্রথম নাটকীয় সাফল্য এসেছিল ১৯৫৩ সালে বিজ্ঞানী মিলারের বিখ্যাত পরীক্ষায়। তিনি একটি কাচের ফ্লাস্কে মিথেন, হাইড্রোজেন, এমোনিয়া এমনি কিছু গ্যাস নিয়েছিলেন যেন তা পৃথিবীর শৈশব দিনের বায়ুমণ্ডলকে অনুকরণ করেছে। আর একটি ফ্লাস্কে অনবরত পানি ফুটিয়ে তার বাষ্প চালনা করা হয়েছে ঐ গ্যাস ভর্তি ফ্লাস্কের ভেতর দিয়ে, যে বাষ্প একটি U আকৃতির সংগ্রহ ফাঁদের ভেতর হয়ে আবার ফুটন্ত পানির ফ্লাস্কে ফিরে আসে। কাজেই সেদিনের বায়ুমণ্ডলের অনুকরণে ফ্লাস্কে যথারীতি বাষ্পও যোগ হয়েছে। এই অবস্থায় ঐ ফ্লাস্কে থাকা দুটি ইলেকট্রোডের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ডিসচার্জ বা স্ফুলিঙ্গ চালনা করা হয়েছে বার বার– ঐ কালের আকাশে ঘন ঘন বিজলির অনুকরণে। এক সপ্তাহ অনবরত এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবার পর U আকৃতির সেই সংগ্রহ ফাঁদের মধ্যে কী কী জমেছে তার রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে সেখানে জলীয় দ্রবণে সৃষ্টি হয়েছে নানা রকম জৈব পদার্থ– ফ্লাস্কের ঐ গ্যাসগুলো ও বাষ্পের পরস্পরের সঙ্গে নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ায়। অবাক বিস্ময়ে মিলার লক্ষ্য করলেন জমা ঐ বস্তুগুলোর মধ্যে আছে সাতটি এমাইনো এসিড– প্রোটিন তৈরির ঐ ২০টি এমাইনো এসিডের মধ্যে সাতটি। এগুলো সৃষ্টিতে অন্তর্বর্তী বস্তু ছিল হাইড্রোসায়ানিক এসিড ও ফর্মালডিহাইড, যেগুলো প্রাচীন পৃথিবীতেও তৈরি হতো বলে

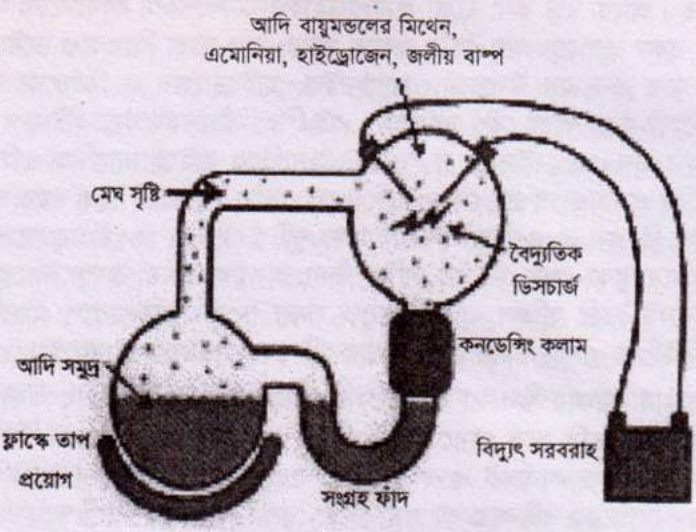
প্রমাণ রয়েছে। আরো বড় কথা হলো ফর্মালডিহাইড ক্যালশিয়াম কার্বনেটের সহায়তায় বেশ কয়েক রকম সুগারের অণু তৈরি করতে পারে, যার মধ্যে রিবোজও রয়েছে। সেই রিবোজ যা আর এন এর উপাদান। সায়ানাইড, হাইড্রোজেন ও মিথেনের বিক্রিয়ায় পিরামিডিন তৈরি হতে পারে বেশ সহজেই। এই পিরামিডিনেরই কয়েকটি রূপ হলো ডি এন এ ও আর এন এর বেইস C, T, ও U। অন্যদিকে হাইড্রোসায়ানিক এসিড থেকে পিউরিন তৈরির প্রমাণও পাওয়া গেছে, যদিও সে ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি তত সহজ নয়। এই পিউরিন হলো ডি এন এ ও আর এন এর অন্য দুটি বেইস A ও G এর সঙ্গে অভিন্ন। এসবের মাধ্যমে বুঝা গেল জীবের সৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলো সেদিন প্রাকৃতিক ভাবেই তৈরি হচ্ছিল, এবং উপযুক্ত সময় ও পরিস্থিতি পেলে এগুলো থেকে প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড তৈরি হবার সম্ভাবনাটি বেশ স্পষ্টভাবেই থাকে।

আর যে উপাদান দরকার ছিল তা হলো ফসফোলিপিড যা থেকে তৃতীয় অত্যাবশ্যকীয় জিনিস কোষঝিল্লি তৈরি হতে পারতো। মিলারের পরীক্ষায় এরও প্রয়োজনীয় উপাদান খুঁজে পাওয়া গেছে যা কার্বনেট ও ফসফেট খনিজের সঙ্গে মিলে ফসফোলিপিড গঠন করতে পারে। মিলারের পরীক্ষার পর পর আরো বেশ কিছু অনুরূপ পরীক্ষায় আরো ভাল ফল পাওয়া গেছে। যেমন ফ্লাস্কে এমোনিয়ার বদলে নাইট্রোজেন এবং মিথেনের বদলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও কার্বন-মনোক্সাইড নিয়ে, এবং বৈদ্যুতিক ডিসচার্জ চালনার বদলে কড়া আলট্রা ভায়োলেট বিকিরণ ঘটিয়ে একটি পরীক্ষা করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিও পৃথিবীর শৈশবে ছিল বলে মনে করা হয়। এক্ষেত্রে ফলাফলে এমাইনো এসিড সাতটির বদলে বারটি পাওয়া গেল। কাজেই প্রাণ আসার জন্য অন্তত বস্তুগত পরিবেশ সেদিন যে প্রস্তুত ছিল এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

প্রথম জীবের শক্তি-উৎস

প্রথম প্রাণের সৃষ্টিতে বস্তু-উৎসের মত উপযুক্ত শক্তি-উৎসও প্রয়োজন ছিল। এক্ষেত্রেও সমস্যাটি প্রধানত প্রথম হওয়ার মধ্যেই। সাধারণত জীবের শক্তির উৎস আসে কয়েকটি বিকল্প পদ্ধতিতে। যে সব জীব সালোক সংশ্লেষণ করতে পারে তাদের শক্তির উৎস সূর্যের আলো – যেমন উদ্ভিদ কিংবা নীল সবুজ আলজির ক্ষেত্রে। আবার অন্য জীব নির্ভর করে একে অপরের উপর যেমন প্রাণি উদ্ভিদ বা অন্য জীব খেয়ে সে খাদ্য থেকে রাসায়নিক শক্তি আহরণ করে। আরো একটি পদ্ধতিতে অবশ্য কোন কোন ক্ষুদ্র জীব শক্তি আহরণ করে, তা হলো সরাসরি অজৈব বস্তু থেকে রাসায়নিক ভাবে, যেমন কোন কোন ব্যাকটেরিয়া হাইড্রোজেন সালফাইডকে অক্সিডাইজ করে তার থেকে উদ্ভূত শক্তি আহরণ করে।

উপরে তিনটি পদ্ধতির প্রথম দুটির সুযোগ আদিতম জীবের ছিল না। কারণ সালোক সংশ্লেষণ অথবা খাদ্য পরিপাক করতে হলে তাকে আগে জীব হতে হবে। কাজেই প্রথম জীবের কাছে শক্তি সংগ্রহের একটি রাস্তাই খোলা ছিল– তা হলো অজৈব বস্তু থেকে তা পাওয়া। মিলারের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে পৃথিবীর আদি অবস্থার মতো পরিস্থিতিতে সাধারণ অজৈব বস্তু থেকে বহু রকম অর্গানিক রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হচ্ছিল। খুব সম্ভব সেই সময়ের সমুদ্র এমনি সব বস্তুতে ভর্তি ছিল। এসব থেকে শক্তি আহরণ সম্ভব হবার



প্রাণের আদি বস্তুগুলোর সংশ্লেষণঃ
ল্যাবোরেটরিতে পৃথিবীর শৈশবাবস্থা অনুকরণ

কথা। প্রথম জীবের শক্তি উৎস সম্পর্কে একটি সম্ভাবনা হলো সমুদ্র তলের উষ্ণ প্রস্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইডের প্রাকৃতিক অক্সিডেশনের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন। প্রথম ক্ষুদ্র জীবের কোষের পক্ষে ঐ উষ্ণ প্রস্রবণের আশেপাশে গড়ে উঠা স্বাভাবিক ছিল। প্রথম জীবের আর একটি চিত্র-কল্প হলো সমুদ্রে খনিজ তলের উপর অর্ধ-কোষের আকারে, অনেকটা একটি ফোস্কার আকারে, সেটি গড়ে উঠা এবং ঐ খনিজ থেকে শক্তি আহরণ করা। ঐ খনিজে যে অর্গানিক বস্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লেষিত হয়েছে, তাই ছিল ঐ শক্তির উৎস। আর ঐ ফোস্কার কোষ দেয়ালের প্রবেশ্যতার কারণে আশেপাশের পানি থেকে আরো উপযুক্ত অণু এর মধ্যে ঢুকেছে শক্তির উৎস হয়ে।

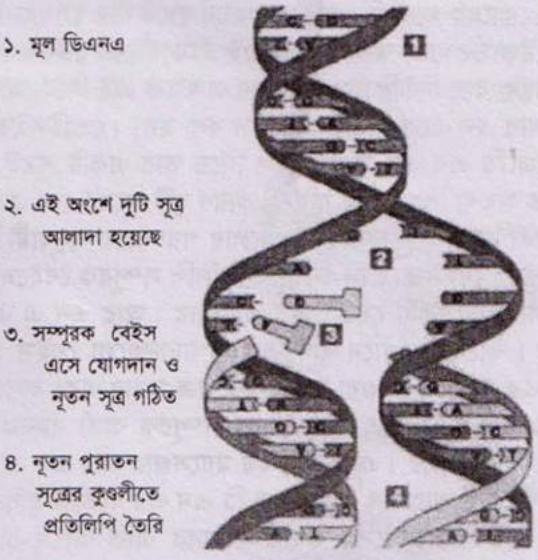
এভাবে আমরা প্রথম জীবে প্রয়োজনীয় বস্তু উপাদানগুলোর যোগান দেখলাম, শক্তির যোগানও দেখলাম। কিন্তু উপাদানের যোগান থাকলেই যে জীব সৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রোটিন, নিউক্লিক এসিড (ডি এন এ ও আর এন এ) এবং ফসফোলিপিড গঠিত হয়ে যাবে এমন কোন কথা নাই। এগুলো গঠিত হতে এবং তাদের কাজ শুরু করতে আরো বহু রকমের সমস্যা সমাধান করতে হয়েছে। এসব আমরা কিছুটা বুঝতে পারবো যদি সাধারণত সব জীবের মধ্যে কীভাবে ডি এন এ কাজ করে অর্থাৎ কীভাবে নিজের প্রতিলিপি তৈরি করে, এবং নিজের মধ্যে থাকা নীলনক্সার বার্তা অনুযায়ী নানা প্রোটিন তৈরি করে, তা জানতে পারি।

ডিএনএ কীভাবে নিজের প্রতিলিপি তৈরি করে

ডিএনএর দুটি সূত্রের প্রত্যেকটি আলাদা থাকা অবস্থায় তার সম্পূরক সূত্র তৈরি করতে পারে, এ কাজের জন্য বিশেষভাবে কার্যকর এনজাইমের সাহায্যে। এর বেইসগুলোতে যেহেতু A জোড়া বাঁধতে পারে শুধু T এর সঙ্গে, এবং C শুধু G এর সঙ্গে– আলাদা

হওয়া সূত্রের বেইসগুলো সেভাবে জোড়া বাঁধার জন্য যার যার সম্পূরক বেইস খুঁজে নেয় এবং সেগুলোর এবং সংলগ্ন সুগার ফসফেটের শেকল গেঁথে নূতন সূত্র তৈরি করে। এজন্য অবশ্য কুণ্ডলি পাকানো মূল দুটি সূত্রকে আগে পৃথক হতে হয়। তখন তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে নূতন সম্পূরক সূত্র তৈরি হয়ে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে নূতনে-পুরাতনে মিলে, আবার একটি ডাবল হেলিক্স ডি এন এ তৈরি হয়। এভাবে মূলত যেখানে দুই সূত্রে কুণ্ডলি পাকানো একটি ডাবল হেলিক্স আকৃতির ডি এন এ ছিল, এখন সেখানে একই রকম কুণ্ডলি পাকানো দুটি ডি এন এ সৃষ্টি হলো– অর্থাৎ ডি এন এর প্রতিলিপি তৈরি হলো।

আমরা একটি উপমা দিয়ে ব্যাপারটি আরো ভাল বুঝার চেষ্টা করতে পারি। এরকম দুই সূত্রের ডি এন একে মনে করতে পারি জ্যাকেট বা ব্যাগ খোলা-বাঁধা করার একটি বন্ধ জিপার রূপে, যার দুই চেইন পরস্পর সংলগ্ন হয়ে রয়েছে। এখন এর প্রতিলিপি তৈরি হবার সময় বিশেষ এনজাইমের প্রভাবে প্রাসঙ্গিক স্থানে কুণ্ডলি খুলে ডি এন এ সূত্র দুটি আলাদা হয়ে পড়ে, যেমন ভাবে জিপার খোলার সময় তার চেইন দুটি আলাদা হয়ে যায়। কল্পনা করতে পারি খোলা প্রত্যেকটি চেইনের সঙ্গে তার সম্পূরক আর একটি চেইন পাশাপাশি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ডি এন এ সূত্রের ক্ষেত্রে এটি সত্যি সত্যি হয় বেইসের সম্পূরকতার কারণে, এনজাইমের কাজের ফলে। এভাবে একটি জিপারের জায়গায় আমরা দুটি জিপার পেয়ে গেলাম জিপার দুটিকে যথারীতি বন্ধ করে নিয়ে। ডিএনএর ক্ষেত্রেও পাওয়া দুই জোড়া সূত্রকে বন্ধ করে বা কুণ্ডলি পাকিয়ে একটির স্থানে দুটি ডি এন এ সৃষ্টি হয় আবার অন্য বিশেষ এনজাইমের কাজের ফলেই। এভাবেই জীবের একটি কোষ থেকে যখন নূতন কোষ সৃষ্টি হয় তখন তার পুরো সব ডি এন এর হুবহু প্রতিলিপি সৃষ্টি হয়ে নূতন কোষেও একই সব ডি এন এ যায়। পিতৃ শুক্র কোষের এবং মাতৃ ডিম্বকোষের ডিএনএও এইভাবেই সন্তানের কোষে গিয়ে তার দেহেও একই ডি এন



ডিএনএ প্রতিলিপি তৈরি

এর প্রতিলিপি সৃষ্টি করে। অযৌন প্রজননের ক্ষেত্রেও প্রতিলিপি সন্তান জীবের কোষে যায়। এভাবেই জীবের একই নীলনক্সার বার্তা কোষ থেকে কোষে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সম্প্রসারিত হয়– প্রতিলিপি তৈরির প্রক্রিয়ায়।

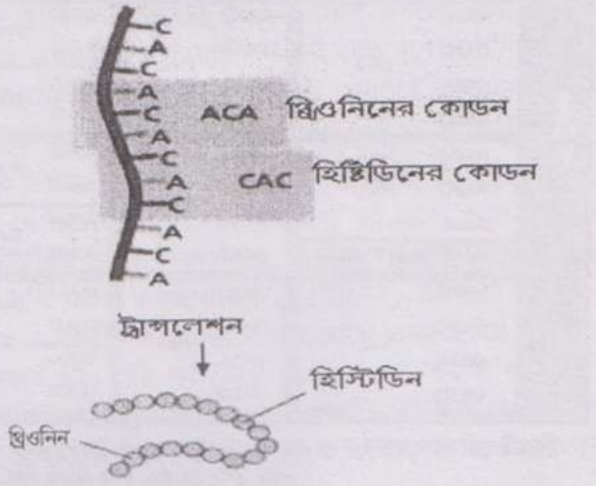
একটি জিনিস লক্ষণীয়– ডি এন এর প্রতিলিপি তৈরির সব কাজেরও কাজী হলো এনজাইম, অর্থাৎ প্রোটিন। প্রোটিনের সাহায্য ছাড়া ডিএনএ প্রতিলিপি হতে পারেনা। কোষের মধ্যে যদি ডি এন এর প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ থাকে, যা কিনা চার রকমের বেইস, ডিঅক্সি-রিবোজ সুগার এবং ফসফেট, তা হলে এনজাইমগুলো প্রয়োজন মত ডি এন এর প্রতিলিপি তৈরি করে ফেলতে পারে। প্রশ্ন হলো সেই এনজাইম বা প্রোটিন কোষের মধ্যে তৈরি হচ্ছে কীভাবে।

ডি এন এ বার্তা অনুযায়ী প্রোটিন কীভাবে তৈরি হয়

আসলে জীবনের নীলনক্সা বলতে মূলত আমরা প্রয়োজন মত বিভিন্ন প্রোটিন তৈরীরই নীলনক্সা বুঝাচ্ছি, কারণ এই প্রোটিনই জীবের সব প্রক্রিয়ার, সব কাজের নিয়ামক। আগেই দেখেছি প্রোটিন মূলত হলো নানা এমাইনো এসিডে গাঁথা চেইনের মত। চেইনটি গাঁথার কাজ করে আবার একটি এনজাইম যা নিজেও প্রোটিন। কিন্তু বিশেষ প্রোটিনের জন্য এমাইনো এসিড কোনটির পর কোনটি আসবে তা ঠিক হয় ডি এন এর মধ্যে থাকা নীলনক্সার বার্তা অনুযায়ী। এর বার্তাটি অবশ্য ডিএনএ থেকে আসে সরাসরি ভাবে নয়, কিছুটা পরোক্ষভাবে আর একটি মধ্যবর্তী বার্তাবাহকের মাধ্যমে– যেটি একটি আর এন এ। জীবনের নীলনক্সা অনুযায়ী কীভাবে প্রোটিন তৈরি হয় তার প্রক্রিয়াটি আমরা ভালভাবেই দেখতে চাই, কারণ জীবনের জন্য এটি খুবই মৌলিক শর্ত এবং প্রথম প্রাণের উন্মেষে এটি ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রোটিন তৈরির ব্যাপারটি কোষের মধ্যে ডি এন এ যেখানে থাকে ঠিক সেখানেই ঘটেনা। এক কোষী ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি ছাড়া অন্য সব জীবেই জীবকোষের ভেতর আর একটি ঝিল্লি-ঘেরা কক্ষ থাকে যাকে বলা নিউক্লিয়াস। ডি এন এ থাকে এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে (এজন্যই ডি এন এ ও আর এন একে নিউক্লিক এসিড বলা হয়)। প্রোটিন তৈরির সময় বিশেষ এনজাইমের কাজে ডি এন এর কুণ্ডলি খুলে গিয়ে তার একটি সূত্রই শুধু বার্তা পেতে ব্যবহৃত হয়। এতে অবশ্য কিছু আসে যায়না, কারণ দুটি সূত্রেই তো একই বার্তাই থাকে। যে সূত্র থেকে বার্তা নকল হবে তার বেইসগুলোর পরম্পরায় অনুযায়ী তৈরি হয়ে যায় একটি আর এন এ সূত্র - যেমনভাবে ডিএনএর প্রতিলিপি সম্পূরক বেইসের ভিত্তিতে তৈরি হতে আমরা দেখলাম, অনেকটা সেই একই প্রক্রিয়ায়। আর এন এ একটি মাত্র সূত্রের দ্বারাই তো তৈরি। কাজেই এখানে যদি তার উপাদানগুলো বেইস চারটি (যা ডিএনএর মতই, শুধু T এর বদলে U হওয়া ছাড়া), রিবোজ সুগার এবং ফসফেট মজুদ থাকে তাহলে উপযুক্ত এনজাইম ডিএনএ সূত্রের হুবহু সম্পূরক বার্তা বহনকারী একটি আর এন এ তৈরি করে ফেলতে পারে। একে বলা হয় ম্যাসেঞ্জার আর এন এ, সংক্ষেপে এম আর এন এ, অর্থাৎ বার্তাবহ আর এন এ। কারণ ডি এন এর বার্তাটি এভাবে নিজের মধ্যে নকল করে নিয়ে এটি নিউক্লিয়াসের বাইরে কোষের বাকি অংশে চলে আসে, যেখানে প্রোটিন তৈরি হয়।

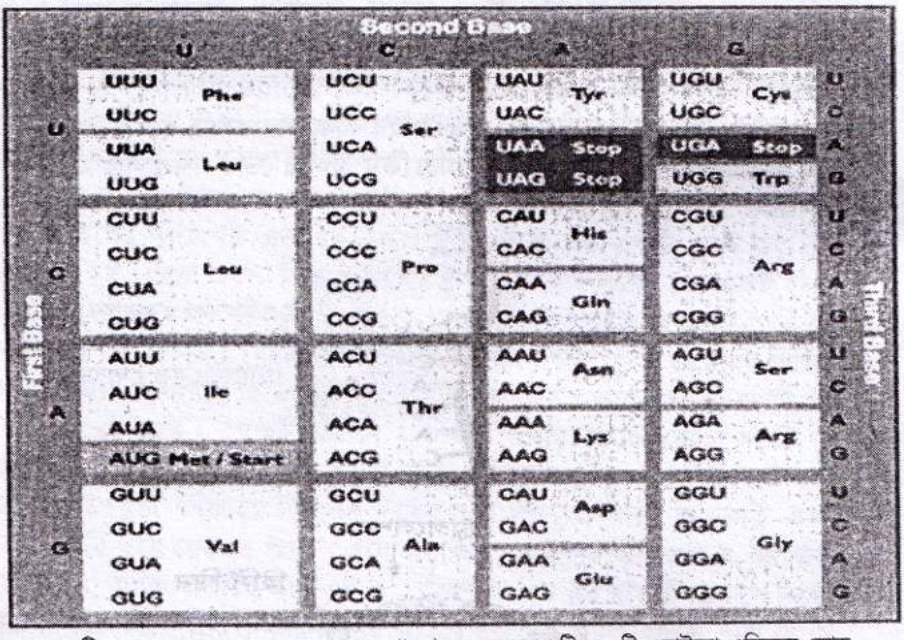
প্রোটিন তৈরির কাজে সহায়ক হয় রিবোজোম নামে কোষের আর কতগুলো ছোট অংশ। একটি রিবোজোম এম আর এন এ সূত্রের এক প্রান্ত থেকে বার্তাগুলো 'পড়ে পড়ে যায়' এবং সেই অনুযায়ী এমাইনো এসিডগুলো পরপর গেঁথে দিয়ে যায়। এভাবে একটি বার্তা অনুযায়ী বিশেষ একটি প্রোটিন সৃষ্টি করে। এরকম একটি প্রোটিন তৈরির পুরো বার্তাটিকে আমরা বলি ডি এন এ সূত্রের এক একটি জিন। রিবোজোম প্রোটিন তৈরির জন্য এমাইনো এসিড গাঁথার কাজটি করতে পারে তার কারণ এতে এক একটি বিশেষ এমাইনো এসিড সংযুক্ত থাকে আর এন এর বেইসের ভাষায় রচিত এক একটি কোড বা সংকেতের সঙ্গে, যাকে বলা হয় কোডন। বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিককালে আবিষ্কার করেছেন যে প্রত্যেকটি এমাইনো এসিডের সংকেত তৈরি হয় তিনটি বেইসের সমন্বয়ে। এটি বেশ স্বাভাবিক। কারণ যদি একটি বেইসের সমন্বয়ে এটি তৈরি হতো তা হলে চারটি বেইসকে একটি একটি করে মাত্র চার রকমের সংকেত তৈরি হতে পারতো। আর দুটি বেইসের সমন্বয়ে যদি সংকেত তৈরি হতো তা হলে চারটি বেইসকে দুটি দুটি করে সম্ভাব্য সব ভাবে নিয়ে ১৬ রকম সংকেত তৈরি করা যেত। অথচ এমাইনো এসিড রয়েছে মোট ২০টি, এতে তাই সব এমাইনো এসিডের সংকেত তৈরি হতে পারেনা। তিনটি তিনটি করে নিলে ৬৪টি বিভিন্ন সংকেত পাওয়া যায়– যা যথেষ্ট তো বটেই বরং কোন কোন এমাইনো এসিডের জন্য একাধিক সংকেত নির্দিষ্ট করার সুবিধা হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা ক্রমাগত গবেষণার মাধ্যমে তিন বেইসের সংকেতে রচিত এই কোডনগুলো উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন। এখন আমরা জানি কোন্ এমাইনো এসিডের জন্য কোন্ কোন্ কোডন প্রযোজ্য। যে 'ভাষায়' ডি এন এর বার্তা রচিত এই কোডন যেন তার এক একটি 'শব্দ', আর বেইস চারটি হলো তার 'বর্ণমালা'। এক্ষেত্রে সব শব্দই তিনটি বর্ণে গড়া। এভাবে ৬৪টি কোডনের মধ্যে ৬১টি ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন এমাইনো এসিডের সংকেত হিসাবে এবং বাকি তিনটা ব্যবহৃত হয় স্টপ বা যতি চিহ্ন হিসাবে। এদের দ্বারা রিবোজোম বুঝতে পারে যে প্রোটিনের একটি পূর্ণাঙ্গ অংশ যাকে পলিপেপটাইড বলা হয়, তা গড়া শেষ হয়েছে। এবার আর একটি পলিপেপটাইড তৈরির কাজ শুরু করতে হবে। এম আর এন এর বহন করে আনা এই বার্তার মধ্যে, অর্থাৎ তিন অক্ষরে তৈরি শব্দগুলোর মধ্যে যদিও



ভিতরের বেইসে গড়া কোডন অনুযায়ী দুটি এমাইনো এসিড বারবার পরপর সন্নিবেশ

কোন ফাঁক নাই, তবুও তিনটি তিনটি অক্ষর নিয়ে শব্দের পর শব্দ 'পড়ে যেতে' কোন অসুবিধা হয়না। প্রতিটি শব্দ পড়ে সেটি অনুযায়ী তার সম্পূরক কোডনের সঙ্গে লাগানো বিশেষ এমাইনো এসিডটি রিবোজোমের দ্বারা চেইনে সন্নিবিষ্ট হয়। এভাবে যেন একটি পূর্ণ বাক্য পড়া শেষ হলে তিন অক্ষরের আর একটি নির্দিষ্ট শব্দ 'দাঁড়ি' বা 'ফুলস্টপের' কাজ করে। ইতোমধ্যে এমাইনো এসিড গেঁথে গেঁথে একটি পূর্ণ পলিপেপটাইড চেইন তৈরি হয়ে গেছে। এর পর পলিপেপটাইডটি রিবোজোম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এমাইনো এসিডের পরম্পরায় অনুযায়ী নিজের মতো করে ভাঁজ হয়ে গিয়ে এবং প্রয়োজনে আরো পলিপেপটাইডের সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটি প্রোটিন তৈরি হয়।

এভাবে এম আর এন এর বহন করে আনা বার্তাটি সেই অনুযায়ী এমাইনো এসিড পরম্পরায়ে পরিণত হবার কাজটিকে বলা হয় ট্রান্সলেশন বা অনুবাদ। এই অনুবাদ করার প্রক্রিয়ায় রিবোজোম যে এমাইনো এসিডগুলো গ্রথিত করে, তার প্রত্যেকটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তার কোডন অর্থাৎ তার জন্য নির্দিষ্ট তিনটি বেইস। এই বেইসগুলো যে আর এন এর অংশ তাকে বলা হয় ট্রান্সলেশন আর এন এ, বা টি আর এন এ। টি আর-এন এ বিন্যস্ত হবার সময় অবশ্য যথারীতি বেইসগুলো এম আর এন এর সম্পূরক হয়ে থাকে, C এর বিপরীতে G, G এর বিপরীতে C, A এর বিপরীতে U- এবং U এর বিপরীতে A। মনে রাখতে হবে ডিএনএ তে যা T, আরএনএতে তা U। ডিএনএর বার্তা নকল করার সময় এম আর এন এ হয়েছিল তার সম্পূরক। এখন টি আর এন এ হয়ে পড়লো আবার সম্পূরকের সম্পূরক – অর্থাৎ কিনা ডি এন এর বার্তাটিই আমরা ফেরত পেলাম, আর ট্রান্সলেশনটি ঘটলো অর্থাৎ প্রোটিন তৈরি হলো সেই মূল বার্তা অনুযায়ীই। এভাবে কোষের মধ্যে ডিএনএর নানা অংশ নানা জিন অনুযায়ী অনেক প্রোটিন তৈরি



৬৪টি কোডন এমআরএনএ-তে যেভাবে থাকে) এর মধ্যে ৬১টিঃ ২০টি এমাইনো এসিডের কোড
বাকি ৩টিঃ কোডিং শেষ করার কোড

করতে থাকে।

কোডনের আবিষ্কার জীব বিদ্যার ক্ষেত্রে আরো একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এভাবে আমাদের কাছে জীবের সব কিছু নিয়ন্ত্রণকারী প্রোটিন তৈরির পুরো 'অভিধানটি' জানা হয়ে গেছে। ৬৪টি শব্দের এই অভিধানের প্রত্যেকটি শব্দের মানে আমরা এখন জানি। উদাহরণস্বরূপ এমাইনো এসিড হিষ্টিডিনের জন্য যে কোডন তা হলো CAU এবং CAC, যার যে কোন একটি হলেই চলে। তেমনি লাইসিনের জন্য AAA ও AAG যে কোনটি, থ্রিওনিনের জন্য ACA বা ACG এর যে কোনটি ইত্যাদি। এভাবে ৬১টি কোডন এমাইনো এসিডের সংকেত দিলেও UAA, UAG, UGC এই তিনটি স্টপ চিহ্নের নির্দেশক। স্মরণ রাখতে হবে যে A, C, G, U চিহ্নগুলো যথাক্রমে এডিনিন, সাইটসিন, গুয়ানিন ও ইউরেসিল নামক রাসায়নিক পদার্থ বা বেইসের জন্যই ব্যবহৃত হচ্ছে। সব চেয়ে বড় কথা এই অভিধান মানুষের জন্য যেমন প্রযোজ্য, দুনিয়ার সকল জীবের জন্যও এই একই অভিধান, এমনকি ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়াটির জন্যও। এই একই অভিধান অনুযায়ীই বহু কোটি বছর ধরে সৃষ্টি হয়েছে পুরো জীব জগত। তাদের প্রত্যেকটির ডি এন এ ও আর এন এ তে এই বেইসগুলোর ভাষাতেই বার্তা দেয়া রয়েছে এই একই কোডন অনুযায়ীই। যাবতীয় জীব যে একই জীব উৎস থেকে কালক্রমে বিবর্তিত, এর চেয়ে তার ভাল প্রমাণ আর কী হতে পারে?

প্রোটিন আগে, না ডি এন এ আগে ?

ডি এন এ কীভাবে প্রতিলিপি তৈরি করে, এর বার্তা থেকে কীভাবে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় তা এখানে সবিস্তারে আমরা দেখলাম একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। জীব জগতের চলমান অবস্থায় যদি ব্যাপারগুলো এভাবে ঘটে, তা হলে প্রথম জীবের ক্ষেত্রে সেটি এভাবে সম্ভব ছিল কিনা সেটি বিবেচনা করা। ডি এন এ, আর এন এ এবং প্রোটিন তৈরি হবার সব উপাদানগুলো যদিও বা সেখানে থেকে থাকতো, সেগুলো থেকে উল্লিখিত প্রক্রিয়া শুরু হবে কী করে? এখানে ডিম আগে কি মুরগি আগের মত সমস্যা কি দেখা দেবেনা? ডি এন একে গঠিত হতে হলে, কাজ করতে হলে, তার থেকে প্রতিলিপি পেতে হলে, নানা রকম এনজাইম বা প্রোটিন প্রয়োজন। আবার প্রোটিন তৈরি করতে হলে ডি এন এ প্রয়োজন, ডি এন এর বার্তা অনুযায়ীই তো প্রোটিন তৈরি হতে হবে। আদিতে প্রোটিন আগে না ডি এন এ আগে? যেটিই আগে হোক অন্যটির অনুপস্থিতিতে সেটি আসবে কীভাবে?

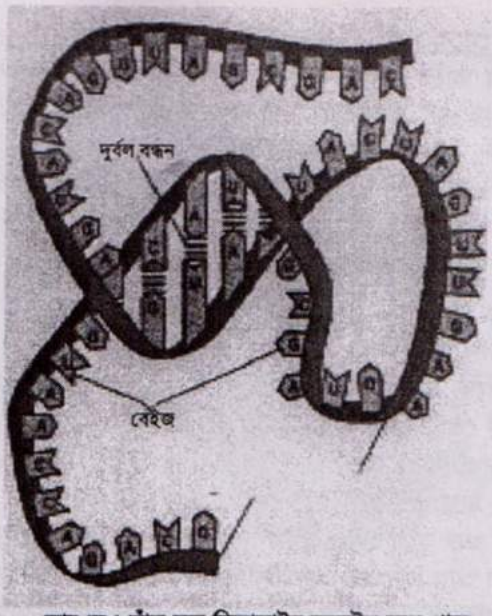
বিজ্ঞানীরা এই সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার নানা রকম সম্ভাব্য উপায় চিন্তা করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাব্য যে চিত্র এখন বেশি গ্রহণযোগ্য তা হলো প্রাণের উন্মেষের সময় কোন না কোনভাবে নিউক্লিক এসিড– আর এন এ অথবা ডি এন এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর কোন রকম এনজাইমের (প্রোটিনের) সহায়তা ছাড়াই এর প্রতিলিপি সম্ভব হয়েছিল। প্রথম প্রোটিনও সেইভাবে এর থেকে এনজাইমের সহায়তা না নিয়েই তৈরি হয়েছে। একবার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে যাওয়ার পর অবশ্য পরবর্তী এক পর্যায়ে এসে প্রোটিন ডি এন এ তৈরিতে, আর ডি এন এ প্রোটিন তৈরিতে সহায়তা দিতে শেখেছে, উল্লিখিত সাধারণ প্রক্রিয়ার মত। তবে ঐ প্রথম ঘটনাগুলো এত কষ্ট-কল্পিত

এবং ঘটার সম্ভাব্যতা সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাবে এত কম যে বিজ্ঞানীরা এর উপর ভরসা রাখতে পারছিলেন না। এমন অবস্থায় ১৯৮৩ সালের একটি অবাক করা পরীক্ষণ প্রাণের উন্মেষের ব্যাখ্যা করতে পারার মধ্যে বেশ আশাবাদ সৃষ্টি করেছে। এই পরীক্ষণে দেখা গেছে যে আর এন এ থেকে তার প্রতিলিপি সৃষ্টি প্রোটিনের সহায়তা ছাড়া নিজ থেকেই সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, আরো দেখা গেল যে আর এন এ অণু নিজেই বেশ কিছু বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করতে পারে যেমন ভাবে এনজাইমরূপে প্রোটিনগুলো করে থাকে। এ যদি সম্ভব হতে পারে তা হলে তো সমাধান হয়েই গেলো– আদিতে সেই প্রথম জীবের সৃষ্টি হয়তো এই পথেই হয়েছে। এটি সম্ভব নিজে নিজে সৃষ্টি হওয়া আর এন এর উপর শুধু নির্ভর করে– সে একাই করেছে একাধারে নিউক্লিক এসিডের কাজ এবং প্রোটিনের কাজ। অর্থাৎ কিনা আদিতে প্রাণের জগতটি ছিল নেহাতই আর এন এ জগত।

আর এন এ জগত

আর এন এ জগতের শুরু হয়েছিল সেই আদি পৃথিবীর সমুদ্রে নিজ থেকে প্রথম আর এন এ গঠনের মাধ্যমে। সমুদ্রের ভেতর কাদার খাঁজে কাদার অণুর দ্বিমাত্রিক তলে সুগার-ফসফেট ও বেইসগুলো তাদের বৈদ্যুতিক চার্জের কারণে আপনা থেকে সংশ্লেষিত হবার সম্ভাবনা নগণ্য নয়। সাধারণ ত্রিমাত্রিক আয়তনের মধ্যে না থেকে দ্বিমাত্রিক তলে উপাদানগুলো উপরে নিচে ছড়িয়ে যেতে পারেনা বলে সেগুলোর ঘনত্ব সেখানে অনেক বাড়ে। এগুলো পরস্পরের অনেক কাছাকাছি চলে আসে, এবং স্বাভাবিক রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অণু গঠন করতে পারে– সব অনুঘটক এভাবেই কাজ করে।

আর এন এ একটি মাত্র সূত্র দিয়ে গঠিত, তাই প্রতিলিপি হবার জন্য ডি এন এর মত তাকে কুণ্ডলি খুলতে হয়না। বেইস ইত্যাদি উপাদান যদি কাছে থাকে তাহলে A এর সঙ্গে U, C এর সঙ্গে G এমনি করে বসে বসে তার প্রতিলিপি তৈরি হতে পারে। অনেক আর এন এ উপাদান কোথাও ঘন হয়ে থাকলে সেখানে নিজ থেকেই এর প্রতিলিপি তৈরি অসম্ভব নয়। অন্যদিকে আর এন এ একটি মাত্র সূত্রে গড়া একটি দীর্ঘ অণু হওয়াতে নিজের উন্মুক্ত A বেইসের সঙ্গে নিজেরই উন্মুক্ত U বেইসের আকর্ষণ, এবং C বেইসের সঙ্গে G বেইসের আকর্ষণের ফলে এটি নিজের নানা জায়গায় নানা প্যাঁচ ও গিট্টু খেয়ে এক একটি জটিল ভাঁজ হয়ে যাওয়া নানা আকৃতি নেয়। এরকম আকৃতি কিন্তু অনুঘটকের কাজ করার জন্য খুবই উপযুক্ত। আসলে প্রোটিন যে এনজাইম হিসাবে অনুঘটকের কাজ করে তাও প্রোটিনের এ ধরনের অনেক ভাঁজের কারণেই সম্ভব হয়। কাজেই সেই আদিতে আর এন যে এই এনজাইমের কাজ করেছে তা এভাবে ভাঁজ হওয়া আকৃতির কারণেই। একদিকে এটি একটি রিবো-নিউক্লিক এসিড (আর এন এ), অন্যদিকে এর কাজ এনজাইমের মত। তাই উভয় শব্দ মিলিয়ে এই উভয় ভূমিকার এই আর এন একে বলা হলো রিবোজাইম। নানা রকম প্যাঁচ খাওয়া আকৃতি নিয়ে রিবোজাইম নানা এনজাইমের কাজ করতে পেরেছে। এসব কাজের মধ্যে ছিল প্রোটিন তৈরির জন্য এমাইনো এসিড সংশ্লেষণ, অন্য আর এন এ প্রয়োজন মত কেটে ফেলা, জোড়া দেয়া, নিজের অংশের সঙ্গে অন্য আর এন এর অংশ জোড়া দেয়া, ইত্যাদি। এই



আরএনএ ভাঁজ হয়ে রিবোজাইম অনুঘটক হতে পারে

কাজগুলো জীবের সৃষ্টি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, এখন যেগুলো নানা প্রোটিন এনজাইম করে থাকে। অবশ্য একা আর এন একে সব ভাবে কাজ করতে হলে ভাঁজ খাওয়া রূপে আর এন এ যেমন থাকতে হবে এনজাইমের মত প্রোটিন তৈরির অনুঘটক হবার জন্য, তেমনি একই জায়গায় একদম ভাঁজহীন সোজা-সাপটা আর এন এ ও থাকতে হবে। কারণ এর থেকে প্রতিলিপি তৈরি হতে হলে বেইসগুলোকে উন্মুক্ত থাকতে হবে, প্যাঁচ খেয়ে একে অপরের সংলগ্ন হয়ে গেলে চলবেনা। সে যাই হোক, অনেক বিজ্ঞানীই এখন মনে করছেন জীবের আদিতে ঠিক এমনটিই হয়েছিল। ফলে প্রথম জীব প্রতিলিপির জন্য দরকারী আর এন এ এবং তার থেকে জরুরী কাজগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় সব প্রোটিন, উভয়েই পেয়ে গিয়েছিল সেই আর এন এ জগতে।

পরে ডি এন এ এবং কোডন আসলো কেন ?

আর এন এ জগত আদিতে থাকলেও এক সময় তা বিবর্তিত হয়েছে ডি এন এ নীলনক্সা আর কোডনের মাধ্যমে প্রোটিন তৈরির বর্তমান প্রক্রিয়ায়। কিন্তু একক আর এন এ দিয়ে যা হতে পারতো তা এভাবে বদলে গেল কেন? এর উত্তর হলো বিবর্তনের নিয়মে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ডি এন এর সুবিধা বেশি বলে। যেমন প্রতিলিপি তৈরির সময় বেশ কিছু ভুল চুক হতে পারে যার সংশোধনের কোন ভাল ব্যবস্থা আর এন এর নাই, কিন্তু ডিএনএর আছে। ডিএনএ'র একটা বার্তা তার দুটি সূত্রেই থাকে, একে অপরের সম্পূরক হিসেবে। দুই সূত্রের একটিতে কোন ভুল চলে আসলে, এর কোন বেইস ভুলক্রমে পরিবর্তিত হয়ে গেলে, অন্য সূত্রে তার সম্পূরক থেকে ভুল শুধরে নেয়া যায়। আর এন এতে এই সুযোগ নাই। সেখানে প্রতিলিপি সৃষ্টির পরপরই প্রতিলিপিটি

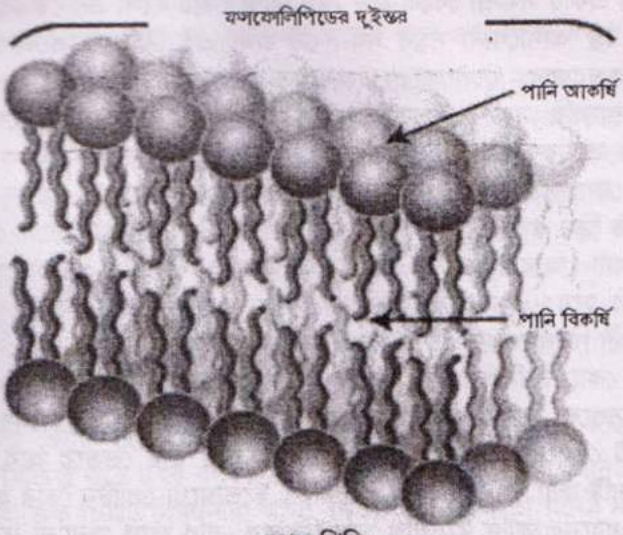
মূল আর এন এ থেকে আলাদা হয়ে যায়। একেবারে আদিতে যে জীব ছিল তা এতই সরল প্রকৃতির যে তাতে ভুল হবার বা ভুলের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ হবার সম্ভাবনা কম ছিল। কাজেই আর এন এ দিয়েই তার কাজ চলেছে। কিন্তু পরবর্তী জটিলতর জীবের জন্য তাতে চলেনি, ডি এন এ আসতে হয়েছে। কিন্তু আর এন এ থেকে ডি এন এতে আসার এই কাজ এক লাফে হয়নি, ধাপে ধাপে কিছু কিছু বদলে, কিছু কিছু সুবিধা পেয়ে, বহু কাল পর শেষ পর্যন্ত ডি এন এ বর্তমান রূপ পেয়েছে এবং তা টিকে গেছে তার চমৎকার সুবিধার জন্য। কোডনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

জীব জগতের এক ও অনন্য কোডন অভিধান সৃষ্টির ধাপগুলো কী হতে পারে তার সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বেশ চমকপ্রদ। অনুঘটক হিসেবে আর এন এর দক্ষতা খুবই সীমিত। এটি যদি তার সঙ্গে এমাইনো এসিড সংযুক্ত করে নেয় তা হলে তার দক্ষতা বাড়ে। অনেক অনুঘটকই কো-ফ্যাক্টর নামক অন্য রাসায়নিক অণুর সংযোজনের মাধ্যমে দক্ষতর হতে পারে। অনুঘটকের কাজ হয়ে গেলে কো-ফ্যাক্টর রূপী এমাইনো এসিডগুলোর চেইনটি আলাদা হয়ে প্রোটিনে রূপ নেয়। এভাবেই খুব সম্ভব কোষের মধ্যে প্রোটিন তৈরির ব্যাপারটি শুরু হয়েছিল। প্রথম দিকে যে কোন এমাইনো এসিডকে কো-ফ্যাক্টর রূপে সংযুক্ত করে আর এন এর অনুঘটন দক্ষতা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে নেয়া গিয়েছিল। সে সময় বিশেষ এমাইনো এসিডের জন্য বিশেষ বেইস পরম্পরায়ের ব্যাপারটি অত ধরা বাঁধা সুনির্দিষ্ট ছিলনা, একরকম পরীক্ষা নিরিক্ষার মধ্য দিয়েই যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আরো দীর্ঘ কালের বিবর্তনে এগুলো দক্ষতম অবস্থায় এসে আজকের কোডনে রূপ লাভ করেছে– যা এক একটি এমাইনো এসিডের জন্য একেবারেই সুনির্দিষ্ট।

এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল। আমরা জীবনের নীলনক্সার উপমার কথা বলছি, যা ডি এন এতে সংরক্ষিত থাকে। উপমা হিসাবে এই নীলনক্সার কথায় আবার কিছুটা ভুল বুঝার আশঙ্কা রয়েছে। সর্বাধুনিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটি একেবারে নীলনক্সা অনুযায়ী দালান বানাবার মত নয়। ডি এন এর বার্তায় গড়ার নির্দেশগুলো যেমন থাকে তেমনি নানা রকম নিয়ন্ত্রণের নির্দেশও থাকে– কোন কাজটি কখন হবে, কখন বন্ধ থাকবে, ইত্যাদি। তাছাড়া প্রায়শ একাধিক বার্তা মিলেই শেষ পর্যন্ত কাজটি কোন দিকে যাবে তা ঠিক হয়। এসব দিক থেকে উপমাটি নীলনক্সা না হয়ে রান্নার রেসিপি হলেই বরং ভাল হয়। রান্নায় যেমন এক মশলার উপর অন্য মশলার প্রকাশ নির্ভর করে অনেকটা সেরকম। নীলনক্সার উপমাকেও সে রকম কিছুটা নমনীয়ভাবে গ্রহণ করতে হবে, যেহেতু শুধু একটি জিন অমোঘভাবে একটি গুণকে সব সময় নির্ধারিত করছেনা।

কোষের মধ্যে জীবন

প্রথম জীব জীবের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তিনটি জিনিসের মধ্যে নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন কী ভাবে পেয়ে থাকতে পারে তা আমরা দেখলাম। কিন্তু তৃতীয়টি এখনো দেখা হয়নি– তা হলো কোষ গঠনের জন্য ঝিল্লি। প্রাণের উন্মেষের জন্য অন্য শর্তগুলো কার্যকর হতে পারে শুধু কোষ গঠন হলেই। কোষের মধ্যে আবদ্ধ করে তাদেরকে কাছাকাছি এনে না রাখতে পারলে অন্য দরকারী অণুগুলো ছড়িয়ে পড়তো, কার্যকর হতে পারতোনা। আর কোষ গঠন করতে হলে উপযুক্ত ঝিল্লির দরকার যা কোষকে ঘিরে রাখবে, লিপিডে



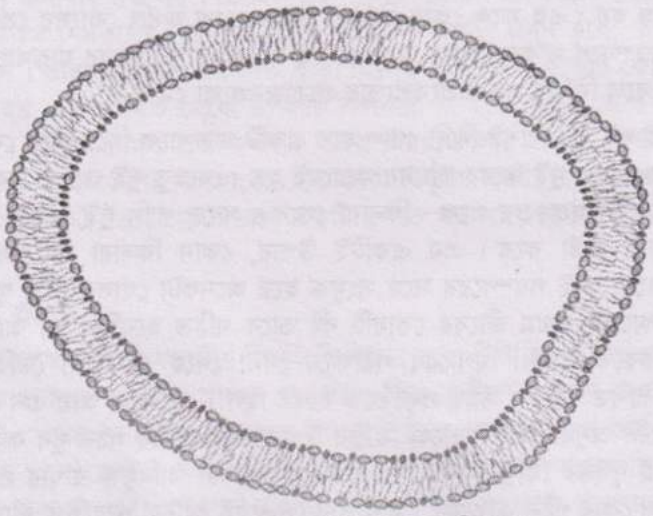
কোষ ঝিল্লি

দ্রবণীয় বস্তু ও গ্যাসকে ঢুকতে বেরুতে দেবে, কিন্তু অন্য কিছুকে তা করতে দেবেনা। এই ঝিল্লি গঠিত হয় চর্বি জাতীয় বস্তু ফসফোলিপিডের অণুর দুই স্তর বিশিষ্ট তল হিসেবে। এখানে এই দুই স্তর হবার ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই অণুর দুটি প্রান্ত থাকে–একটি পানি-বিকর্ষি প্রান্ত, অন্যটি পানি-আকর্ষি প্রান্ত। পানি-বিকর্ষি প্রান্তটিকে অণুর 'লেজ' ও পানি-আকর্ষি প্রান্তটিকে 'মাথা' হিসেবে দেখা যেতে পারে। এরকম অণুর দুটির স্তর যখন তৈরি হয় তখন লেজগুলো সব দুই স্তরের মধ্যে ভেতরের দিকে এবং মাথাগুলো দুদিকেই বাইরের দিকে থাকে। স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সব লেজ এভাবে দুই স্তরের মাঝে অন্তর্মুখি হয়ে এক সঙ্গে হয়ে যায় ও সব মাথা স্তর দুটির দুদিকেই বহির্মুখি হয়ে এক সঙ্গে হয়। এর ফলে কোষ ঝিল্লির উভয় পাশে অর্থাৎ কোষের ভেতরে ও বাইরে পানির সংস্পর্শে থাকতে কোন অসুবিধা হয় না, অথচ দুই স্তরের মাঝখানে পানি ঢুকতে পারেনা বলে ঝিল্লির মূল অপ্রবেশ্যতার প্রয়োজনগুলো মেটে।

কিন্তু এই দুই স্তর বিশিষ্ট ঝিল্লি গোল হয়ে একটি জায়গাকে ঘিরে নিয়ে কোষ গঠন করে কেন? এও তার দুই স্তরের গঠনের কারণেই হয়। যেহেতু দুই স্তরের মাঝখানটায় অণুর পানি-বিকর্ষি লেজগুলো থকে– কিনারা থেকেও যাতে পানি দুই স্তরের মাঝে না ঢুকে তারা সেই চেষ্টা করে। এর একটিই উপায়, কোন কিনারা না রাখা– সবদিকের কিনারাগুলো তাই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে অনেকটা গোলকাকৃতি ক্ষুদ্র কোষ গঠন করে। কাজেই প্রথম জীবের কোষটি কী ভাবে গঠিত হয়েছিল তা আমরা মোটামুটি কল্পনা করতে পারি। মিলারের পরীক্ষণে দেখা গেছে যে ঝিল্লি তৈরির প্রয়োজনীয় ফসফোলিপিড বস্তু সে সময় প্রকৃতিতে যথেষ্ট ছিল। সেক্ষেত্রে আর এন এ অথবা অন্য কোন আদি অনুঘটকের সাহায্যে ঝিল্লির উপযুক্ত দুই স্তরের গঠন খুব কঠিন হবার কথা নয়। এই দুইস্তর ঝিল্লি আবার স্তর দুটির মাঝখানটা পানিমুক্ত রাখার প্রয়োজনে গোল হয়ে এসে কোষ গঠন করেছিল। আর তার ভেতরেই আটকা পড়েছিল জীবের প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তু।

অবশ্য এখানে একটি সমস্যা থেকে যায়। যে ঝিল্লি তৈরি হলো এর ভেতর দিয়ে কোষে সব দরকারি বস্তু আনাগোনা সম্ভব নয়। সে জন্য এই ঝিল্লিতে প্রবেশের কিছু কিছু 'দরজা' থাকার দরকার - যেগুলো প্রয়োজন মত খোলা বাঁধা যায়। তাছাড়া কিছু 'পাম্প' থাকা চাই দরকারি বস্তুকে ভেতরে আনার জন্য বা বের করে দেয়ার জন্য। পরবর্তীকালের সাধারণ কোষ ঝিল্লিতে এসব দরজা আর পাম্প স্বাভাবিক হলেও সেই প্রথম দিকের কোষের ঝিল্লিতে তা হতে পারা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এখানেও সমস্যাটি মুরগি আগে কি ডিম আগের মত। ঝিল্লি ছাড়া প্রোটিন তৈরির ব্যবস্থাগুলো কোষের মধ্যে থাকতে পারবেনা। আবার প্রোটিন সেখানে না থাকলে ঝিল্লির ঐ দরজা, পাম্প ইত্যাদি কী দিয়ে তৈরি হবে? এ সমস্যা সমাধানের জন্য একটি থিওরি হলো– প্রথম দিকের কোষে দরকারী জিনিসগুলো ভেতরে নয় সব বাইরে থেকে ঝিল্লির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। কোন কারণে কোষের ঝিল্লির একটি অংশ কোষের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল বাইরের ঐ দরকারী জিনিসগুলো নিয়ে যা কার্যত কোষের ভেতরে আর একটি কোষের গঠনের মত অবস্থা। একটি বেলুনের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে তার ভেতরে আর একটি ছোট বেলুন যেমন সৃষ্টি করা যায় অনেকটা সেরকম। ইতোমধ্যে প্রোটিন তৈরি হয়ে দরজা ও পাম্পের এক ধরনের আদি ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছে, যার ফলে অন্যান্য দরকারি অণুও আসা যাওয়া করতে পেরেছে। এক সময় বাইরে কোষ ঝিল্লিটি খসে গেছে– ভেতরেরটাই কোষ হিসেবে থেকে গেছে।

যতই সহজ সরল ও প্রাথমিক হোক না কেন আদি জীব-কোষকেও কতগুলো মৌলিক শর্ত পূরণ করতে হয়েছে। এর ঝিল্লিকে এমন গুণ সম্পন্ন হতে হয়েছে যেন সেটি অর্ধপ্রবেশ্য হয়– প্রয়োজনীয় পুষ্টি ঢুকতে পারে, কিন্তু ভেতরের গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন, আর এন এ ইত্যাদিকে ভেতরেই ধরে রাখতে পারে। নিত্য নূতন পুষ্টি বাইরে থেকে পাওয়া দরকার কোষের বেঁচে থাকার জন্য, বড় হবার জন্য, এবং বড় হতে গিয়ে ঝিল্লিকেও



দুই-স্তর লিপিড ঝিল্লি গোলকাকৃতি নেয়

আরো বড় করার জন্য। তাছাড়া বংশ বৃদ্ধির জন্য আর এন এ প্রতিলিপি তৈরি হলে তাদেরকে ধারণের জন্য কোষকে ক্রমে বড় হতেই হবে এবং বিভাজিতও হতে হবে।

আর এন এ তৈরি হওয়া, তার প্রতিলিপি হওয়া, প্রোটিন তৈরি হওয়া, কোষ ঝিল্লি তৈরি হওয়া ইত্যাদিতে বহু রকম বিক্রিয়া প্রয়োজন হয়েছে, এনজাইমের বা আদিতে রিবোজাইমের সুনির্দিষ্ট কাজ প্রয়োজন হয়েছে। এগুলো শুরুতে ঘটলো কেন? এর বৈজ্ঞানিক উত্তর হলো এগুলো ছাড়াও আরো অসংখ্য বিক্রিয়া ঘটেছে সবই স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাকৃতিক রাসায়নিক নিয়ম অনুযায়ী। যেহেতু কোটি কোটি বছর ধরে অসংখ্য বৈচিত্রে এসব বিক্রিয়া ঘটতে পেরেছে, সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্ভাবনার নিয়মে প্রাণ সৃষ্টির এই বিক্রিয়া ঘটারও কিছু সম্ভাবনা ছিল। তাই এগুলোও ঘটেছে। প্রথম ঘটার পর প্রাণের স্বাভাবিক বৈশিষ্টগুলো দেখা দিয়ে এদেরকে আরো ঘটার বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছে। এর পর প্রাণের অগ্রযাত্রা আর কখনো বন্ধ হয়নি।

আজ চার শত কোটি বছর পরে এসে সেদিন প্রথম জীবের উন্মেষ পৃথিবীতে কীভাবে হয়েছিল তা নিশ্চিত করে হুবহু বলতে পারা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সেদিনের সেই সৃষ্টির যে সম্ভাব্য যৌক্তিক চিত্রটি বিজ্ঞানীরা খাড়া করতে পেরেছেন তা যথেষ্ট বাস্তবানুগ। এর অনেক খানিই আজকের সুস্পষ্ট পরীক্ষা-নিরিক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। তাই মোটামুটি এ ধরনের প্রক্রিয়ায় সেদিনের পৃথিবীতে আদি জীব সৃষ্টি হবার জন্য সকল উপাদান ও সকল প্রক্রিয়াগত সম্ভাব্যতা বিরাজ করছিল তা অনেকটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যাচ্ছে। সেদিনের পৃথিবীর উষ্ণ জলরাশিতে তাই গড়ে উঠেছিল খুব সম্ভব সেই আদি আর এন এ যা একাধারে প্রতিলিপি সৃষ্টির কাজ করে এবং রিবোজাইম হিসাবে প্রোটিনের কাজও করে প্রাণের অত্যাবশ্যকীয় শর্তগুলো পূরণ করেছিল। ওদিকে প্রকৃতিতে থাকা ফসফোলিপিড কোষ ঝিল্লি ও কোষ গঠন করে তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাণের প্রথম আধারটিও তৈরি করে দিয়েছিল। প্রাণের প্রায় অর্ধেকটা ইতিহাসে জীব এরকম ক্ষুদ্র এককোষী হয়েই থেকে গিয়েছিল– কোষ ঝিল্লির ভেতর প্রয়োজনীয় প্রোটিন এবং ডি এন এর ডাবল হেলিক্স। কিন্তু এর পর তাদের কোষের অনেক উন্নয়ন ঘটেছে। অনেক জীবের ক্ষেত্রে কোষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে আর একটি ঝিল্লিতে ঘেরা নিউক্লিয়াস আর তার ভেতরেই সংরক্ষিত থেকেছে ডি এন এ। আরো বেশি ও জটিলতর বার্তা বহন করে দীর্ঘ এক টানা ডি এন এ দলা পাকিয়ে কয়েকটি বাণ্ডিলে থাকতে আরম্ভ করলো– এই বাণ্ডিলগুলোকে বলা হয় ক্রোমোজোম। অনেক ক্ষেত্রে বহু কোষ এক সঙ্গে একটি জীব গঠন করে বহুকোষী জীবে পরিণত হয়েছে। জীবকোষ ও জীবের এই জটিলতর চিত্র আমরা পরে বিস্তারিত দেখবো। কিন্তু তার আগে দেখি প্রথম উন্মেষ হওয়া সেই অতি সরল জীব পরে জটিলতর হতে গেলো কেন?

জীবন মানে বিবর্তন

আদি জীব থেকে আজকের জীব-বৈচিত্র

চারশত কোটি বছর আগে পৃথিবীতে যে প্রথম জীবের সূচনা হয়েছিল তা খুবই সরল, খুবই মামুলি। কিন্তু জীবের একটি অপরিহার্য শর্ত সেটি পূরণ করতে পেরেছে, তা হলো বংশ বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হবার সম্ভাবনা। প্রাণের যে ধারাবাহিকতা সেদিন শুরু হয়েছিল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, তার মধ্যে জীব কিন্তু একই রকম থাকেনি, ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে। প্রাণের উন্মেষের ৫০ কোটি বছরেরও বেশি সময় পরের যে প্রাচীনতম ব্যাকটেরিয়া ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানেও দেখা যাচ্ছে জীব তখনো অতি সরল, কিন্তু তা হলেও সেই প্রথম জীবের তুলনায় তা যথেষ্ট জটিলতর। তারপরও জীবের ইতিহাসের প্রায় অর্ধেকটা সময় অর্থাৎ প্রায় ২০০ কোটি বছর জীব ঐ এককোষী ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়ারই নানা রূপে থেকে গেছে। অনেক বৈচিত্র ঘটেছে, অনেক নূতনত্ব যোগ হয়েছে, কিন্তু সব ঐ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যেই। এরপর এককোষী ব্যাকটেরিয়া চলে গেলনা বটে (আজও ওরকম ব্যাকটেরিয়া কম নাই) কিন্তু যুগের পর যুগ ধরে জীব আরো নানা রূপে বিবর্তিত হয়েছে। এককোষী উন্নততর প্রোটিষ্ট, প্রথম বহুকোষী জীব, আজকের প্রাণি ও আজকের উদ্ভিদের প্রথম পূর্বসূরিরা, খোলসওয়ালা বড় জলজ প্রাণি, প্রথম মেরুদণ্ডিরা, মাছ, উভচর, পুরাপুরি স্থলের প্রাণি, স্থলের বড় উদ্ভিদ, সরীসৃপ, পতঙ্গ ইত্যাদি। সরীসৃপের নানা শাখার মধ্য থেকে এসেছে একদিকে ডাইনোসররা অন্যদিকে প্রথম স্তন্যপায়ীরা, আকাশে পাখি-সদৃশরা এবং পরে পাখি। এরপর ঘটেছে ডাইনোসরের অপূর্ব সমারোহ, স্তন্যপায়ী রাজত্ব, বানর ও এইপরূপে প্রাইমেটদের বিকাশ, এইপদের মধ্যে মানব-সদৃশদের আবির্ভাব, মানুষসহ বর্তমানের জীববৈচিত্র। এর সবের বিকাশের পেছনে কাজ করেছে বিবর্তন। সেই ইতিহাসে যাওয়ার আগে এসবের কার্য-কারণগুলো দেখার জন্য সহায়ক হবে যদি আমরা বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি কিছুটা বিস্তারিত বুঝার চেষ্টা করি।

আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি আর এন এ জগত আদি সরলতম জীবের জন্য যথেষ্ট হলেও তা পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য যথেষ্ট থাকেনি। তাই সে অবস্থা থেকে বিবর্তিত জীবে এসেছে ডিএনএ– ঐ এককোষী ক্ষুদ্র জীবের মধ্যেই। কাজেই একেবারে গোড়া থেকেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সব বিবর্তন ঘটে আসছে। তবে এই অধ্যায়ে এবং পরের তিনটি অধ্যায়েও আমরা বিবর্তনের আলোচনায় উদাহরণ টানবো প্রধানত বহুকোষী জটিলতর বড় প্রাণিদেরই। এর কারণ একদিকে এদের জটিলতা, অন্য দিকে এদের সঙ্গে আমাদের

সবার অধিকতর চাক্ষুষ পরিচয়। তার মানে এই নয় যে বিবর্তন ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য ক্ষুদ্র জীবের ক্ষেত্রে কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

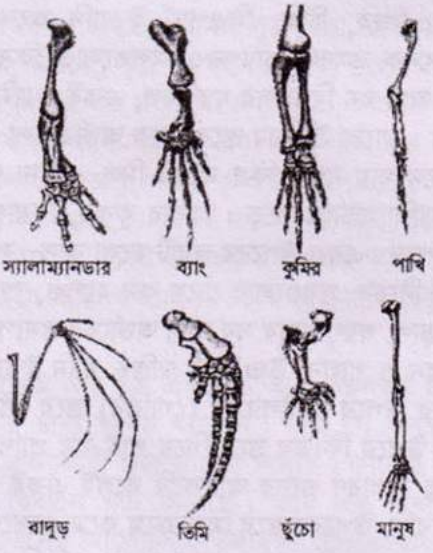
বিবর্তনের চাক্ষুষ সাক্ষ্য

জীব জগতের দিকে তাকালেই বিবর্তনের চাক্ষুষ সাক্ষ্য তার প্রতি পদে পদে পাওয়া যায়। আর এখন সর্বাধুনিক জেনেটিক তথ্যের দিকে তাকালে এর অন্তর্নিহিত পুরো ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সব জীবের একই কোডন অভিধান সব জীবের একই সাধারণ উৎস নিশ্ছিদ্রভাবে প্রমাণ করেছে।

জীব বিবর্তন প্রক্রিয়া আবিষ্কারের গোড়া থেকেই এর ভিত্তি ছিল নানা প্রাণির ফসিলের তুলনা। এই ফসিল রেকর্ড থেকেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন কোটি কোটি বছর ধরে বিবর্তনের ধারাবাহিকতা। আজ যে সব প্রাণি বেশ পৃথক গোষ্ঠির বলে পরিচিত তাদের দেহাবয়বের মধ্যে অবাক হবার মতো মিলগুলো দেখেই আন্দাজ করা গেছে যে তারা একই সাধারণ পূর্বসূরি থেকে বিবর্তিত হয়েছে। ইতোমধ্যে আজকের এবং অতীতের জানা অধিকাংশ জীব প্রজাতির শ্রেণি বিভাজন বিজ্ঞানীরা করে ফেলেছেন। এই বিভাজন অনুযায়ী যে কোন প্রজাতিকে নামকরণও করা হয়েছে দুই শব্দে– প্রথম শব্দটি তার জেনাস বা গণের পরিচয়ে, এবং দ্বিতীয়টি তার স্পেসিস বা প্রজাতির পরিচয়ে। যেমন আমরা মানুষের বৈজ্ঞানিক নামকরণ হয়েছে হোমো সেপিয়েন্স– হোমো গণের সেপিয়েন্স প্রজাতি। হোমো গণের অন্যান্য প্রজাতিগুলো কিন্তু এখন নাই, এক সময় ছিল, পরে বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু আর একটি উদাহরণ নিয়ে যদি বিড়ালের কথায় আসি বিড়ালের সঙ্গে একই গণে আরো প্রজাতি বর্তমান রয়েছে বিভিন্ন রকম বন বিড়াল পর্যায়ের। গণের উপরের পরবর্তী স্তর হলো ফ্যামিলি। বিড়াল যে ফ্যামিলির প্রাণি তার বহু সদস্য আমাদের পরিচিত– বাঘ, সিংহ, চিতা, লিওপার্ড ইত্যাদি অনেকে। যদিও স্পষ্টত বিড়ালের সঙ্গে তাদের অনেক তফাৎ, তারপরও মিলগুলোও কিন্তু খুবই স্পষ্ট। তবে একই গণের মধ্যে বিড়াল আর বন বিড়ালের যত মিল, একই ফ্যামিলির মধ্যে বিড়াল ও বাঘের মিল তত বেশি নয়। আরো উপরের স্তরে যাকে অর্ডার বলা হয় সেই স্তরে গেলে সদস্যদের মিল আরো কমে যায় বটে, কিন্তু যথেষ্ট মিল এখনো থাকে। বিড়াল, বাঘ ইত্যাদির ফ্যামিলিটি মাংসাশি অর্ডারে পড়ে। আবার কুকুর, শিয়াল, নেকড়ে ইত্যাদির ফ্যামিলিও একই অর্ডারে পড়ে। এরও উপরের স্তরটি হলো ক্লাস– সব স্তন্যপায়ীরা একই ক্লাসে। তাদের মধ্যে মিল নিচের স্তরগুলোর চেয়ে কম হলেও, স্পষ্টত মিলের পরিমাণ এখনো অনেক। ইঁদুর, বিড়াল, গরু, মানুষ সব নানা অর্ডারের স্তন্যপায়ীরা এক্ষেত্রে একই ক্লাসে। তাদের সন্তান ধারন ও পালন, উষ্ণ রক্ত, মস্তিষ্ক গঠন ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে এই পর্যায়েও মিল প্রচুর। তার উপরে ফাইলামের (গোষ্ঠির) স্তরে গিয়ে আমরা পাই সব মেরুদণ্ডীদের এবং আরো উপরে কিংডম স্তরে গিয়ে পাই সব প্রাণিদের, যারা উদ্ভিদ বা ফাঙ্গাসের থেকে ভিন্ন কিছু সাধারণ গুণের অধিকারি বলেই একই কিংডমের অন্তর্ভূক্ত। এই যে নিচের স্তরে মিল বেশি, উপরের স্তরে মিল ক্রমে কমে এসেছে স্পষ্টত তার একটি কারণ নিচের স্তরের সদস্যরা সাম্প্রতিকতর কোন সাধারণ পূর্বসূরি থেকে সবাই এসেছে। আর উপরের স্তরের অপেক্ষাকৃত কম মিল বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে সাধারণ পূর্বসূরি

হয়তো বহু লক্ষ বা বহু কোটি বছর আগের। তার ফলে এর পর থেকে আলাদা ভাবে বিবর্তিত হয়ে অমিল সৃষ্টির সুযোগও এরা পেয়েছে বেশি কাল। একটি কথা এখানেই বলে রাখা ভাল সাধারণ ভাবে বিবর্তন বহু দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার, বহু প্রজন্মের ব্যাপার। পরিবর্তিত হবার জন্য হাজার, লক্ষ, কোটি বছরের মত দীর্ঘ সময় পেয়েছে বলেই জীব বিবর্তন সম্ভব হয়েছে। ফসিলের মধ্যে নানা জীবগোষ্ঠির এ সব সাধারণ পূর্বসূরিদের অনেকগুলোকে খুঁজে পাওয়া গেছে, তারা বহু কাল আগে বিলুপ্ত হলেও। নানা ফসিলের বয়স ও তাদের মিল-অমিলের পরম্পরায় দেখে জীব বিবর্তনের ইতিহাসকে অনেকটাই নিশ্চিতভাবে উদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছে।

বিভিন্ন প্রাণির দেহ গঠনে এমন অবাক করা মিলগুলো রয়েছে যে দেখলেই বুঝা যায় যে এরা সব অতীতের একই কোন সাধারণ নীলনক্সা অনুযায়ী তৈরি – কিছু কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও। উদাহরণস্বরূপ বাদুড়ের পাখা, তিমির পাখনা, বিড়ালের থাবা, মানুষের হাত– এ কয়টি অঙ্গের দিকে তাকানো যাক। এদের মধ্যে আশ্চর্য রকম মিল দেখা যায়, বিশেষ করে এদের হাড়ের গঠনে, যদিও এদের এক একটি প্রাণি অঙ্গ দুটিকে এক এক কাজের জন্য ব্যবহার করে। সব কটাতে একই রকম উর্দ্ধবাহু, একই রকম দুই হাঁড়ে বিভক্ত নিম্ন বাহু। একই রকম গাটে গাটে ভাগ করা পাঁচ আঙ্গুল। এদের সঙ্গে আরো দূরবর্তী প্রাণি পাখি, ব্যাং, কুমির এদেরো একই অঙ্গ লক্ষ্য করি– এখনো মিল একইভাবে স্পষ্ট। মজার ব্যাপার হলো দেহে কোন অংশের প্রয়োজন কোন প্রাণির না থাকলেও অনেক সময় তা একটুখানি প্রতীকী ভাবে হলেও সেখানে থেকে যায়, পূর্বসূরির ওটি থাকার ইতিহাসটি বহন করে। যেমন মানুষের নিম্ন বাহুতে পাশাপাশি জোড়া দুই হাড় রেডিও আলনা নামে পরিচিত। আমাদের বাহুর কাজে এরকম জোড়া হাড় খুব কাজে আসে। উপরে যে সব



একেবারেই ভিন্ন সব প্রাণির সামনের উপাঙ্গের একই মৌলিক কাঠামো



ভ্রূণ অবস্থায় গোড়াতে নানা প্রাণির অনুরূপ রূপ

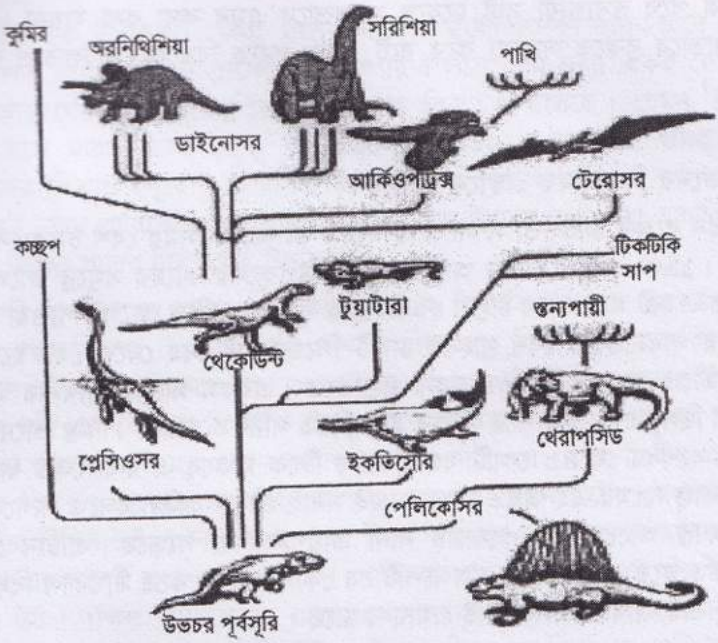
প্রাণিতে এর কথা বলা হয়েছে তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই এটি কাজে আসে। কিন্তু বাদুরের পাখার ক্ষেত্রে কোন কাজে আসেনা, তাই সে ভাবে স্পষ্ট জোড়া হাড় তাতে নাই। কিন্তু সেখানেও মূল হাড় একটি হলেও লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সরু একটি বাড়তি হাড় তার সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে– নেহাৎ পূর্বসূরি থেকে পাওয়া অতীতের চিহ্ন হিসেবে। মানুষের বৃহদন্ত্রের সঙ্গে ছোট্ট যে এপিভিক্স কোন কাজে লাগেনা, অথচ প্রদাহের ফলে কষ্ট দিলে ফেলে দিতে হয়। সেটিও এরকম প্রতীকী অঙ্গের একটি উদাহরণ যা পূর্বসূরিদের থেকে আমরা পেয়েছি, এর ব্যবহার আমাদের কাছে না থাকলেও। প্রাণির সঙ্গে প্রাণির দেহের মিলগুলো আরো চমৎকারভাবে দেখা যায় ভূমিষ্ঠ হবার আগে এদের ভ্রুণাবস্থা গুলোর তুলনা করলে। ভূমিষ্ঠ হবার পর যে সব প্রাণির চেহারা যথেষ্ট আলাদা তাদেরকেও ভ্রুণাবস্থায় চট করে আলাদা চিনতে পারা কঠিন, কারণ তাদের ভ্রুণের আশ্চর্য রকম মিল। ভ্রুণের বয়স যত বাড়ে পার্থক্য অবশ্য তত বাড়ে। যেন বিবর্তন ইতিহাসটিই এক একটি ভ্রুণের জীবনে পুনর্মঞ্চস্থ হয়ে চলেছে। প্রাণির জীবনে দেহন্মোয়নের প্রাথমিক পর্বে মৌলিক পর্যায়গুলো বিভিন্ন প্রাণির জন্য কিছুটা অভিন্ন বলেই এমনটি ঘটে।

প্রাচীন ও বর্তমান বহু রকম বিভিন্ন প্রাণির মাথার হাড় গঠন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এখানে হাড় সন্নিবেশের পরিকল্পনায় অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মাছ, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী এত ভিন্ন রকম প্রাণিদের মাথায় একই হাড়গুলো চিনে নেয়া যায়, আকৃতি ও বিন্যাসে পরিবর্তন সত্ত্বেও বানরের খুলির সঙ্গে মানুষের খুলি তুলনা করলে দেখা যায় মানুষের ক্ষেত্রে চোয়ালের হাড় ছোট হয়েছে খুলির হাড় অনেক বড় হয়েছে বড় মস্তিষ্কের জায়গা করে দেবার প্রয়োজনে। কিন্তু প্রত্যেকটি হাড় উভয়ক্ষেত্রে স্পষ্ট চিনে নেয়া যাচ্ছে।

বিবর্তন বৃক্ষ

শুরুতে বিবর্তনের সব সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো এসেছে ফসিল গবেষণা এবং বর্তমান জীব জগতের নানা প্রজাতির মধ্যে মিল অমিলগুলো লক্ষ্য করে। জীব বিবর্তন সম্পর্কে এক সময়ের দ্বিধার কারণও হলো ফসিলের উপর নির্ভরশীলতা। অতীতের সব জীবের দেহাবশেষ ফসিলে পরিণত হয়নি, অল্প কিছুই শুধু সেভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া সব ফসিল সব সময় আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়নি। ফসিলের আবিষ্কার একটি দৈবাৎ ব্যাপার– হঠাৎ করে এখানে ওখানে এরা উদ্ঘাটিত হয়। ফলে ফসিল থেকে পাওয়া ইতিহাসে অনেক বড় বড় ছেদ থেকে যাচ্ছিল। সেটি অনুসরণ করে বিবর্তনের যে পরম্পরায় পাওয়া যাচ্ছিল তাতে তাই মনে হচ্ছিল যে বিবর্তনের পরিবর্তনগুলো যেন বড় বড় লাফ দিয়ে ঘটে যাচ্ছে– যা মোটেই যৌক্তিক নয়। অনেক সময় পরবর্তী কালের বিভিন্ন জীবের সাধারণ পূর্বসূরিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলনা– যাকে বলা হয়ে থাকে 'মি-সিং লিংক্' বা খুঁজে না পাওয়া সংযোগ। আমাদের ফসিল জ্ঞানের সম্ভার অবশ্য ক্রমেই বেড়েছে এবং ঐ খুঁজে না পাওয়া সংযোগগুলো, কিংবা লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়া পরিবর্তনের মধ্যবর্তীদের ফসিলও অনেক ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া গেছে, এখনো পাওয়া যাচ্ছে। ফলে এখন প্রায় নিখুঁতভাবে তৈরি হয়ে গেছে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত জীব-বিবর্তনের প্রায় নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরায়গুলো, অন্তত যখন থেকে ভাল ফসিল পাওয়া গেছে সেই আমলে শুরু করে। তাছাড়া এখন এর জন্য একক ভাবে ফসিলের উপর নির্ভরও করতে হচ্ছেনা আমাদের। ডি এন এ আবিষ্কার এবং জেনেটিক বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির ফলে আমরা এখন জীবের সঙ্গে জীবের মিল-অমিলগুলো শুধু বাহ্যিক ভাবে নয় তার জেনেটিক নীলনক্সা থেকেও নিখুঁতভাবে বুঝতে পারছি।

একটি জিনিস বেশ স্পষ্ট– বিবর্তন অধিকাংশ সময় ক্রমে জীব জগতে বেশি বেশি বৈচিত্র নিয়ে এসেছে, আগের অল্প কিছু প্রজাতি থেকে পরে অনেক বেশি বেশি প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে সব সময় কিছু কিছু প্রজাতি বিলুপ্তও হয়েছে। বিবর্তনের অগ্রসর হবার চিত্রকে আমরা একটি বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করতে পারি– তথাকথিত বিবর্তন বৃক্ষ। বৃক্ষের উপমায় মনে করতে পারি এটি নিচ থেকে উপরের দিকে এগিয়েছে। গোড়াতে একই কাণ্ড কিন্তু তারপর থেকেই শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে। এর যে কোন শাখা বা প্রশাখার তিনটি পরিণতি হতে পারে। সেটি যেভাবে রয়েছে সেভাবে অনেকদিন এগুতে পারে। অর্থাৎ জীবের সেই প্রজাতি বহু কাল প্রায় অপরিবর্তিত থেকে যেতে পারে। একে বলা হয় স্থিতি। কোন কোন প্রাণি এরকম দীর্ঘ স্থিতি পেয়েছে বহু কোটি বছরের জন্য– যেমন কচ্ছপ। তেলাপোকা সম্পর্কেও একথা বলা হয়। কোন শাখার বা প্রশাখার আর একটি পরিণতি হতে পারে বিলুপ্তি। ওটির অগ্রভাগ থেমে যায় আর এগুয়না, আর কোন শাখাও বিস্তার করেনা। শাখার তৃতীয় পরিণতি হতে পারে অন্য প্রজাতিতে পরিবর্তন। এরকম সব সময় ঘটছে– শাখা থেকে আরো শাখা, তাদের থেকে আরো শাখা। এভাবেই এত বৈচিত্র সৃষ্টি হয়েছে। এটি কী প্রক্রিয়ায় ঘটেছে সেটি আমরা পরে বিস্তারিত দেখবো। তবে ঐ যে বলেছি, এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতি বৃক্ষের শাখা বিস্তারের মত, তা অবশ্য এক শাখার হঠাৎ দুই শাখা হওয়া নয়। বরং দীর্ঘ সময় ধরে একটু একটু পরিবর্তিত হতে হতে এটি ঘটে– মাঝখানে অনেক মধ্যবর্তী প্রকার



সরীসৃপের বিবর্তন

থাকে। আসলে বির্বতন-বৃক্ষের পুরো ব্যাপারটিই সহজ উপমা ব্যবহারের জন্যই বলা হচ্ছে। বৃক্ষ বলতে চট করে যা আমাদের মনে হয়, এটি সে রকম সরল প্রকৃতির নয়। তাকে আম গাছের মত একটি সরল কাণ্ডের মনে না করে বরং বট গাছ অথবা ঝোপের মত মনে করলেই ভাল। একেবারে গোড়ার দিকে থেকেই নানা শাখা সৃষ্টি হয়ে সেগুলো উঠে এসে আরো শাখায় বিভক্ত হয়েছে এমনও প্রচুর ঘটেছে। ফসিলের সীমাবদ্ধতার কারণে শাখার পরম্পরায়গুলোও সব ক্ষেত্রে উদ্ঘাটিত নয়। যেমন হয়তো কোন ফসিলের কাঙ্খিত পূর্বসূরির ফসিল আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু তার সেই অনাবিষ্কৃত পূর্বসূরির অন্য শাখার সমসাময়িক পরবর্তীদের ফসিল উদ্ঘাটিত হয়েছে, অর্থাৎ কিনা তার 'কাজিনের'– যার বৈশিষ্টগুলো থেকে অজানা শাখাগুলোকেও আন্দাজ করে নেয়া যায়।

বিবর্তন বৃক্ষকে ধাপে ধাপে সরল গতিতে এগুনো মনে করে অনেকে ভুল করেন। যেমন উভচর থেকে সরীসৃপ, তারপর সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী আর পাখি সৃষ্টি হয়েছে– ব্যাপারটি ওরকম নয়। বরং এরা সবাই আরো অতীতে পায়ের মত চার অঙ্গ বিশিষ্ট মাছ-সদৃশ মেরুদণ্ডি প্রাণি থেকে উৎসারিত নানা শাখা থেকে এসেছে। এক শাখা বিবর্তিত হয়ে এগিয়েছে ব্যাং এর পূর্বসূরি হবার দিকে, আর এক শাখার বৈশিষ্ট হলো এরা শক্ত খোলসের মধ্যে তরলপূর্ণ ডিম দেয়। শেষোক্তদের একটি শাখা থেকে সরীসৃপ ও পাখির সাধারণ পূর্বসূরি এসেছে, যারা পরে বিভক্ত হয়েছে। আর এর অন্য শাখা থেকে এসেছে স্তন্যপায়ী যারা সেই তরলকে ডিমের খোলসের মধ্যে না রেখে বরং তরলকে ও বাচ্চাকে নিজের গর্ভে রাখার ব্যবস্থা করেছে। দেখা যাচ্ছে যে যেই শাখা স্তন্যপায়ী সৃষ্টি করেছে সেটি বরং সরীসৃপ সৃষ্টিকারী শাখার আগেই পৃথক হয়েছে। কাজেই এক রকম সরীসৃপ

থেকে পরে স্তন্যপায়ী সৃষ্টি হয়েছে সরলভাবে এমন কথা বলা যায়না। বৃক্ষের উপমা সহজভাবে বুঝতে সাহায্য করে বটে, তবে প্রকৃত বিষয়ের জটিলতাও স্মরণে রাখতে হবে।

বিবর্তনের কিছু চমক : স্থানে ও কালে

বিবর্তন বৃক্ষের জটিলতা সম্পর্কে যা বল্লাম তা অনেক সময় বেশ চমকপ্রদ ভাবে প্রকাশ পায়। ১৯৩৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের কাছের সমুদ্রে জালে ধরা পড়লো অদ্ভুত একটি মাছ– যার চল্লিশ কোটি বছর পুরানো ফসিল আগেই পাওয়া গিয়েছিল। এ মাছের পাখনাগুলো বেশ মাংসল চারটি পিণ্ডের মত দেহ থেকে বের হয়ে আসে যেন পরবর্তীতে পায়ে পরিবর্তিত হবার প্রস্তুতিতে। এরকম মাংসল পাখনার মাছ সে যুগে যথেষ্ট ছিল, এবং এরা পরে উভচর ইত্যাদিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তাদের হুবহু একই রকম বংশধর যে ৪০ কোটি বছর পরেও টিকে থাকবে এ কথা কেউ ধারণা করেনি। সীলাকান্ত নামের এই অদ্ভুত মাছকে তাই সবাই জীবন্ত ফসিল বলতে লাগলো। পরে এই সীলাকান্ত আরো বেশ কয়েকটি নানা জায়গায় ধরা পড়েছে। প্রাচীন কোন প্রজাতি বিবর্তিত হয়ে গেলেও এর মূল রূপটি যে কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল বিলুপ্ত নাও হতে পারে, এই জীবন্ত ফসিল তাই প্রমাণ করেছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা বিবর্তনকে একটি ধারায় অগ্রসর হতে দেখলেও, সে ধারার অনেক ব্যতিক্রমও সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে। যেমন জীব পানিতেই প্রথম সৃষ্টি হয়েছে এবং এক সময় সেখানে বিবর্তিত কিছু শাখা ডাঙায় উঠে এসেছিল যারা স্থলের প্রাণি ও উদ্ভিদের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এর বহু কোটি বছর পরে স্থলের প্রাণি থেকে বিবর্তিত কিছু প্রজাতি এমন ভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে তারা আবার পানিতেই ফেরত গেছে। আজকের সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীগুলোর ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। যেমন আজকের তিমি এসেছে মোটামুটি আজকের কুকুর সাইজের একটি প্রাচীন বিলুপ্ত স্তন্যপায়ীর বিবর্তনের ফলে। কোটি বছর ধরে ধাপে ধাপে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আচরণ ইত্যাদি পরিবর্তিত হতে হতে তা আবার পানির উপযুক্ত হয়েছে। পানির বাসিন্দা হয়ে এটি মাছের অবয়ব নিয়েছে– যদিও প্রাণি হিসাবে এটি স্তন্যপায়ী, বিবর্তনের ধারায় মাছের থেকে অনেক দূরে।

বিবর্তন ক্রমে বৈচিত্র সৃষ্টি করে– এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু বিবর্তন কখনো কখনো বৈচিত্র কমিয়ে এনে সাদৃশ্যও সৃষ্টি করেছে, অন্তত আপাত দৃষ্টিতে। এভাবে বিবর্তনের বিবেচনায় পরস্পর থেকে অনেক দূরবর্তী প্রজাতি একই অবয়ব ও আচরণের অধিকারী হতে যেতে পারে, এই বিবর্তনেরই মাধ্যমে। যেমন হাঙ্গর, ডলফিন এবং পেঙ্গুইন– এই তিনটির প্রথমটি মাছ, দ্বিতীয়টি স্তন্যপায়ী, তৃতীয়টি পাখি। অথচ পানিতে থাকতে গিয়ে এরা সবই মাছের মত বাধাহীন চলাচলের উপযুক্ত আকৃতি পেয়েছে। আরো একটি চমকপ্রদ ও ব্যাপকতর উদাহরণ হলো স্তন্যপায়ীদের দুটি শাখা– একটিকে বলে প্লাসেন্টাল যাদের ভ্রূণ মায়ের গর্ভে ফুলের ও নাড়ির সাহায্যে যুক্ত থাকে আর সন্তান পূর্ণাঙ্গ হয়ে জন্ম নেয়, আর অন্যটিকে বলে মারসুপিয়াল যার অপরিপূর্ণ সন্তান জন্ম নিয়ে মায়ের পেটের বিশেষ থলিতে থাকে বেশ বড় না হওয়া পর্যন্ত। দ্বিতীয় শাখার স্তন্যপায়ীরা অষ্ট্রেলিয়ার আর দক্ষিণ আমেরিকায় বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে– অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারু, কোয়ালা

ইত্যাদি যার বিখ্যাত উদাহরণ। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ভিন্ন জায়গায় বিকশিত হলেও বিভিন্ন প্লাসেন্টাল স্তন্যপায়ীর সঙ্গে প্রায় হুবহু একই দেখতে এবং একই আচরণের তার মারসুপিয়াল প্রতিপক্ষ বিবর্তিত হয়েছে। যেমন উড়ুক্কু কাঠবিড়ালির সঙ্গে মারসুপিয়াল উড়ুক্কু কাঠবিড়ালির, গ্রাউণ্ড হগের সঙ্গে ওমবাটের, ইঁদুরের সঙ্গে মারসুপিয়াল ইঁদুরের, ইত্যাদি। ভিন্ন জায়গায়, ভিন্ন পূর্বসূরি থেকে বিবর্তিত হয়েও শুধু একই রকম পারিবেশিক চাপে একই রকম হয়ে উঠেছে বলে এরা একাভিমুখি (কনভার্জেন্ট) বিভিন্ন ধারার বিবর্তনের উদাহরণ।

বিবর্তনের একটি সুন্দর সাক্ষ্য হলো এক একটি প্রজাতির বিবর্তন ইতিহাসে স্থানের মধ্যে তার বন্টনের ধারাবাহিকতা ; একটি প্রাণি যেখানে ছিল তার বিবর্তিত উত্তরসূরিরা হয় সেখানে থাকবে নইলে ক্রমে ক্রমে তার সংলগ্ন জায়গাগুলোর মধ্য দিয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়বে। এমন যদি হয় যে তার বিবর্তিত উত্তরসূরিকে পাওয়া যাচ্ছে বহু হাজার মাইল দূরে, মাঝখানে তাদের অস্তিত্বের কোন ফসিল বা চিহ্ন নাই, সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রাণিটি প্রথমটি থেকে বিবর্তিত হয়েছে তা বলা যৌক্তিক হবেনা। যেমন উটের ক্ষেত্রেই ধরা যাক। এক কুঁজ বিশিষ্ট উট এখন রয়েছে পুরো উত্তর আফ্রিকা থেকে আরব হয়ে ভারত পর্যন্ত। আবার এর সংলগ্ন মধ্য এশিয়া চীনের গোবি মরুভূমিতে রয়েছে দুই কুঁজ বিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়ান উট। দক্ষিণ আমেরিকায় রয়েছে অপেক্ষাকৃত ছোট লামা, আলপাকা ও গুয়ানাকে। এরা যে সবই একই পূর্বসূরি উট জাতীয় প্রাণি থেকে বিবর্তিত সেটি তাদের মধ্যে নানা সাক্ষ্য প্রমাণে স্পষ্ট। কিন্তু বিপত্তি হচ্ছিল একটি জায়গায়। উত্তর আফ্রিকা, এশিয়া থেকে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বিস্তৃত হতে গেলে মাঝ পথে উত্তর আমেরিকা অতিক্রম করতে হয়– অন্য কোন ভাবে যাওয়ার উপায় নাই। কিন্তু উত্তর আমেরিকায় বর্তমানে কোন ধরনের উট নাই। পরে অবশ্য উত্তর আমেরিকায় উটের ফসিল আবিষ্কৃত হওয়াতে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়েছে। শুধু তাই নয় ফসিলের বয়স দেখে বুঝা যাচ্ছে যে আজকের সব উট প্রজাতির পূর্বসূরি বাস করতো উত্তর আমেরিকায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে তার জন্মভূমিতেই বিলুপ্ত হয়েছে উট।

বিবর্তনের আবিষ্কার আমাদেরকে অভিন্ন জীবজগত হিসাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছে। এখানে কোন প্রজাতির বৈশিষ্টকে একেবারে অনড় জিনিস হিসেবে মনে না করে তার নানা গোষ্ঠির মধ্যেও যে প্রচুর বৈচিত্র রয়েছে সেদিকে সৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছে। এই বৈচিত্রগুলোই যে বহু বছরে বহু প্রজন্মের ধারাবাহিকতায় ঐ প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতি সৃষ্টি করিয়েছে সেটি আমরা একটু পর দেখবো।

বিবর্তনের মূলে জেনেটিক বিবর্তন

সকল জীবে একই ভঙ্গির ও অনেকাংশে অভিন্ন ডিএনএ নীলনক্সা, এবং বিশেষ করে সবার জন্য একই কোডন অভিধান আবিষ্কারের পর সকল জীবের অভিন্ন উৎস সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে। মানুষসহ আজকের অনেক জীবের মধ্যেই রয়ে গেছে সেই আদি জীব ব্যাকটেরিয়ার প্রায় একই অনেক জিন। ডিএনএর চারটি বেইসের ভাষায় লেখা জিন অর্থাৎ নীলনক্সার এককগুলো এভাবে জীব থেকে জীবে চলে গেছে। তবে সর্বাংশে একই থাকেনি এরা। যদি থাকতো তা হলে বিবর্তনই হতোনা, নূতন নূতন গুণ আর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এত রকমের জীব সৃষ্টি হতোনা। জিনের এই সীমিত পরিবর্তনগুলোই সুযোগ এনে দিয়েছে জীব-বিবর্তনের। ডি এন এ উদ্ঘাটন ভিত্তিক আধুনিক জেনেটিক বিজ্ঞান বিবর্তনকে নিখুঁতভাবে দাঁড় করাতে পারার সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তন অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং অনেক বেশি সুস্পষ্ট বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফসিল সীমাবদ্ধতা ইত্যাদির কারণে বিবর্তন নিয়ে যেখানেও বা অনুধাবনের কিছু অভাব ছিল, তা দূর করে দিয়েছে এই জেনেটিক ব্যাখ্যা। বিবর্তনের ভিত্তিতে ছাড়া আজকের জীববিজ্ঞানকে অন্য কোন ভাবে দেখা অসম্ভব।

মানুষের এবং আরো বহু রকম প্রাণির সম্পূর্ণ ডিএনএ পরম্পরায় অর্থাৎ জেনোম উদ্ঘাটন সম্প্রতি শেষ হয়েছে। কাজ চলছে অন্য অনেক জীবের ক্ষেত্রে। জেনোম হলো জীব কোষের সবগুলো ক্রোমোজোমে থাকা সব জিনের সমষ্টি। জেনোম উদ্ঘাটনের অর্থ হলো তার সব জেনেটিক বার্তার পাঠোদ্ধার করে তা সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারা। বর্তমান শতাব্দীর একেবারে শুরুতে মানব জেনোম উদ্ঘাটনের সম্পূর্ণকরণ বিজ্ঞানের জগতে একটি বিরাট ঘটনা। মানুষ ছাড়াও ২০০৮ সালের মধ্যে জেনোম উদ্ঘাটন সম্পন্ন হয়েছে শিম্পাঞ্জি, মেকাক বানর, ইঁদুর, কুকুর, গরু, ঘোড়া, অপোসাম, প্লাটিপ্লাস, মুরগি, সবুজ টিকটিকি, সী-আরচিন, মশা, ফ্রুট ফ্লাই, এবং মৌমাছি। এরপর উদ্ঘাটনের কাজ চলেছে উল্লুক, বেবুন, ছোট বাদুড়, হাতি, বিড়াল, গিনিপিগ, শূকর, জেব্রা, চড়ুই, ব্যাং, সীলাকান্ত ও জেব্রা ফিশের উপর, তারপর আরো অন্যান্য জীবের। এ কাজের জন্য প্রাণিদের মধ্যে অগ্রাধিকার ঠিক করা হয়েছে জেনেটিক গবেষণার কাজে তাদের গুরুত্বের উপর। তুলনামূলক গবেষণার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠির প্রতিনিধিমূলক প্রাণিগুলোকেই বেছে নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রাণির জেনোমকে মিলিয়ে দেখে বিবর্তনের অনেক কাহিনী উদ্ঘাটন এখন সম্ভব হচ্ছে। আরো যত জীবের সম্পূর্ণ জেনোম পঠিত হবে, নানা জিনের কাজ সম্পর্কে ও নানা জীবের মধ্যে এগুলোর ধারাবাহিকতা সম্পর্কে ততই আরো ভাল জানা যাবে।

এখন আমরা জানি জেনোমের দিক থেকে মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জির পার্থক্য মাত্র শতকরা ১.২ ভাগ। প্রাণি হিসেবে এদের মধ্যে বিশাল বিশাল সব পার্থক্য থাকলেও, উভয়ের পূর্বসূরিরা অন্তত ৫০ লক্ষ বছর আগে পৃথক হয়ে পৃথক ধারায় বিবর্তিত হলেও, এই সাদৃশ্য প্রমাণ করে যে বিবর্তন মূল জেনেটিক নক্সাকে অক্ষত রেখেই এতে অল্প পরিবর্তনে অনেক বড় বড় বাস্তব পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। এর একটি কারণ হলো এতে জেনেটিক নীলনক্সার বার্তাটিই শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, এই বার্তা কী ভাবে প্রকাশিত হবে কি হবেনা তার নিয়ন্ত্রণটিও গুরুত্বপূর্ণ। এই নিয়ন্ত্রণটিও ডি এন এর ভাষাতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং বিবর্তিত হয়েছে ঐ জেনোমের মধ্যে। তবে তা সম্পূর্ণ জেনোমের অল্প অংশই দখল করে থাকে। অথচ সেটাই বড় ভূমিকা পালন করেছে শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষকে আলাদা করতে।

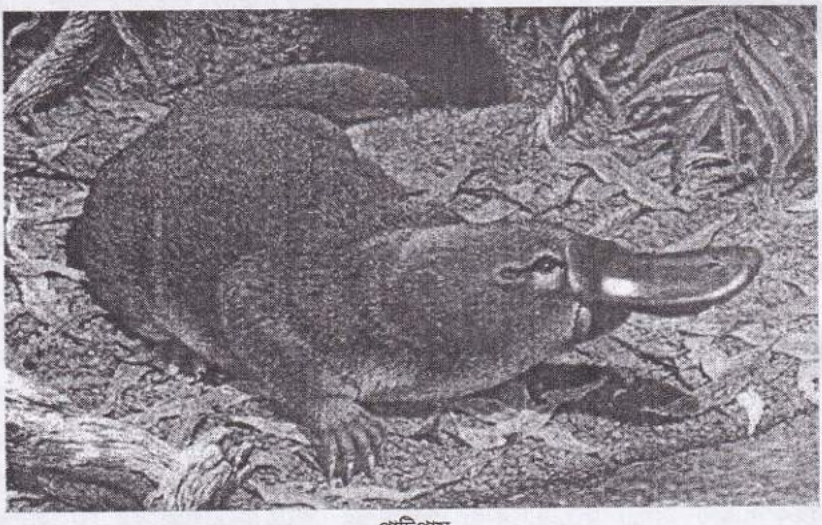


বিবর্তনে কাছাকাছি দুটি প্রাণির জেনোম পার্থক্যের এই শতকরা হিসাব থেকেই এখন জানা সম্ভব হচ্ছে এই দুই প্রাণির পূর্বসূরিরা কত প্রজন্ম আগে একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক ধারায় এগিয়েছে। মানুষ ও শিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ বছরের হিসেবটা এভাবেই পাওয়া গেছে। অবশ্য এর জন্য স্বাধীনভাবে আর একটি হিসাব দরকার হয়েছে তা হলো শতকরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জেনোম পার্থক্য সৃষ্টি হতে কত বছর লাগে তার হারটি নির্ণয়। অন্য প্রাণির ক্ষেত্রে ফসিল তথ্য থেকে জানা বিচ্ছিন্ন হবার বয়স ও তাদের জেনোম পার্থক্য থেকে এই হার পাওয়া গেছে। একে বলা হয় আণবিক ঘড়ি বা এক ধরনের জেনেটিক ঘড়ি। এই ঘড়ির হিসেবে এখন জানা যাচ্ছে এক জীব থেকে অন্য জীবের বিবর্তনগত দূরত্ব বা নৈকট্য।

বিবর্তনে পরিবর্তন ঘটছে জিনের পর্যায়ে। তারই ফলশ্রুতিতে জেনেটিক বার্তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটছে তার দেহে ও আচরণে। প্রথমটি অর্থাৎ জীবের জেনেটিক পরিচয় হচ্ছে তার 'জেনোটাইপ' অর্থাৎ জিনগত প্রকার, আর তার দেহ ও আচরণ গত পরিচয় হচ্ছে তার 'ফেনোটাইপ' অর্থাৎ বাস্তবে প্রকাশিত প্রকার। এই দুই মিলিয়ে দেখতে পারার সুবিধা এখন বিবর্তনের নানা খুঁটিনাটিকে স্পষ্ট করে তুলতে পারছে।

প্লাটিপ্লাসের জেনোম উদ্ঘাটন : একটি শিক্ষণীয় উদাহরণ

অষ্ট্রেলিয়ার অদ্ভুত প্রাণি প্লাটিপ্লাসের জেনোম উদ্ঘাটন সম্পূর্ণ করে তা প্রকাশিত হয়েছে ২০০৮ সালে। এর ফলে বিশেষ করে স্তন্যপায়ী বিবর্তন সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ নানা আলোকপাত হয়েছে। হাঁসের সাইজের হাঁসমুখো প্রাণি প্লাটিপ্লাস অত্যন্ত কৌতূহলদ্দীপক – কারণ তাকে বলা যায় যেন নানা বিভিন্ন গোষ্ঠির প্রাণির এক এক অংশ এনে, ওদের এসব স্পেয়ার পার্টস একত্র করে, প্রাণিটি তৈরি হয়েছে। এটি অংশত জলচর, বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায় – সেদিক থেকে স্তন্যপায়ী, কিন্তু ডিম পাড়ে সেদিক থেকে ডিম পাড়া প্রাণিদের মত, এর ঠোঁট হাঁসের মত চেপ্টা, এতে সাপের মত বিষ আছে– ইত্যাদি অদ্ভুত সব সমন্বয়। প্লাটিপ্লাস গর্ত করে ডিম পাড়ে বেশ ছোট, মাত্র চার মিলিমিটারের মত। ডিম ফুটে যে খুব ছোট্ট বাচ্চা তা প্রায় ভ্রুণাবস্থার, মারসুপিয়ালের মত দেহ সংলগ্ন রেখে পেটের চামড়া থেকে উৎপন্ন দুধ খাইয়ে সে বাচ্চাকে বড় করে।



প্লাটিপ্লাস

জেনোম উদ্ঘাটনে দেখা গেছে দুধ সৃষ্টিতে এদের যে জিন তা অন্য সব স্তন্যপায়ীর অনুরূপ। ডিমের জন্য যে জিন তা কিছুটা পাখির, কিছুটা ব্যাং এর মত উভচরের, এবং কিছুটা মাছের অনুরূপ। বিষের জন্য যে জিন তা সরীসৃপের অনুরূপ। প্রোটিন গঠনের কিছু বৈশিষ্টে এর জিন মারসুপিয়াল স্তন্যপায়ীদের মত। জেনোম উদ্ঘাটন থেকে পাওয়া তথ্য ঐ আণবিক ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে প্লাটিপ্লাস বিবর্তনের যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা মোটামুটি এরকম। প্রায় ৩১ কোটি বছর আগে আদি উভচরের পূর্বসূরিদের নানা শাখা থেকে আসা যে শাখা তরল-সমৃদ্ধ ডিম দেবার মত প্রাণির উৎস ছিল, সিনাপসিড নামের তারই একটি প্রশাখা দুধ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। মনে করা হচ্ছে যে দুধের সৃষ্টি আরো আগের প্রাণিতে সৃষ্টি হয়েছিল প্রধানত নরোম খোসার ডিমকে ভিজিয়ে রাখার প্রয়োজনে। সিনাপসিড থেকে ১৭ কোটি বছর আগে দুটি শাখা পৃথক হয়েছে– একটি প্লাটিপ্লাস জাতীয় প্রাণিতে আর অন্যটি স্তন্যপায়ীদের পূর্বসূরি সৃষ্টিতে। প্লাটিপ্লাসের

শাখায় ডিম পাড়ার জিনগুলোও কিছুটা অক্ষত রয়ে গেছে, তেমনি রয়ে গেছে আরো আগের সরীসৃপ পূর্বসূরিদেরও কিছু জিন। দুধের ব্যাপারেও প্লাটিপ্লাস আরো প্রাচীন ডিম ভেজাবার জিনও রেখে দিয়েছে। তাই একাধারে এটি দুধকে ডিম ভেজাবার কাজে ও বাচ্চার পুষ্টির জন্য ব্যবহার করতে পারে। স্পষ্টত বিবর্তন নানা দিকে নানা ভাবে এগুতে পারে, আবার এগুতে গিয়ে প্রাচীন জিনগুলোকে অক্ষতও রেখে দেয় অনেকটা।

বার্তা সম্পাদকের ভূমিকায় বিবর্তন

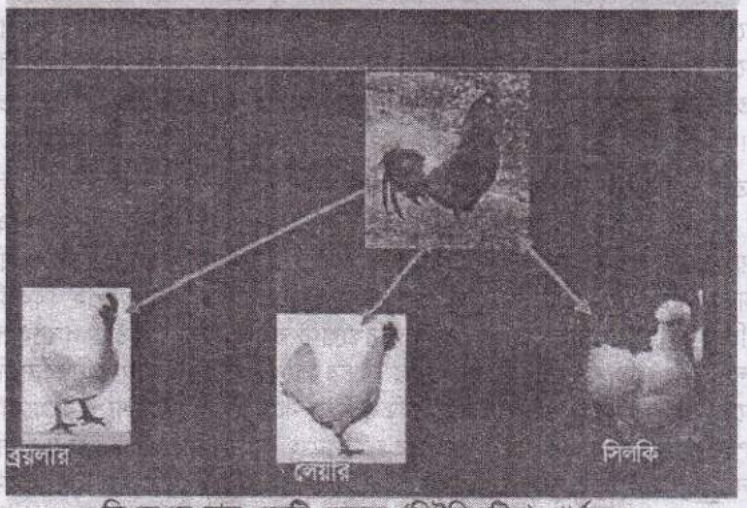
বিবর্তনকে দেখা যায় পুরানো জেনেটিক বার্তা সম্পাদনা করার কাজ হিসাবে– যদিও এটি বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশের পক্ষপাতিত্বের ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে চলেছে। বার্তার সম্পাদনা ঘটে আগে থেকে থাকা খসড়ার উপর। আসলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জেনেটিক প্রতিলিপি তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক এরকম পরবর্তী খসড়া তৈরি হয়ে চলেছে। বিবর্তন যে সম্পাদনা করে তা হলো পুরানো খসড়ার অল্প কিছু পরিবর্তন করে তাকে নূতন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ব্যবস্থা করে দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাজার হাজার বছর ধরে তেমন কোন পরিবর্তনই হয়না। জিনে গড়া জেনোটাইপে পরিবর্তন না হলে ফেনোটাইপে অর্থাৎ বাস্তব প্রকাশেও কোন পরিবর্তন হয়না। এভাবেই এক একটি প্রজাতি হাজার, এমনকি লক্ষ বছর ধরে অপরিবর্তিত থেকে যেতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে একটু একটু করে পরিবর্তন হতে থাকে, খসড়াগুলো সম্পাদিত হয়ে সামান্য ভিন্ন রূপ ধারণ করতে থাকে। এই জেনেটিক পরিবর্তনের ফল বাস্তবেও দেখা যায় একটু একটু করে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে।

পরিবর্তন নানা দিকেই হয়, তবে সেগুলোই টিকে থাকে যেগুলো পরিবেশের সঙ্গে ভাল খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বাকিগুলো বিলুপ্ত হয়। তাছাড়া পরিবেশ বড় রকমে বদলে গেলে যে সব খসড়ার উপর আদৌ কোন সম্পাদনা হয়নি তাও টিকে থাকতে পারেনা। আসলে দীর্ঘ মেয়াদে জীবের প্রজাতিগুলোর মধ্যে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনাই বেশি। বিলুপ্তি এড়িয়ে যারা অনুকূল ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, টিকে থেকে সন্তান উৎপাদন করে যেতে পারে, সন্তানরাও টিকে থাকতে পারে, তারাই পরবর্তী প্রজাতিগুলোতে পরিণত হয়।

বিবর্তন তাই ঘটে দুটি পদক্ষেপে। প্রথমটি হলো বৈচিত্র সৃষ্টি, অর্থাৎ সম্পাদনার জন্য নানা খসড়া সৃষ্টি। দ্বিতীয়টি হলো সেই বৈচিত্রের মধ্য থেকে টিকে থাকার জন্য সহায়কগুলোকে নির্বাচন করা। প্রথম পদক্ষেপটি একেবারেই দৈবাৎ ইতস্তত ঘটনা– তা কীভাবে সৃষ্টি হয় একটু পরে আমরা দেখবো। প্রধানত এর ফলেই বিবর্তন একটি অনিশ্চিত প্রক্রিয়া– যাকে আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়না। দ্বিতীয় পদক্ষেপটি দৈবাৎ ঘটেনা, বরং পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেই ঘটে– কোন্ পরিবর্তনগুলো টিকে থাকতে সহায়ক হবে তা সেই পরিস্থিতিই ঠিক করে দেয়। অবশ্য এর মধ্যেও কিছুটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। যেমন বড় দৈব দুর্বিপাকে পাইকারি প্রজাতি বিলুপ্তির সময় সময় কোন কোন প্রজাতির নানা বৈচিত্রের মধ্যে যেগুলো দৈবাৎ বেঁচে যায় সেগুলোর থেকেই শুধু পরে নির্বাচিত বা সম্পাদিত হতে পারে। তাই মোটের উপর বিবর্তন জিনিসটিই অনিশ্চিত জিনিস।

বৈচিত্রের নানা উৎস

জীবদেহে এক একটি গুণ নির্ধারণ করা এক একটি জিন নানা রূপে থাকতে পারে যার প্রত্যেকটিকে ঐ জিনের এক একটি 'এলেল' বলা হয়। এভাবে একই প্রজাতির এক একটি দলে নানা সদস্যের মধ্যে ঐ রকম একটি জিনের নানা এলেল থাকতে পারে। যেমন আমাদের চুলের রঙের জন্য যে জিন তার কালো, খয়েরি, লাল, সোনালি নানা রঙের চুল দেবার মত নানা এলেল থাকতে পারে। আদিতে স্বাভাবিক অবস্থাতেও দলের সদস্যদের মধ্যে এ জিনের এসব নানা বৈচিত্র ছিল। তবে এটি যার যেমন আছে সব সময় একই রকম থেকে যাবে এমন কথা নেই। এর একটি বড় কারণ জিন মিউটেশন– অর্থাৎ জিনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটা। জিনের প্রতিলিপি তৈরির সময় ইতস্তত কিছু ভুল ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা সব সময় থাকে। আর ডি এন এর সহজাত ভুল সংশোধনের পদ্ধতিতে সেগুলো শুদ্ধও করা হয়ে যায়। আমাদের দৈনন্দিন ভাষার কোন লিপি নকল করার সময় ইতস্তত ভুল হওয়া এবং এক ধরনের প্রুফ রিডিং এর মাধ্যমে তা শুদ্ধ করার অনুরূপ এটি। শুদ্ধ করার এই ব্যবস্থা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে কিছু কিছু ভুল জিনের মধ্যে থেকে যায়। এগুলোই মিউটেশন বা পরিবর্তন। ডি এন এর বেইস পরম্পরায়ে কোন বেইস বাদ পড়ে, কোনটি নূতন যোগ হয়ে, বা উল্টাপাল্টা হয়ে এমন ঘটতে পারে। জেনোটাইপ পর্যায়ে এটি ঘটলে ফেনোটাইপেও তার প্রভাব পড়তে পারে অর্থাৎ ঐ জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাস্তব অবস্থাটি মিউটেশনের ফলে বদলে যেতে পারে। ফলে একটি নূতন বৈশিষ্ট দেখা দিতে পারে ঐ প্রজাতির ঐ সদস্যের মধ্যে। এভাবে মিউটেশনের ফলে দলের মধ্যে আগের এলেলগুলোর প্রাচুর্যে হেরফের হতে পারে, নূতন এলেলের সৃষ্টিও হতে পারে। যেমন উদাহরণস্বরূপ মুরগির ক্ষেত্রে ডিএনএর একটি মাত্র বেইসের হেরফেরে মিউটেশনের ফলে তার ডিম পাড়ার আধিক্য (লেয়ার মুরগি), অথবা মাংসল হবার প্রবণতা (ব্রয়লার মুরগি) অথবা তুলতুলে রেশমি পালক সৃষ্টির প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে



ডিএনএর মাত্র একটি এককে (নিউক্লিওটিড) পার্থক্যও
অবয়বে ও গুরুত্বে বড় বৈচিত্র আনতে পারে

থাকে– যা মুরগি পালনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে মিউটেশন বৈচিত্র সৃষ্টির একটি বড় উৎস। যদি প্রজনন কোষে মিউটেশন ঘটে (যেমন যৌন প্রজননের ক্ষেত্রে ডিম্ব বা শুক্র কোষে), তবে প্রজন্মের পর প্রজন্মে ঐ পরিবর্তিত জিনটিই চলে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে তা বিবর্তনের আওতায় আসতে পারে। দৈবাৎ ভুলের জন্য মিউটেশন সাধারণত সৃষ্টি হলেও অস্বাভাবিক কিছু কারণে যেমন এক্সরে বা তেজষ্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে অথবা অন্যান্য কিছু রাসায়নিক বা ভৌত প্রভাবে দ্রুত অনেক মিউটেশন সৃষ্টি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রায়ই তার প্রভাব ক্ষতিকর হয়।

যদিও মিউটেশনই হলো জিনে বৈচিত্র সৃষ্টির বড় উৎস, তবে বাস্তব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফেনোটাইপে তার প্রকাশের ক্ষেত্রে বৈচিত্র সৃষ্টিতে আরো ভূমিকা রাখে যৌন প্রজননে পিতৃ ও মাতৃ জনন কোষে জিনের ইতস্তত মিশ্রণের ফলে। সন্তান একই জিনগুলোর বিভিন্ন এলেল সমন্বয় বাবা ও মা থেকে পেতে পারে। বাবা ও মায়ের জনন কোষ সৃষ্টির সময় মেইওসিস নামক অদ্ভুত জটিল প্রক্রিয়ায় শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয়ে মূল কোষের ক্রোমোজোমের প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাজনটি ঘটে। এতে প্রতিলিপি তৈরির পর সদৃশ ক্রোমোজোমগুলো সংলগ্ন হয়ে পরস্পরের সঙ্গে ইতস্তত অংশ বিনিময় করে – যাকে বলা হয় 'ক্রসিং ওভার'। ফলে তাসের শাফলিং এর মত এক দফা জিনের শাফলিং এখানে ঘটে। এ অবস্থায় তারা দুটি কোষে বিভাজিত হয়। এতে প্রত্যেক কোষেই অংশ অদল বদল করা দুই সেট ক্রোমোজোমই থাকে। দ্বিতীয় বিভাজনের সময় পরিবর্তিত সদৃশ ক্রোমোজোম জোড়ার প্রত্যেকে আবার সৃষ্ট দুই কোষের ইতস্তত কোনটি এটিতে আর অন্যটি অন্যটিতে চলে যায়। এখানেও দ্বিতীয় দফা আর এক রকমের শাফলিং হয়। এ অবস্থায় ঐ দ্বিতীয় বিভাজনে মোট চারটি কোষের সৃষ্টি হয় এবং সেভাবে কোষগুলো সাধারণ কোষের দুই সেট ক্রোমোজোমের বদলে জনন কোষের এক সেট ক্রোমোজোমে পরিণত হয়। এখানে এক একটি জনন কোষের জিনের বন্টন এক এক রকম হয় উপরের শাফলিংগুলোর ফলে। এর কারণে সন্তান হবার সময় কোন্ শুক্র কোষটি ও কোন্ ডিম্বকোষটি ব্যবহৃত হলো সেই অনুযায়ী নানা বৈচিত্র সৃষ্টি হয়। মিউটেশন ও উপরের যৌন প্রজনন পদ্ধতিতে মিশ্রণ ও শাফলিংগুলোর মাধ্যমেই বৈচিত্রের প্রধান উৎস তৈরি হয়। অবশ্য যে সব প্রজাতিতে শুধু অযৌন প্রজনন হয় সেখানে শুধু মিউটেশনই বৈচিত্রের উৎস।

একটি জিনের প্রকাশ এবং বিবর্তনে সেটি নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা শুধু জিনটির নিজের উপরেই নির্ভর করেনা, বরং জেনোমের অন্যান্য জিনের সঙ্গে তার বিক্রিয়ার উপরও নির্ভর করে। কাজেই বাস্তবে ফেনোটাইপে তার ফলে যা হয় তা কিছুটা জিনগুচ্ছের সম্মিলিত প্রভাবের উপরও নির্ভর করে। এ কারণে এক একটি মিউটেশনের বাস্তব ফলাফল সেটি ক্রোমোজোমে কোথায় হয়েছে এবং যৌন প্রজননের শাফলিংগুলোর সময় সেটি অন্য কোন জিনগুলোর সঙ্গে গেল তার উপরও নির্ভর করে।

এছাড়া বৈচিত্র সৃষ্টির আরো উৎস রয়েছে। এর একটি হলো জেনেটিক ড্রিফট– জিনের বৈচিত্রে একদিকে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব দেখা দেয়া। এটি ঘটে কোন প্রজাতির সদস্যরা কোথাও যদি ছোট দলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কোন জিনের যদি দুটি এলেল বা রূপ থাকে তা হলে বড় একটি দলে প্রত্যেক সদস্যের সেই দুটির যে কোনটি থাকার সম্ভাবনা

৫০/৫০। উদাহরণ স্বরূপ এটি হতে পারে আদিতে কোন বড় দলের মধ্যে কালো চুল আর সোনালী চুল থাকার ক্ষেত্রে। একটি মুদ্রাকে ইতস্তত টস্ করলে এপিঠ বা ওপিঠ উঠার সম্ভাবনা যেমন ৫০/৫০ এও অনেকটা সেরকম। কিন্তু মাত্র কয়েকবার যদি এটি টস করা হয় তাহলে কোন একটি পিঠ অন্যটির চেয়ে বেশি বার উঠার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, ৫০/৫০ বন্টন তখন আর থাকেনা। জিনের এলেলের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে। ছোট দলে কোন একটি এলেল অন্যটির চেয়ে বেশি থাকার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অর্থাৎ নেহাৎ সংখ্যাতাত্ত্বিক কারণে জিনের একটি বিশেষ রূপের দিকে পক্ষপাতিত্ব দেখা দিতে পারে। পরের প্রজন্মগুলোতে এই পক্ষপাতিত্ব আরো বেড়ে যাবে, এবং আরো পরের প্রজন্মে আরো বাড়বে। এভাবে ছোট দলে আবদ্ধ অবস্থায় ঐ দলের সদস্যদের মধ্যে দুই এলেলের একটি এত প্রাধান্য পাবে যে অন্যটি বিলুপ্তই হয়ে যাবে। যেমন ঐ ছোট দলে হয়তো কালো চুল আর থাকলোই না, সব সোনালি চুল হয়ে গেল। এই অবস্থাও এক ধরনের বৈচিত্র সৃষ্টি করে– যা বিবর্তনে নির্বাচিত হতে পারে।

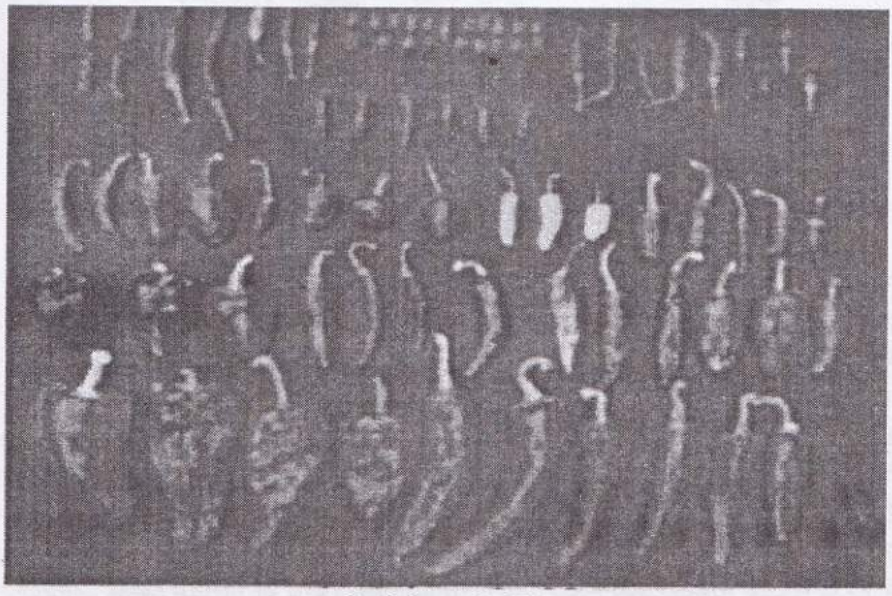
আরো একটি অদ্ভূত ঘটনা ডিএনএর মধ্যে ঘটতে পারে। এতে কিছু কিছু বেইস পরম্পরায় থাকে যেগুলো ডিএনএ সূত্রের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। এ ধরনের জিন যদিও নিজেরা সাধারণত বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর হয়না, কিন্তু এরা স্থানান্তরিত হয়ে কার্যকর জিনের মধ্যে ঢুকে পড়ে সেটিকে বদলে দিতে পারে, অর্থাৎ মিউটেশন ঘটাতে পারে।

যেহেতু বিভিন্ন স্থানে দূরে থাকা জীবের বিভিন্ন দলের মধ্যে যোগাযোগ হয়, তাদের সদস্যদের মধ্যে যৌন সংযোগ ঘটে, ফলে তাদের মধ্যে জিন বিনিময়ও হয়। এই প্রক্রিয়ায়ও কিছু নূতন বৈচিত্র সৃষ্টি হয়– যাকে বলা হয় জিন ফ্লো বা জিন প্রবাহ।

সব মিলে বুঝা যাচ্ছে যে এক একটি প্রজাতির দলের সদস্যদের মধ্যে জেনেটিক বৈচিত্রের এবং তাদের প্রকাশিত ফেনোটাইপে বৈচিত্রের কোন অভাব নাই। বিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপটির শর্ত পূরণ তাই জীব জগতে সব সময় ঘটছে। সম্প্রতি নিয়ন্ত্রক জিনগুলোর গুরুত্ব আরো ভাল করে উদ্ঘাটিত হওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে যে শুধু জিনের বৈচিত্রই নয়, নিয়ন্ত্রণের ফলে জিনগুলো ফেনোটাইপে কতখানি প্রকাশিত হচ্ছে বা হচ্ছেনা সেই দিক থেকে আরো বৈচিত্র সৃষ্টি হচ্ছে। এই নিয়ন্ত্রক জিনগুলোর কাজ বড়ই চমকপ্রদ। যেমন Hox জিন নামে কিছু জিন গুচ্ছ প্রাণির সামনের দিক কোনটি, পেছনের দিক কোনটি, দেহের কোন জায়গা থেকে কোন অঙ্গ বের হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। মজার ব্যাপার হলো এসব নিয়ন্ত্রক জিনগুলোর কোন কোনটির আগে নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা ছিলনা। বিবর্তনের ফলে তারা এই ভূমিকা পরে নিয়েছে। যেমন Pax 6 নামে একটি জিনগুচ্ছ প্রাণিতে চোখের গঠন নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এটি কোন কোন চোখবিহীন প্রাণিতেও আছে। এর মানে সুদূর অতীতেও এটি ছিল– তখন অন্য কাজ করতো। আসলে বিবর্তনে যে সব বিচিত্র জেনেটিক খসড়ার উপর সম্পাদনা করা হয়, সে খসড়াগুলোর আদি উৎস কিন্তু জীবের ইতিহাসে অনেক অতীতে। বিবর্তন শুধু নানা সময় এদেরকে সম্পাদনা করে নূতন নূতন কাজে লাগায় পরিবর্তিত পারিবেশিক চাপের কারণে। সম্প্রতি উদ্ঘাটিত প্লাটিপ্লাসের জেনোম বিশ্লেষণে আমরা তার মধ্যে অতি প্রাচীন আদি জিনের বহু বৈশিষ্ট এভাবে এক সঙ্গে কার্যকর থাকতে দেখেছি।

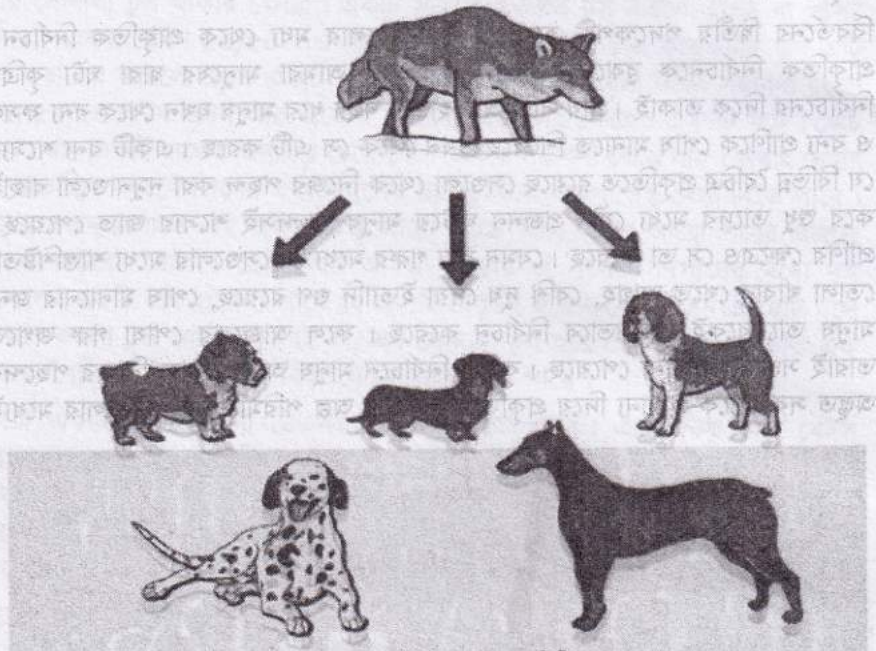
প্রাকৃতিক নির্বাচন

বিবর্তনের দ্বিতীয় পদক্ষেপটি হলো ঐ বৈচিত্রগুলোর মধ্য থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচন। প্রাকৃতিক নির্বাচনকে বুঝতে সহায়ক হবে যদি আমরা মানুষের দ্বারা ঘটা কৃত্রিম নির্বাচনের দিকে তাকাই। প্রায় সাত আট হাজার বছর ধরে মানুষ যখন থেকে বন্য ফসল ও বন্য প্রাণিকে পোষ মানাতে শিখেছে তখন থেকে সে এটি করছে। একটি বন্য শস্যের যে বিভিন্ন বৈচিত্র প্রকৃতিতে রয়েছে সেগুলো থেকে নিজের পছন্দ করা নমুনাগুলো বাছাই করে শুধু তাদের মধ্যে যৌন প্রজনন ঘটিয়ে মানুষ পছন্দসই শস্যের জাত পেয়েছে। প্রাণির ক্ষেত্রেও সে তা করেছে। যেমন বন্য গরুর মধ্যে যে সেগুলোর মধ্যে শান্তশিষ্টতা, তোলা খাবার খেতে আগ্রহ, বেশি দুধ দেয়া ইত্যাদি গুণ রয়েছে, পোষ মানানোর জন্য মানুষ তাদেরকেই কৃত্রিমভাবে নির্বাচন করেছে। ফলে আজকের পোষা গরু জগতে তারাই সংখ্যায় প্রাধান্য পেয়েছে। কৃত্রিম নির্বাচনে মানুষ অনেক সময় নিজের পছন্দের অদ্ভুত সব গুণকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকৃতিতে তার যা অল্প পরিমাণে ছিল ওগুলোর মধ্যেই



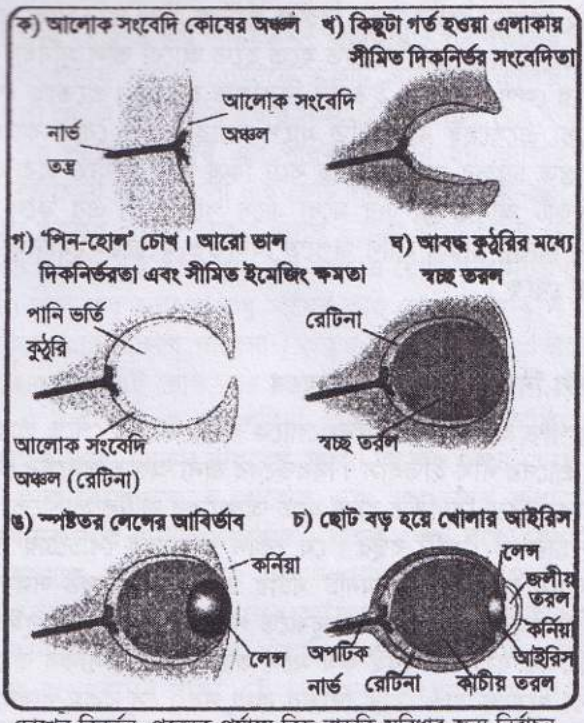
কৃত্রিম নির্বাচনে মরিচ-বিচিত্রা

প্রজন্মের পর প্রজন্ম মিশ্রণ ঘটিয়ে সেই গুণগুলোকে অনেক বেশি উচ্চকিত করে তুলেছে। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে অদ্ভুত নানা আকৃতির মরিচ, অদ্ভুত দেহ ও আচরণ বৈশিষ্ট সম্পন্ন কুকুর– এমনিতরো আরো নানা কিছু। শোনা যায় জাপানে এক রকম মাছ এভাবে জন্মানো হয়েছে যার গায়ে জাপানী মানুষের মুখের আদল আঁকা রয়েছে। অতীতে প্রাকৃতিক ভাবে ঐ মাছের কোন কোনটির গায়ে হয়তো দৈবক্রমে ওরকম মুখের আদল সামান্য এসেছিল– ওগুলোর থেকেই কৃত্রিম নির্বাচন করতে করতে আজ এ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে গেছে।



কৃত্রিম নির্বাচনঃ কুকুর-বিচিত্রা

প্রাকৃতিক নির্বাচন অবশ্য ভিন্ন জিনিস। এটি কেউ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ইচ্ছে করে করছেনা, প্রাকৃতিকভাবে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এইটুকু মিল আছে যে উভয় ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রকারটি বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে, তাই তা টিকে থেকে অধিক বংশধর দিতে পারছে। কৃত্রিম নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুবিধাটি আসছে মানুষ এটি পছন্দ করে ওটিকেই প্রজনন করাচ্ছে বলে। আর প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ক্ষেত্রে ওটা কিছু বিশেষ সুবিধা পেয়ে গেছে বলে। আসলে জীব জগতে পারিবেশিক নানা ঘাত প্রতিঘাতে টিকে থেকে সন্তান উৎপাদন করাটি অনেক সময়েই বেশ দুরূহ হয়– প্রত্যেককে বলতে গেলে নানা মারাত্মক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগুতে হয়। এই টিকে থাকার বিষয়টি হলো এর একটি পরীক্ষাতেও হেরে না যাওয়া। নানা বৈচিত্রের মধ্যে কোন একটি বিশেষ বৈচিত্র টিকে থাকার জন্য অধিক সহায়ক হতেই পারে, তা হলে দীর্ঘ মেয়াদী গড়পড়তা হিসেবে ঐ বৈশিষ্টের অধিকারীদের টিকে থাকার ও সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনা অন্যদের চেয়ে বেশি হবে। কাজেই এ প্রজাতির কোন দলের (পপ্যুলেশনের) মধ্যে বহু প্রজন্মের পরে গিয়ে এই বৈশিষ্টের অধিকারীদেরকেই অনেক অধিক সংখ্যায় পাওয়া যাবে, হয়তো বা একমাত্র তারাই থাকবে। তখন বলা যায় যে 'পারিবেশিক চাপে' জীবটি ঐ ভাবে বিবর্তিত হয়েছে। এজন্য প্রয়োজন বৈশিষ্টটির ক্ষেত্রে পারিবেশিক সুবিধা, এবং প্রয়োজন অনেক দীর্ঘ সময়– বহু প্রজন্মের মধ্য দিয়ে যাওয়ার মত। সেই সময় হাজার, লক্ষ এমনকি কোটি বছরও হতে পারে। আর ঐ বৈশিষ্টটিও সময়ের সঙ্গে স্থির এক রকম থাকেনা। ওর মধ্যেও সব সময় ঘটতে থাকে নানা সূক্ষ্মতর



চোখের বিবর্তন: প্রত্যেক পর্যায়ে কিছু বাড়তি সুবিধার জন্য নির্বাচন

বৈচিত্র– দলের নানা সদস্যদের মধ্যে। কাজেই বৈশিষ্টটি ধাপে ধাপে তখনকার মত ছোট ছোট প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে এগুবে। এর মধ্যে বৈশিষ্টটির কোন রূপ যদি বিশেষভাবে সুবিধাজনক হয়, তা হলে সেই রূপটি দীর্ঘ কাল ধরে স্থিতি লাভ করবে।

এই অত্যন্ত দীর্ঘ সময়ের যোগান, এর মধ্যে ছোট ছোট ধাপে বিবর্তনে এগুবার, ও তার প্রত্যেকটি ধাপের তখনকার মত সুবিধা হবার ব্যাপারটি অনুধাবন করিনা বলেই অনেক সময় বিবর্তনকে অনেকের কাছে অসম্ভব অলৌকিক বিষয় বলে মনে হয়। এই ব্যাপারে চোখের উদাহরণটি প্রায়ই দেয়া হয়। কেউ কেউ বলে চোখের মত এমন একটি জটিল, কার্যকর ও সুন্দর ব্যবস্থা শুধু যথেষ্ট সময় দিলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়ে যেতে পারেনা। যে ভুলটি তাঁরা করেন তা হলো মনে করা যে বর্তমানের মত পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণ কার্যক্ষম চোখের কমে অন্য কিছুর, যেমন আধাআধি চোখের কোন সুবিধা নাই। তাঁদের চিন্তায় হয় চোখ পুরাপুরি আছে, নইলে একেবারেই নাই এমন পরিস্থিতিই সব সময় বিরাজ করেছে। বিবর্তন কিন্তু সেভাবে এগুয়না। পুরা চোখ একবারে সৃষ্টি হয়ে যায়নি। অতীতে বহু বৈচিত্রের মধ্যে কোন প্রাণির দেহের বিশেষ স্থানে কিছু কোষের সামান্য আলোক সংবেদিতার গুণ দেখা দিয়েছিল দৈবক্রমে বিশেষ মিউটেশনের ফলে। তাতে এর অধিকারীর সামান্য কিছু সুবিধা হয়েছিল চলাচলে, শিকার ধরাতে, আত্মরক্ষায় ইত্যাদিতে– যাকে ঠিক দেখা বলা চলেনা। বরং কোন দিকে আলো আছে কোন দিকে নাই এইটুকু বুঝার ক্ষমতা হয়তো সে লাভ করেছিল। এই যে সুবিধা সে পেয়ে গেলো,

তার ফলে সেই সামান্য ক্ষমতাটুকুর বিস্তৃতি ঘটেছে এবং তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল আরো নানা বৈচিত্র। সেগুলো থেকে নির্বাচিত হতে হতে আরো ভাল সুবিধা, আরো ভাল দেখা, এবং ধীরে ধীরে লেন্স, রেটিনা, ইত্যাদি বিকশিত হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এর সবগুলো কিছু কাজে তো এসেছেই বরং প্রতি ধাপে আরো বেশি বেশি কাজে এসেছে। পুরো ব্যাপারটি ইতস্তত চান্সের ফলে ঘটেছে বটে কিন্তু তার মধ্যেও এরা এতো স্পষ্ট সুবিধা দিয়েছে যে একটি অনিবার্যতা এর মধ্যে এসে পড়েছিল। এর ফলে চোখ একাধিকবার পরস্পর স্বাধীন বিভিন্ন ধারায় প্রাণি জগতে বিবর্তিত হয়েছে- মোটামুটি একই পরিণতির দিকে যা নিয়ে গেছে।

স্বল্প সময়ে ঘটা নির্বাচনের কিছু উদাহরণ

বিবর্তন যে আপাত অসম্ভব পরিবর্তনগুলোকে সম্ভব করতে পেছে তার একটি বড় কারণ পৃথিবীর এবং প্রাণের দীর্ঘ ইতিহাস। বিবর্তনের জন্য অন্তত সময়ের কোন অভাব হয়নি। ক্ষুদ্র আদি ব্যাকটেরিয়া বিবর্তিত হতে হতে আজকের জটিল প্রাণিতে পরিণত হতে সময় পাওয়া গেছে চারশত কোটি বছর। যে কোন হিসাবেই বৈচিত্রের বিপুল প্রাচুর্য থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচন হতে হতে এমনটি ঘটার জন্য এটি যথেষ্ট সময়। কিন্তু পৃথিবী ও প্রাণের বয়স যে এমন দীর্ঘ তা আমরা বুঝতে পারছি শুধু মাত্র গত দুই তিনশ' বছর ধরে। এর আগে পৃথিবীর বয়সকে খুবই কম মনে করা হতো, হাস্যকর ভাবে মাত্র ছয় হাজার বছর মনে করা হয়েছে তাও বেশি দিনের কথা নয়। সে রকম ধারনার মধ্যে বিবর্তনের চিন্তা স্থান পাওয়ার কথা নয়।

অধিকাংশ বিবর্তন ঘটেছে দীর্ঘ সময় ধরে অনেকগুলো অতি ধীর লয়ের ধাপে। ধাপগুলো নিজেরাও ঘটেছে বহু প্রজন্ম ধরে। কিন্তু খুব দ্রুতগতির কিছু কিছু উদাহরণও আমরা এখন পর্যবেক্ষণে আনতে পারছি– যাতে একই বিবর্তন পদ্ধতিটি চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে বৈচিত্র সৃষ্টি, প্রাকৃতিক নির্বাচন, পরিবর্তন– সব কিছুরই প্রমাণ হাতেনাতে পাওয়া যাচ্ছে। এর একটি উদাহরণ যা আমাদেরকে প্রায়শ বিপদে ফেলে দিচ্ছে তা হলো জীবাণুর এন্টিবায়োটিকে প্রতিরোধী হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি। একটি এন্টিবায়োটিক প্রথম ব্যবহৃত হতে শুরু করলে তা বিশেষ বিশেষ জীবাণু ধ্বংসে খুবই কার্যকর থাকে। কিন্তু অধিক ব্যবহারের পর দেখা যায় অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এটি অকার্যকর হয়ে পড়ছে। আসলে জীবাণুগুলোই তখন দ্রুত প্রতিরোধী জীবাণুতে বিবর্তিত হয়ে যাওয়ার ফলেই এমনটি ঘটে। শুরুতেই জীবাণুগুলোর নিজেদের নানা বৈচিত্রের মধ্যে অল্প কয়েকটি ছিল যাদের মধ্যে সহজাত ভাবেই ঐ এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল। এন্টিবায়োটিকের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে সাধারণ সব জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও ঐ প্রতিরোধীগুলো বজায় থাকে এবং এরপর ওরাই বংশবিস্তার করে, প্রাধান্য লাভ করে। এভাবে পরপর প্রজন্মে বিবর্তিত হয়ে জীবাণুটি এন্টিবায়োটিকটির আরো প্রতিরোধী হয়ে উঠে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে এখানে প্রতিরোধী হওয়ার জন্যই পরিবর্তনগুলো ঘটেনি। বরং বহু বৈচিত্রের মধ্যে প্রতিরোধী গুণ থাকা বৈচিত্রগুলোই শুধু টিকে থাকতে পেরেছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে। এটিই বিবর্তন।

বিবর্তন কাজ করে নীরবে, অনেকটা পরোক্ষভাবে– একে বড় একটি যুদ্ধ মনে করা, এতে

সবচেয়ে শক্তিশালীই টিকে থাকবে এমন মনে করা নিষ্প্রয়োজন। ছোট্ট একটি তাৎক্ষণিক সুবিধার জন্য ছোট্ট একটি পরিবর্তন– এটিই বড় পরিবর্তনের পথ করে দিতে পারে। রক্তের হেমোগ্লোবিন নামের প্রোটিনে একটি এমাইনো এসিড হলো গ্লুটামিক এসিড। ডিএনএ বার্তা থেকে এটি তৈরি হবার সময় এর কোডন GAA একটি বেইসের মিউটেশনে GUA তে পরিণত হলেই এর পরিবর্তে তৈরি হয় ভ্যালাইন নামের অন্য এমাইনো এসিড। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এই ছোট পরিবর্তনটি সৃষ্টি করতে পারে সিকল্ সেল এনেমিয়া নামে ভয়ঙ্কর একটি রক্তের অসুখ। বাবা মা উভয়ের থেকে সন্তান যদি একই এই পরিবর্তিত জিনের দুই কপি পায়, তা হলে এ রোগ তার মধ্যে দেখা দেয় এবং মৃত্যু প্রায় অনিবার্য। তবে শুধু বাবা বা শুধু মায়ের কাছ থেকে এক কপি পেলে সে এটি বহন করবে বটে কিন্তু রোগ প্রকাশ পাবেনা। অদ্ভুত ব্যাপার হলো এভাবে সিকল্ সেল এনিমিয়া জিনের বাহক হলে এই রোগ তার মধ্যে প্রকাশ তো পায়ই না, বরং তার একটি সুবিধা হয়ে যায়– এ রকম বাহক ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী হয়। আফ্রিকার ম্যালেরিয়া উপদ্রুত জায়গাগুলোতে তাই এরকম বাহকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে– কারণ তারা ম্যালেরিয়া অগ্রাহ্য করে বেঁচে থাকতে পেরেছে এবং সন্তানদের মাধ্যমে সিকল্ সেল এনিমিয়ার অনেক বাহক সৃষ্টি করতে পেরেছে। বাহক বেশি বলে সেখানে এর ডাবল কপি পেয়ে এতে আক্রান্ত হবার ঘটনাও অনেক বেশি– রোগটি তাই সেখানে যথেষ্ট ব্যাপক। কয়েক শত বছর আগে দাস হিসেবে আফ্রিকার ঐ অঞ্চলগুলোর প্রচুর মানুষকে যখন আমেরিকায় আনা হয়েছিল তাদের মধ্যেও ছিল সিকল্ সেল এনিমিয়ার অনেক বাহক। কিন্তু তাদের বংশধরদের মধ্যে এই বাহকদের সংখ্যা কমে গেছে– এখন নাই বল্লেই চলে। এর কারণ আমেরিকার পরিবেশে ম্যালেরিয়ার চ্যালেঞ্জটি ছিলনা। কাজেই সেখানে বাহকদের বিশেষ কোন সুবিধা ছিলনা যে কারণে বাহকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। বরং অনেক বাহকদের থেকে সন্তানরা ডাবল কপি পাওয়ায় তারা নিজেরা সন্তান দেবার আগে, অর্থাৎ আরো বাহক সৃষ্টির আগেই মারা গেছে। কালক্রমে অনেক বৃহত্তর বংশধর-জনসংখ্যার মধ্যে ঐ বাহকদের সংখ্যা নগণ্য হয়ে গেছে। বিবর্তনের এ সব ঘটনা আমরা আমাদের জানা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ইতিহাসের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি।

নির্বাচনের প্রার্থীটি কে

পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতার ফলে কে টিকে থাকছে? প্রাকৃতিক নির্বাচনটি ঘটছে কার উপর? এক্ষেত্রে কয়েকটি উত্তর মনে আসতে পারে। বিশেষ একটি জিন নির্বাচিত হচ্ছে একথা বলতে পারি। অথবা বলতে পারি যার দেহকোষে এই জিনটি রয়েছে সেই বিশেষ সদস্যটিই নির্বাচিত হচ্ছে। আবার এও বলতে পারি যে ঐ বিশেষ গুণ সম্পন্ন পুরো দলটিই নির্বাচিত হচ্ছে। যেমন সিকল্ সেল এনিমিয়ার বিষয়টিই ধরা যাক। এখানে কি সিকল্ সেল সৃষ্টি হবার জন্য নির্দিষ্ট জিনটিই বিবর্তনের লক্ষ্যবস্তু যেটি নির্বাচিত হয়ে ম্যালোরিয়ার জিনকে প্রভাবিত করছে, নাকি সিকল সেল এনিমিয়া বহনকারী বিশেষ মানুষটিই বিবর্তনের লক্ষ্যবস্তু, নাকি সিকল সেল জিন বহনকারী মানুষের দলটি? বহু যুক্তিতর্কের পর বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক ঐকমত্য হলো বিবর্তনের লক্ষ্যবস্তু জনগোষ্ঠির এক এক জন বিশেষ সদস্য। শেষ পর্যন্ত সদস্যদের পরিবর্তনেই

পুরো প্রজাতি পরিবর্তিত হয়– সদস্যই (যেমন মানুষের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ) হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রার্থী।

ঘটনাগুলো মূলত ঘটছে জিনের পর্যায়ে, তা হলে জিন নির্বাচনের প্রার্থী নয় কেন? এর কারণ এখন আমরা জানি যে অনেক ক্ষেত্রেই একটি জিন একেবারে স্বাধীনভাবে ফেনোটাইপে (বাস্তব প্রকারে) তার প্রকাশ ঘটাতে পারেনা। অন্য জিন বা জিনগুচ্ছের সঙ্গে এর আন্তক্রিয়ারও একটি ভূমিকা থাকে এতে, যেমন নিয়ন্ত্রণকারী জিনের (রেগুলেটরি জিন) প্রভাব। তা ছাড়া জিনের বেইস পরম্পরায়ে একটি মিউটেশন ঘটলেই যে প্রোটিনে পরিবর্তন আসবে এমন কোন কথা নাই কারণ একাধিক কোডন একই এমাইনো এসিড দিতে পারে। এমাইনো এসিডে পরিবর্তন হলেও সব ক্ষেত্রে তাতে ভিন্নরকম প্রোটিন নাও হতে পারে– কারণ এই টুকুর জন্য প্রোটিন হয়তো বদলাবেনা, অথবা এ পরিবর্তন প্রোটিন মোটেই সহ্য করবেনা বলে ওটি হয়তো গঠিতই হবেনা। কাজেই বিবর্তনের লক্ষ্যবস্তু বিচ্ছিন্নভাবে একটি জিন নয়, বরং সকল জিনের সমষ্টি জেনোম। অর্থাৎ কিনা সেই জেনোমের অধিকারী সদস্যটিই বিবর্তনের মূল টার্গেট। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এর ফলে ঐ সদস্যের টিকে থাকার ও অধিক সন্তান দিয়ে যাবার সম্ভাবনা বাড়ছে নাকি কমছে তা। অবশ্য সদস্যদের দলের ব্যাপারটিও একেবারে অগ্রাহ্য করার মত নয়। বিবর্তনে দলের আকার ও তার পারিবেশিক পরিস্থিতিরও বেশ ভূমিকা থাকে। দল যদি অনেক বড় হয় তা হলে বিবর্তন অনেক ধীরে হয়, কারণ বহুদিন ধরে যে সব বৈশিষ্ট পরীক্ষিত, টিকে গেছে ও স্থিতি লাভ করেছে, সেগুলোই বজায় থাকার প্রবণতা সেখানে থাকে। মিউটেশন ইত্যাদির ফলে ব্যতিক্রমী যে সব বৈচিত্রের সৃষ্টি সেখানে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলো স্বাভাবিকগুলোর প্রবল ভিড়ের মধ্যে বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনা, জনসংখ্যায় এদের প্রভাব ক্রমেই পাতলা হয়ে হারিয়ে যায়। এর একটি কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিউটেশন দলের সদস্যদের জন্য ক্ষতিকারকই হয়, এর অধিকারীরা কম টেকে, কম বংশ বিস্তার করে, উপকারী মিউটেশন খুবই ব্যতিক্রমী ব্যাপার। বড় বড় প্রজাতি বিবর্তনগুলো ঘটতে যে লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে এটিই তার কারণ।

এই অবস্থার বড় পরিবর্তন ঘটে যখন ঐ প্রাণিরই কোন একটি ছোট দল একটি ব্যতিক্রমী পরিবেশে কোথাও একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন সেখানে কোন কোন বৈশিষ্টের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা দিয়ে জেনেটিক ড্রিফট ঘটতে পারে, এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সহায়ক প্রমাণিত হলে তা দ্রুত বেড়েও যেতে পারে। যেহেতু ছোট দলে অল্প কয়েকজন সদস্যের এই ড্রিফট থাকলেও ঐ ছোট জনসংখ্যায় তাদের অংশ রীতিমত গণ্য করার মত, কাজেই পরে তাদের বংশ বৃদ্ধিতে বড় দল সৃষ্টি হলে সেখানেও এই বৈশিষ্টগুলোর যথেষ্ট প্রাচুর্য দেখা দিতে পারে– এবং তা বড় বিবর্তনের সূচনা করতে পারে। আদি ছোট দলকে বলা হয় ফাউন্ডার পপ্যুলেশন অর্থাৎ সূচনাকারী দল। অনেক সময় এরকম একটি বিচ্ছিন্ন ছোট দল অত্যন্ত কঠিন পারিবেশিক সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে পারে– খাদ্য, আশ্রয় ইত্যাদির অভাবে এবং নানা বিপদ সঙ্কুলতার মধ্য দিয়ে। একে বলা হয় বটল-নেক অর্থাৎ বোতলের সংকীর্ণ মুখের মধ্য দিয়ে যাওয়া। সেক্ষেত্রে এরকম অগ্নি-পরীক্ষায় বিশেষ বিশেষ উপকারী বৈশিষ্টের কারণে তাদের গুটিকতেক যদি টিকে থাকতে পারে,

পরবর্তীতে সেই বৈশিষ্টময় উন্নত সদস্যরাই বংশ বিস্তার করে প্রাধান্য লাভ করতে পারে। মনে করা হয় যে মানব বিবর্তনে আমাদের পূর্বসূরিরা কয়েক বার বিচ্ছিন্ন খুব ছোট দলে এরকম বটল নেকের সম্মুখীন হওয়াতেই আজকে উন্নত মানুষ প্রজাতি সৃষ্টি হতে পেরেছে।

দলের মধ্যে পরিবর্তন আনতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাব দু'রকমের হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে এর ফলে পরিবর্তন হবে ভারসাম্য সৃষ্টিকারী। অধিকাংশ সময় পরিবেশে যখন ছোট খাট উত্থান পতন হয় কিন্তু ভয়ঙ্কর রকম বড় কোন পরিবর্তন ঘটছেনা, তখন পরিবর্তনগুলো পুরানো ভারসাম্যটি বজায় রাখার চেষ্টা করে যায়। পরিবর্তনে যে সব ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট সৃষ্টি হয় সেগুলো দ্রুত বিলুপ্ত হয়। এখানে পরিবর্তনের ভূমিকা হলো পরিবেশ বদলের স্রোতগুলোর বিপরীতে সাঁতার কেটে নিজের পূর্বাবস্থানটি বজায় রাখা, নিজের অবস্থান বদলিয়ে কোন দিকে সরে যাওয়া নয়। কিন্তু পরিবেশের পরিবর্তন যদি অনেক বড় হয়, তখন আর এটি সম্ভব হয়না। তখন বদলের স্রোতটি এত প্রবল যে নিজেকেও সরে যেতে হয়, অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে ভিন্ন ধরনের বৈশিষ্টগুলোই তখন প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। পরিবর্তনগুলো ভারসাম্য সৃষ্টিকারী আর থাকেনা, পরিবর্তন হয় 'এক মুখি'। বড় পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে এরকম একমুখি পরিবর্তন আসলে দল মূল ধারায় না থেকে ক্রমে বেশি বেশি করে চরমের দিকে বিবর্তিত হতে থাকে। যেমন মানব বিবর্তনের ইতিহাসে তাদের বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্রমে বেশি বেশি করে মস্তিষ্কের আকার ও জটিলতা বৃদ্ধির দিকে পরিবর্তনের একমুখিতা দেখা গেছে।

পাখির গান আর বাহারি লেজঃ যৌন নির্বাচন

বিবর্তনের সত্যিকার বড় রকমের সুযোগ এসেছে বিবর্তিত হবার প্রক্রিয়ায় জীবের ইতিহাসে এক সময় যৌন প্রজনন চালু হবার পর। এতে বৈচিত্রের সংখ্যা ও প্রকার অনেক খানি বাড়ার এবং তার থেকে নির্বাচিত হবার সুযোগ অনেক গুণে বেড়ে গিয়েছিল। আর এই নির্বাচনে একটি বড় ভূমিকা রেখেছে যৌন সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচনে বিশেষ বিশেষ প্রবণতা– যেই প্রবণতাগুলো নিজেরাও বিশেষ বিশেষ জেনেটিক বৈচিত্র থেকেই এসেছে। সব রকমের প্রাণির ক্ষেত্রে এটি ঘটতে পারলেও পাখির রাজ্যেই এটি খুব বেশি চোখে পড়ে। তাই তাদের উদাহরণ নিলেই ভাল বুঝা যাবে। পাখির বিশেষ বিশেষ সুরে গান গাওয়ার পেছনে রয়েছে সঙ্গিনীকে আকর্ষণ, কারণ ঐ বিশেষ সুরের প্রতি ঐ প্রজাতির স্ত্রী পাখিদের বিশেষ জেনেটিক দুর্বলতা রয়েছে। এভাবে ভাল গাইয়েরা প্রজননে বেশি সক্ষম হয় বলে তাদের সন্তান পুরুষ পাখিদের মাধ্যমে এই গুণ ছড়িয়েছে বেশি, কাজেই গাইয়েরাই টিকে গেছে বেশি। আবার অন্যদিকে পাখি মায়ের ঐ গাইয়েদের প্রতি জেনেটিক দুর্বলতা তার মেয়েদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে কাজেই গাইয়েদের সুবিধাটি পরের প্রজন্মগুলোতেও বজায় থেকেছে। কোন কারণে কোন দলের পুরুষ পাখিরা গানের সুর বদলিয়ে ফেললে বিপত্তি দেখা দেবে। হয়তো প্রজাতিটিই বদলে যাবে, কারণ এর মধ্যে টিকে থাকা পরের প্রজন্মের কেউ আর মূল দলের সঙ্গে প্রজননই করতে পারবেনা, নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে ক্রমে বদলে যাবে। কাজেই

বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বটে।

যৌন নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরো বিস্তারিত দেখতে আমরা পাখির গান ছেড়ে তার লম্বা, বাহারি, লেজের দিকে মনোযোগ দিতে পারি। কোন কোন পুরুষ পাখিদের যে রকম লম্বা ও জমকালো লেজ বিবর্তিত হয়েছে তা অবাক হবার মত। ময়ূর তার মধ্যে একটি উদাহরণ, এরকম অনেক আরো রঙচঙে ও বাহারি উদাহরণ রয়েছে। এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে গেল কেন? সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো যৌন নির্বাচনের কারণে, তবে তা কিছু বিস্তারিত মনোযোগের দাবী রাখে। আমরা একে একে প্রথমে এর জন্য দায়ী স্ত্রী পাখি এবং পরে পুরুষ পাখির দিকে তাকাই। মনে করি শুরুতে একটি স্ত্রী পাখির জিনে এমন একটি মিউটেশন ঘটেছিল যার ফলে খানিকটা লম্বা ও বাহারি লেজের পুরুষ পাখির প্রতি তার সহজাত আকর্ষণের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ দলের পুরুষ পাখিদের বহু বৈচিত্রের মধ্যে কোনটির লেজ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি লম্বা ও বেশি বাহারি হতেই পারে, যাকে স্বভাবতই ঐ স্ত্রীটি নির্বাচন করেছে প্রজননের জন্য। এই দম্পতির কন্যা পাখিদের ক্ষেত্রেও মায়ের ঐ জেনেটিক বৈশিষ্ট সঞ্চারিত হবে। তারাও লম্বা লেজের পুরুষ পাখিকে যৌন সঙ্গী নির্বাচন করবে। কিন্তু ঐ দম্পতির ছেলে পাখিদের ক্ষেত্রে কী হবে? তাদের ক্ষেত্রে তাদের বাবার লম্বা ও বাহারি লেজের জিন তো যাবেই এবং তা প্রকাশিতও হবে, যে কারণে বড় হবার পর তার প্রজনন সঙ্গিনী এমন একজন হবার সম্ভাবনা বেশি লম্বা লেজের আসক্তির জিন যার আছে। সেই সঙ্গে তার নিজের মধ্যেও পুরুষ পাখির লম্বা লেজের প্রতি আকৃষ্ট হবার জিনও যাবে মায়ের থেকে, কিন্তু নিজে পুরুষ হওয়ার কারণে তা অপ্রকাশিত থাকবে। অবশ্য পরে তার নিজের কন্যা সন্তান যখন হবে তখন ঐ জিন সেই কন্যার মধ্যে যাবে এবং তা প্রকাশিতও হবে ঐ আকর্ষণ প্রবণতা হিসেবে। একই সঙ্গে ঐ দ্বিতীয় প্রজন্মের কন্যা সন্তান তার মায়ের কাছ থেকেও লম্বা লেজের প্রতি আকৃষ্ট হবার জিন পাবে। এভাবে এই জিনের ডাবল কপি পাওয়াতে তার মধ্যে অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রজন্মের মেয়ে পাখিতে এই লম্বা লেজ পছন্দকরা জিনের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাবে, তারা আরো লম্বা আরো বাহারি লেজের পুরুষ পাখি খুঁজবে।

শুরুর সেই মূল পুরুষ পাখির লম্বা লেজ থাকার জিন তার কন্যার কাছেও যাবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে সেটি অপ্রকাশিত থাকবে স্ত্রী হওয়ার কারণে। কিন্তু সেই কন্যার যখন পুরুষ পাখি সন্তান হবে সেটিও এবার লম্বা ও বাহারি লেজের জিনের ডাবল কপি পাবে মা ও বাবা উভয়ের কাছ থেকে। কাজেই দ্বিতীয় প্রজন্মের এই পুরুষ পাখির লেজ আরো দীর্ঘ ও আরো বাহারি হবে। এভাবে এই প্রক্রিয়ায় প্রজন্মের পর প্রজন্মে স্ত্রী পাখির কাছে আরো লম্বা ও আরো বাহারি লেজের কদর বাড়বে, অন্যদিকে পুরুষ পাখির ক্ষেত্রে ওরকম আরো লম্বা আরো বাহারি লেজের সৃষ্টি হবে। বেশ কিছু পাখি প্রজাতিতে আসলেও তাই হয়েছে। দলের মধ্যে অন্য যে সব স্ত্রী পাখির এর প্রতি আকৃষ্ট হবার সেই বিশেষ মিউটেশন ছিলনা তারা এবং তাদের সন্তানেরা এই প্রক্রিয়ার বাইরে রয়ে গেছে বলে তারা এ সব প্রকট লম্বা লেজের পুরুষ পাখির সঙ্গে প্রজনন মোটেও করেনি। এভাবে ধীরে ধীরে লম্বা লেজিরা ও তাদের সঙ্গিনীরা আলাদা একটি প্রজাতিতেই পরিণত হয়েছে।

সাম্প্রতিক গবেষণা (২০০৮) এই কাহিনীর কিছু কিছু পাদটিকাও দেবার চেষ্টা করছে।

যেমন এরকম কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে অন্তত ময়ূরির ক্ষেত্রে ময়ূরের লম্বা ও বাহারি লেজ ও পেখমের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হবার বিষয়টি যে ভাবে ভাবা হয় সেভাবে এখন দেখা যাচ্ছেনা। ময়ূর ঠিকই তার লেজ প্রদর্শন করে, পেখম মেলে ধরে, কিন্তু ময়ুরি সেদিকে আলাদা করে কোন মনোযোগ দেয়না। এই ব্যতিক্রমের বিবর্তনগত একটি ব্যাখ্যা হলো– ময়ূরের বাহারি লেজ ও পেখমের জিন ঠিকই প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু ময়ূরির এতে আকৃষ্ট হবার জিন এখন আর প্রকাশিত হচ্ছেনা অন্য কোন মিউটেশনের কারণে। রঙচঙে লেজ ও ডানার অন্য রকম কিছু বিবর্তনগত সুবিধার কথাও আধুনিক গবেষকরা বলছেন, যা প্রকারান্তে একই যৌন নির্বাচন সৃষ্টি করেছে। এরকম উজ্জ্বল রঙের পালকের সঙ্গে সঙ্গে পাখির সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টির সম্পর্ক সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। যে সব স্ত্রী পাখিদের এ রকম উজ্জ্বল পালকের প্রজনন সঙ্গী পছন্দ করার জেনেটিক প্রবণতা ছিল, তাদের সন্তানরা স্বাস্থ্যবান বাবার জিনের কারণে অধিকতর ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারি হয়ে টিকেছে বেশি, কাজেই এই পছন্দের জিনটাই বিস্তৃত হয়েছে বেশি।

নূতন নূতন প্রজাতি সৃষ্টি

প্রজাতি ও তার ভূবন

জীব জগতে বহু বৈচিত্র ও বহু পর্যায়ের শ্রেণী বিভাজন রয়েছে। তবে এর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক শ্রেণী বিভাজন হলো প্রজাতি (স্পেসিস)। এর উপরে গণ (জেনাস), ফ্যামিলি, ক্লাস ইত্যাদি আরো নানা বিভাজন আছে বটে, এবং এর নিচে একই প্রজাতির মধ্যে নানা জাত, গোষ্ঠি ইত্যাদি বৈচিত্র আছে বটে, কিন্তু প্রজাতিই হলো সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাজন।

একটি প্রজাতিকে আমরা অন্যদের সঙ্গে আলাদা করি কী ভাবে? এটি করি সাধারণত দুটি জিনিস দিয়ে। একটি হলো দেহাবয়বে মৌলিক সাদৃশ্য, অন্যটি হলো একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষে মিলে প্রজনন সক্ষমতা। অর্থাৎ একই প্রজাতির সব সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে অনেক বেশি দেহগত মিল থাকে, যতখানি মিল প্রজাতির বাইরের প্রাণিদের সঙ্গে থাকেনা। আর একই প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে প্রজনন করতে পারে, কিন্তু অন্য প্রজাতির সদস্যের সঙ্গে পারেনা। প্রজাতির উভয় বৈশিষ্টের মধ্যে অবশ্য কিছু ফাঁক রয়েছে, যার ফলে কিছু ব্যতিক্রম সম্ভব। দেহাবয়বের ভিত্তিতে প্রজাতিকে সব সময় আলাদা করা যায়না। খুব কাছাকাছি দুই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে আপাত অনেক মিল থাকতে পারে, আবার একই প্রজাতির প্রাণির মধ্যে দেহাবয়বে বহুতরো অমিল থাকতে পারে– যার পরিচিত উদাহরণ হলো বহু জাতের কুকুরের মধ্যে। এদিক থেকে প্রজননের শর্তটির ব্যতিক্রম অবশ্য অপেক্ষাকৃত কম ঘটে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কাছাকাছি দুই প্রজাতির মধ্যে প্রজনন ঘটে, যেমন গাধা ও ঘোড়ার মধ্যে প্রজননে খচ্চর। এ ধরনের মিশ্র প্রজাতির সন্তানকে সংকর বলা হয়। আর এদের বড় বৈশিষ্ট হলো এই সংকর সন্তানরা নিজেরা প্রজননক্ষম হয়না। কাজেই ভিন্ন প্রজাতির সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে অন্তত উর্বর সন্তান প্রজননে সক্ষম হয়না। তাছাড়া মিশ্র প্রজাতির এ ধরনের প্রজনন অল্প কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে শুধু বিরল ভাবে ঘটে। মোটের উপর প্রজাতি পৃথকীকরণের এই শর্তটি বেশ কড়াকড়ি ভাবেই প্রয়োগযোগ্য।

একটু সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এক একটি পারিবেশিক সিষ্টেমের মধ্যে (ইকোসিষ্টেম) প্রত্যেক প্রজাতি তার নিজস্ব 'ভূবনে' (নিশ) বাস করে। এই 'ভূবন' বলতে শুধু ভৌগলিক বসত এলাকা বুঝানো হচ্ছেনা, যদিও বসত এলাকাও এর একটি উপাদান হতে পারে। এখানে ভূবনটি হলো নানা উপাদানে গড়া জীবনযাত্রার এক একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থা। এর এক একটি উপাদানের নির্দিষ্ট প্রকার ও পরিমাণের উপর জীবকে একান্ত

নির্ভর করতে হয়– যেমন খাদ্য, উত্তাপ, বসত, কোন কোনটির ক্ষেত্রে স্রোত, লবণাক্ততা ইত্যাদি অন্য রকম বিষয়ও। এই সব উপাদানের যথাযথ সমন্বয়েই একটি প্রজাতির ভূবন গড়ে উঠে। কখনো কখনো প্রজনন ও অন্যান্য সুবিধাগুলোও এই উপাদানগুলোর সঙ্গে যোগ হয়। জীব জগতে এক একটি পারিবেশিক সিস্টেমের মধ্যে একটি নিয়ম হলো এক প্রজাতি যদি অন্য প্রজাতির ভূবনে ভাগ বসায় সে অবস্থা বেশি দিন চলতে পারেনা। উভয়কে তখন হয় এই ভূবনটিকে ভাগ করে যার যার জন্য পৃথক ভূবন সৃষ্টি করতে হবে, অথবা অন্যথায় এদের একটি প্রজাতিকে বিলুপ্ত হতে হবে। খুব সরল একটি উদাহরণ নেয়া যাক এরকম ভূবন ভাগ করার। বসত ও খাদ্য এই দুই উপাদানে গড়া পুকুরের মাছের ভূবন যদি আমরা বিবেচনা করি তা হলে পুকুরে বিভিন্ন মাছ থাকলে তারা হয় বিভিন্ন গভীরতায় অথবা বিভিন্ন এলাকায় পৃথক থেকে যার যার ভিন্ন খাদ্য ও বসতের ব্যবস্থা করে। অনেক ক্ষেত্রে দুটি প্রজাতি একই জায়গায় বাস করলেও অন্য এক বা একাধিক উপাদান ভিন্ন হবার কারণে তাদের ভূবন কিন্তু পৃথক হয়। এরকম যত বেশি বিভিন্ন প্রকার ভূবন থাকবে, বেশি বিচিত্র প্রজাতি থাকার সুযোগ সেখানে ঘটে।

খাপ খাইতে গিয়ে ভিন্ন ধারা

বিবর্তনে নূতন প্রজাতি তখনই সৃষ্টি হয় যখন একই প্রজাতির কোন দল বহু দীর্ঘ সময়ের জন্য মূল দলের ভূবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ঐ বিচ্ছিন্ন দলকে পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য নিজকে বদলাতে হয়। এই খাপ খাইয়ে নেয়ার ব্যাপারগুলো ঘটে খুবই ধীরে ধাপে ধাপে। এটি সাধারণত তিনটি বিভিন্ন দিক থেকে ঘটতে পারে–দেহগঠনগত ভাবে, আচরণগত ভাবে অথবা জৈব রাসায়নিক ভাবে। দেহগঠনগত ভাবে খাপ খাওয়ার জন্য দেহের কিছু পরিবর্তন পারিবেশিক সুবিধা পেয়ে প্রাধান্য লাভ করে– যেমন শিঙ্গেল হরিণের ক্ষেত্রে শিং এর সৃষ্টি, চিতার ক্ষেত্রে দৌড়ানোর জন্য শক্তিশালী পায়ের পেশি সৃষ্টি, বিশেষ চড়ুই এর ক্ষেত্রে বাদাম ভাঙ্গার উপযুক্ত পুরু ঠোঁট সৃষ্টি। এর প্রত্যেকটিই কিছু না কিছু বিবর্তনগত সুবিধা পেয়েছে বলেই প্রাধান্য লাভ করেছে এবং তার অধিকারী জীব মূল দল থেকে আলাদা হয়ে পৃথক প্রজাতি হয়েছে।

আচরণগত ভাবে খাপ খাওয়ানোর উদাহরণ হিসাবে বলা যায় কোন কোন প্রজাতির গাছের পাতা অধিক শুষ্ক আবহাওয়ায় তার আর্দ্রতা রক্ষা করার জন্য নিজেকে কুচকিয়ে নেয়। তাছাড়া নানা প্রজনন আচরণ, সন্তানের যত্ন নেয়ার পদ্ধতি, প্রতিযোগী পুরুষের সঙ্গে লড়াই ইত্যাদি নানা ধরনের আচরণে বৈচিত্র এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই বৈচিত্রের এক একটি দেখা দিয়েছে বিশেষ পরিস্থিতির কারণে। আর জৈব রাসায়নিকভাবে খাপ খাওয়ানো ঘটে হরমোন, পরিপাক রস, ইত্যাদির পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতির উপযুক্ত হয়ে উঠতে গিয়ে।

এগুলো সব জেনেটিক বার্তার মধ্যে নানা মিউটশেনে নানা বৈচিত্র থেকে নির্বাচনের ফলেই ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে পুরানো কোন মিউটেশন যা আগে অন্য ভাবে প্রকাশিত হয়ে অন্য কাজে লাগতো, তাকেই এখন ভিন্ন কাজের জন্য লাগানো হচ্ছে ভিন্ন পারিবেশিক চাপে। যেমন পাখিদের পূর্বসূরিরা না উড়লেও তাদের মধ্যে পালকের জিন প্রকাশিত হয়েছিল উষ্ণতা রক্ষা বা পোকার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে। পরে আদি

পাখিতে ক্রমে সেই জিনই ব্যবহৃত হয়েছে উড়ার কাজে ডানার ব্যবহারে– নূতন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। এভাবে পাখি নিজের জন্য বনের উচ্চ শামিয়ানায় এবং আকাশের সম্পূর্ণ নূতন ভূবনগুলো দখল করেছিল। সে সব ভূবনের তখন অন্য অধিকারী তেমন কেউ ছিলনা। সেখানে তাই সুযোগ ঘটলো বহু ভূবন সৃষ্টির ও বহু প্রজাতি সৃষ্টির।

প্রজননগত বিচ্ছিন্নতায় নূতন প্রজাতি সৃষ্টি

একটি প্রজাতির কোন দল যদি প্রজননগত ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তা হলে কালক্রমে তাদের মধ্য থেকে নূতন প্রজাতি সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিচ্ছিন্ন হবার মানে হলো মূল দলের সঙ্গে তাদের প্রজননগত সম্পর্ক আর ঘটতে না পারা, ফলে মূল দলের সদস্যদের সঙ্গে তাদের জিন বিনিময়ের আর সুযোগ থাকেনা। এভাবে বহু প্রজন্ম কেটে গেলে এর মধ্যে নিজেদের নূতন নূতন মিউটেশনে ও জেনেটিক ড্রিফটে ক্রমে বদলে গিয়ে মূল দল থেকে অনেকাংশে ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে পড়ে এ দলের সদস্যরা। শেষ পর্যন্ত পার্থক্য এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে প্রজননগত বিচ্ছিন্নতা দূর হয়ে গেলেও মূল দলের সঙ্গে এদের সার্থক প্রজনন আর সম্ভব হয়না। তখনই মূল প্রজাতির থেকে ভিন্ন একটি নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হয়।

প্রজনন বিচ্ছিন্নতা নানা ভাবে সৃষ্টি হতে পারে। নূতন দলটি যদি সমুদ্র, পর্বত, বন ইত্যাদি ভৌগলিক কোন বাধার দ্বারা অবস্থানের দিক থেকে মূল দল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়ে বহু প্রজন্ম ধরে, তা হলে তো পরস্পরের মধ্যে প্রজননের কোন প্রশ্নই উঠেনা। তবে কাছাকাছি অঞ্চলে দুই দল বাস করলে বা এমনকি একই অঞ্চলে বাস করলেও অন্যান্য কারণে প্রজননগত বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন কাছাকাছি থেকেও একই প্রজাতির গাছের একটি দল জলা ভূমিতে এবং অন্য দল উচ্চ শুকনা ভূমিতে থাকতে পারে, যার ফলে উভয়ের মধ্যে পরাগায়ন সম্ভব হয়না। তাছাড়া কোন প্রজাতির নূতন দলের সদস্যরা যদি কোন কারণে ভিন্ন মৌসুমে প্রজননে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তা হলেও কাছে বা একই জায়গায় থেকেও মূল দলের সঙ্গে তাদের প্রজনন সম্ভব হবেনা। কাজেই এক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতাটি স্থানের নয়, সময়ের। প্রায়শ বিচ্ছিন্নতাটি ঘটে নেহাৎ আচরণগত পার্থক্যের কারণে। অনেক প্রাণির ক্ষেত্রেই প্রজনন পূর্ববর্তী নানা বিস্তারিত আচরণ থাকে– সঙ্গী বা সঙ্গিনী আকর্ষণের জন্য এবং প্রজননের পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য। এগুলোর মধ্যে পাখির গান গাওয়া, কাছাকাছি গিয়ে বিশেষ রকমে নাচা ইত্যাদি আমাদের বেশি মনোযোগ পেলেও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের প্রাণিতে এরকম আরো বিচিত্র 'কোর্টশিপ' আচার আচরণ দেখা যায়। বহুকাল ধরে এক এক প্রজাতির ক্ষেত্রে এগুলোর খুঁটিনাটি এত বেশি সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে যে যদি এদের কোন কোন সদস্য হুবহু ঐ আচরণ করতে ব্যর্থ হয় তা হলে স্বাভাবিক সদস্যদের সঙ্গে তাদের প্রজনন সংযোগ ঘটতে পারেনা। প্রজাতির কোন বিচ্ছিন্ন দলে যদি এ আচরণ ভিন্নতা দেখা দেয় তাহলে মূল দলের সঙ্গে তাদের প্রজনন হবেনা, কিন্তু নিজেদের মধ্যে হবে। পাখির গানের সুর বদলে গেলে যে প্রজাতি বদলে যেতে পারে সে কথা আমরা উল্লেখ করেছি। অনেক সময় দেহ বৈশিষ্ট বদলে গেলেও প্রজনন বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। যেমন ফুলের রং বদলে গেলে সেই ফুল

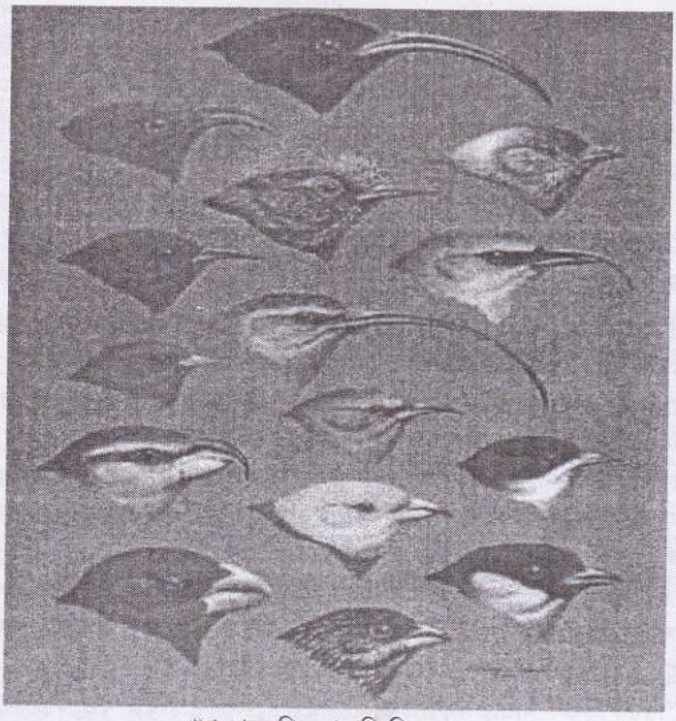
ভিন্ন প্রকার পতঙ্গদের আকর্ষণ করতে শুরু করে। আগে মূল দলে তার পরাগ সংযোগ যারা ঘটাতো সে পতঙ্গরা হয়তো আর আসেনা। এসব কারণে প্রজনন বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয় যৌন মিলন ঘটতে পারেনা বলে। কিন্তু যৌন মিলন ঘটার পরেও প্রজনন বিচ্ছিন্নতা থাকতে পারে অন্য ধরনের কারণে। বিচ্ছিন্ন দলের সদস্যদের শুক্র কোষ যদি মূল দলের সদস্যদের ডিম্বকোষের সঙ্গে অসমঞ্জস হয়ে পড়ে, অথবা এর ডিম্বকোষ ওর শুক্রকোষের সঙ্গে, তা হলে যৌন মিলন হলেও তাতে সন্তান জন্মাবেনা। এমন বিষম জনন কোষের ফলে সন্তান জন্মালেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সংকরের বৈশিষ্ট দেখা দেবে– যাতে সন্তান অল্প বয়সে মারা যায় অথবা বন্ধ্যা হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিন্ন পরিবেশের ভিন্ন পরিস্থিতির চাপে নির্বাচিত ভিন্ন ধারার বৈশিষ্টের কারণে শুরুর স্বল্প প্রজনন বিচ্ছিন্নতা ক্রমে আরো কড়াকড়ি ভাবে বলবৎ হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এরা আলাদা প্রজাতিই হয়ে যায়। প্রজাতির নানা দলের ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি ঘটেছে নানা কারণে। সমুদ্রে পানির উচ্চতা বাড়াতে অনেক ভূখণ্ড সমুদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে বহু প্রজাতির নানা দলকে আলাদা করে ফেলেছে– যেমন বেরিং প্রণালী আমেরিকাকে এশিয়া থেকে। অতীতে হিমবাহ এগিয়ে এসে অনেক প্রজাতিকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে ফেলেছিলো যারা বরফ পরিবেষ্টিত এক একটি ভূখণ্ডে আশ্রিত ছিল বহু প্রজন্ম ধরে। একই ঘটনা ঘটেছে অতীতে নিরক্ষীয় রেইন ফরেষ্ট বা বাদল বন জলবায়ু পরিবর্তনে ছোট ছোট টুকরায় বিভক্ত হয়ে যাওয়াতে। মানুষের সুদূর পূর্বসূরিরা আফ্রিকায় এমনি টুকরা হয়ে যাওয়া বনের সংকটেই সেকালের কোন এইপ্ নূতন প্রজাতির দিকে নূতন ধারায় বিবর্তিত হয়েছিল। অনেক সময় বড় ধরনের পর্বত-প্রমাণ বাধা দুই দলকে বিচ্ছিন্ন না করলেও এক একটি ছোট দল নানা কারণে মূল দলের মূল বসতের গণ্ডি ছাড়িয়ে একটু কিনারায় চলে যায়। ফলে সেখানে ভিন্নতর জীবন সংগ্রামে তারা একটি ফাউন্ডার পপ্যুলেশন বা নূতন ধারার সূচনাকারী দল হিসেবে কাজ করে। আগে যে ভাবে বলা হয়েছে তখন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তাদের মধ্যে জেনেটিক ড্রিফট ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। মানব বিবর্তনের অতীতে এক দল এইপ্ ঘন বনভূমির কিনারায় এমনি করে তৃণভূমির জীবন সংগ্রামে অভ্যস্ত হচ্ছিল বলেই তাদের মধ্যে মানবমুখি ভিন্ন ধারা সৃষ্টি হয়েছিল।

একই অঞ্চলে থেকে প্রজনন বিচ্ছিন্নতাগুলো শুরু হতে পারে অনেক সময় সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচনে ভিন্নতর অগ্রাধিকার থেকে। তাছাড়া বসত ছাড়াও ভূবনের অন্যান্য যে সব বৈশিষ্ট থাকে– খাদ্য, ছায়া, উত্তাপ, আশ্রয়, ইত্যাদি- সেগুলোরও ভিন্নতর পছন্দের ঝুঁকে পড়ার কারণেও, অর্থাৎ ভূবন-পছন্দে পরিবর্তনের ফলেও বিচ্ছিন্নতার শুরু হতে পারে। শুরুর এই বিচ্ছিন্নতাগুলোই পরে প্রজন্ম প্রজন্ম ধরে প্রকট হয়ে ভিন্ন প্রজাতি সৃষ্টির পথ করে দেয়।

প্রজাতি বিচ্ছুরণ

পুরানো প্রজাতি থেকে বিবর্তিত হয়ে একটি নূতন প্রজাতি হতে সাধারণত লক্ষ লক্ষ বছর সময় লেগে যায়, কখনো তারো বেশি। কাজেই প্রজনন বিচ্ছিন্নতা ঘটলেই শিগ্‌গির দুই দলে বিভক্ত কোন প্রজাতি দুটি প্রজাতি হয়ে যাবে এমন নয়। তবে অপেক্ষাকৃত কম



খাপ খেতে গিয়ে প্রজাতি বিচ্ছুরণ

সময়ে কাছাকাছি ধরনের অনেকগুলো নূতন প্রজাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ার ঘটনা কখনো কখনো ঘটে। একটি প্রজাতি যখন তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করে, তখন তার নানা দলের সদস্যদের পক্ষে কিছুটা বিভিন্ন নানা 'ভূবনের' মধ্যে নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠিত করা সহজতর হয়ে পড়ে। তখনই এরকম নানা প্রজাতি সৃষ্টির সুযোগ সৃষ্টি হয়– যাকে বলা যায় প্রজাতি বিচ্ছুরণ। এ যেন একটি প্রজাতি সূর্যের কিরণ রেখার মত নানা দিকে বিভিন্ন রকম প্রজাতি বিচ্ছুরণ করছে।

বিবর্তন তত্ত্বটি প্রথম যিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেই চার্লস ডারউইন এ ধরনের বিচ্ছুরণের চমকপ্রদ উদাহরণ দেখেছিলেন গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে। সেখানে ছোট ছোট অনেকগুলো দ্বীপের এক একটিতে ছিল ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভিন্ন প্রজাতির চড়ুই। এদের মধ্যে তফাৎ প্রধানত ঠোঁটের আকৃতিতে। এসব দ্বীপের উদ্ভিদ, কীট পতঙ্গ ইত্যাদি একটির থেকে অন্যটি যথেষ্ট ভিন্ন। শুরুতে বাইরে থেকে একই চড়ুই আসলেও প্রত্যেক দ্বীপের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে নিতে গিয়ে তাদের দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে– প্রধানত তাদের ঠোঁটে। এটি ঘটেছে ঐ দ্বীপের প্রাচুর্য আছে এমন খাদ্যের সুযোগ নিতে গিয়ে। কোথাও রয়েছে নরোম ফল সেখানে এক রকম ঠোঁটের সুবিধা। কোথাও রয়েছে শক্ত আবরণের ফল বা বাদাম। এর খোলস ভাঙ্গার জন্য হয়েছে শক্ত বেঁটে ঠোঁটের সুবিধা। কোথাও বিশেষ ধরনের পতঙ্গ ধরার জন্য সরু লম্বা বক্র ঠোঁটই হয়েছে সুবিধাজনক। ফলে চড়ুইয়ের ক্ষেত্রে এখানে ঘটেছে প্রজাতি বিচ্ছুরণ।

একই ভাবে আর একটি চমকপ্রদ উদাহরণ নেয়া যায় নানা প্যাটার্ন ও বর্ণের পাখা সৃষ্টির

মাধ্যমে প্রজাপতির প্রজাতি বিচ্ছুরণ। এখানে পরিবেশের যে বৈচিত্র এতে অবদান রেখেছে তা হলো উদ্ভিদ ও ফুল বৈচিত্র। শিকারির হাত থেকে রক্ষা পেতে এ ধরনের প্রজাপতির পাখা এমন ভাবে বিবর্তিত হয়েছে যাতে তা স্থানীয় উদ্ভিদ দৃশ্যের সঙ্গে একেবারে মিশে থাকতে পারে– এর থেকে আলাদা করে তাকে চেনা না যায়– যে ধরনের মিশে থাকাকে বলা হয় কামোফ্লেজ করা। কাছাকাছি জায়গার এক একটিতে উদ্ভিদ ও ফুল বৈচিত্র থাকায় ওখানে প্রজাপতিও বিবর্তিত হয়েছে নানা ভাবে যথাযথ কামোফ্লেজের জন্য। এক্ষেত্রেও তাই সুযোগ ঘটেছে প্রজাতি বিচ্ছুরণের।

বিবর্তনে বড় বড় মোড়

আমরা দেখলাম একই প্রজাতি খুব কাছাকাছি নানা প্রজাতিতে বিবর্তিত হতে পারে বিচ্ছুরণের মত। অন্যদিকে আবার বিবর্তনের ধারায় বিরলতর ক্ষেত্রে বড় বড় মোড় নেবার মত ব্যাপারও ঘটে। তখনই সৃষ্টি হয় শুধু নূতন প্রজাতি নয়, বরং আরো উচ্চতর পর্যায়ে নূতন কিছু – নূতন গণ (জেনাস), কিংবা ফ্যামিলি, অথবা কখনো পুরো নূতন ক্লাস। বিবর্তনের পরিবর্তনগুলোর মধ্যে যদি আসে একেবারে নূতন ধারার প্রবর্তনের মত কিছু, তখনই এটি ঘটে। অতীতে এটি অনেকবার ঘটেছে, এনেছে জীব জগতে বড় বড় পরিবর্তন। সাধারণ এককোষী জীব থেকে এসেছে নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট জটিলতর এককোষী, এসেছে বহুকোষী জীব, চূণাপাথর খোলস সমৃদ্ধ প্রাণি, হাড়যুক্ত প্রাণি, মেরুদণ্ডী, চোখের মত উন্নত অঙ্গ, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদি বড় বড় পরিবর্তন। কাজেই সে সব বিবর্তন শুধু নূতন প্রজাতি সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এটি ঘটেছে আরো বড় দাগে– পূর্বতন প্রজাতিগুলো থেকে দেহগঠন, সক্ষমতা ও অভ্যাসে বেশ মৌলিক ভাবে পৃথক নূতন ফ্যামিলি, নূতন ক্লাস এমনকি ফাইলাম বা কিংডমের।

তবে এরকম বড় দাগের বিবর্তন সম্ভব হতে পারে খুবই বিরল ক্ষেত্রে এবং খুব বড় রকমের পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে। এ ধরনের বিপর্যয়ের ফলে সাধারণত খুব ব্যাপক জীব-বিলুপ্তি ঘটে। আসলে আমরা দেখেছি পরিবেশের সঙ্গে খাপ না খাওয়াতে পারার কারণে সব সময় কিছু কিছু জীব বিলুপ্তি ঘটেছে। নূতন প্রজাতি যেমন সৃষ্টি হচ্ছে, প্রজাতির বিলুপ্তিও ঘটছে। কিন্তু এখন যে বিলুপ্তির কথা বলছি তা পরিবেশের বড় বিপর্যয়ের ফলে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে এক সঙ্গে অনেক প্রজাতির বিলুপ্তি, এমনকি অনেকগুলো পুরো জীব-ফ্যামিলিরই বিলুপ্তি। কখনো কখনো এগুলোকে রীতিমত গণবিলুপ্তি হিসাবে গণ্য করা যায়– পৃথিবীতে যা বেশ কয়েকবার ঘটেছে। এ ক্ষেত্রে অনেক 'ভূবন' এক সঙ্গে খালি হয়ে যায়, নূতন প্রজাতির জন্য এমনকি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের বহু প্রজাতির আগমণের জন্য সুযোগ খুলে যায়। এমনি ভাবে এক সময় পতঙ্গের সমারোহ সৃষ্টি হয়েছিল, সৃষ্টি হয়েছে সরীসৃপের, বা পাখির সমারোহের। এরকম কিছু বড় বিলুপ্তি সুযোগ করে দিয়েছিল অনেক রকমের ডাইনোসরের রাজত্বের। তেমনি বড় একটি গণবিলুপ্তি ডাইনোসর যুগের অবসান ঘটিয়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুত বহু স্তন্যপায়ী প্রজাতির বিকাশ ঘটাবার সুবিধা করে দিয়েছিল। পরে দেখবো, আমাদের আসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই গণবিলুপ্তিটি ঘটেছিল সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে একটি প্রকাণ্ড উল্কাপাতের ফলে।

ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে এক এক সময় যখন উল্লিখিত বড় মোড় নেবার মত পরিবর্তন আসে, তখন সফল নূতন ধরনের জীবের সামনে বহুতরো নূতন ভূবন খুলে যায়। এও যেন এক ধরনের প্রজাতি বিচ্ছুরণের মত। যেমন পাখির ক্ষেত্রেই ধরা যাক। ডাইনোসরদের কোন কোনটির মধ্যে ভিন্ন কাজের জন্য পালকের বিবর্তন হতে হতে এক সময় তা উড়ার কাজে ব্যবহৃত হলো। এভাবে বড় পরিবর্তন যখন এলো তখন সেই প্রথম পাখির সামনে আকাশের অধিকাংশ ভূবন খালি পড়ে ছিল। ফলে অপেক্ষাকৃত দ্রুত বহু পাখি প্রজাতির সৃষ্টি হতে পেরেছিল– এবং কয়েক লক্ষ বছরের মধ্যে বহুতরো পাখির বিচরণে আকাশ মুখরিত হয়েছে।

বিবর্তনের গতি-প্রকৃতি

বৈচিত্রবৃদ্ধির মত বৈচিত্র হ্রাসও ঘটে

আমরা এ পর্যন্ত বিবর্তনের ফলে ক্রমে বেশি বেশি বৈচিত্র সৃষ্টি হতে দেখেছি। যেখানে একটি প্রজাতি সেখানে দুটি হয়েছে, কয়েকটা হয়েছে, কখনো প্রজাতি-বিচ্ছুরণের ঘটনায় অনেক ক'টা হয়েছে। এভাবে যত দিন গিয়েছে তত বেশি বেশি করে প্রজাতি শাখা প্রশাখা মেলেছে, এমনকি জীবের আরো মৌলিক শ্রেণী– নূতন নূতন ফ্যামিলি, ক্লাস ইত্যাদিও সৃষ্টি হয়েছে। এমনটিই আমরা আশা করি ফসিল সাক্ষ্যের কাছে। বাস্তবে কিন্তু এর বড় ধরনের ব্যতিক্রম দেখা গেছে ফসিলের মাধ্যমে পাওয়া জীবের ইতিহাসে। প্রাচীন জীবের ফসিল সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে পাওয়া গেছে মাত্র ৫৫ কোটি বছর আগের থেকে, যদিও এর বহু আগেই জীব জগত যথেষ্ট বৈচিত্র ও বিকাশ লাভ করছিল। এই সময়টি ভূতাত্ত্বিক যুগ বিভাজনের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ বলে পরিচিত। তখনকার ফসিল সমারোহে দেখা যাচ্ছে যে সে সময় প্রাণি জগতের বেশির ভাগ প্রধান ফাইলামগুলোর সূচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল- অর্থাৎ কিনা প্রাণির যে ক'টি বিভিন্ন মৌলিক দেহ-পরিকল্পনার (বডি-প্ল্যান) রূপ আমরা এখন দেখি তার অনেকগুলোর নমুনা সেখানেই ছিল। বরং কিছু কিছু বাড়তিও ছিল, যেগুলো পরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বৈচিত্র সৃষ্টির সেই গতি যদি অব্যাহত থাকতো তা হলে এখন এত বছর পরেও মোটামুটি ঐ ফাইলামগুলো নিয়েই আজকের জীবজগত রচিত হতোনা, ইতোমধ্যে আরো অনেক অভিনব ফাইলাম সৃষ্টি হতো। কিন্তু তা হয়নি। তখন যেভাবে মৌলিক দেহ-পরিকল্পনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক জোয়ার এসেছিল, পরে তেমনটি আর দেখা যায়নি। এটি কেন?

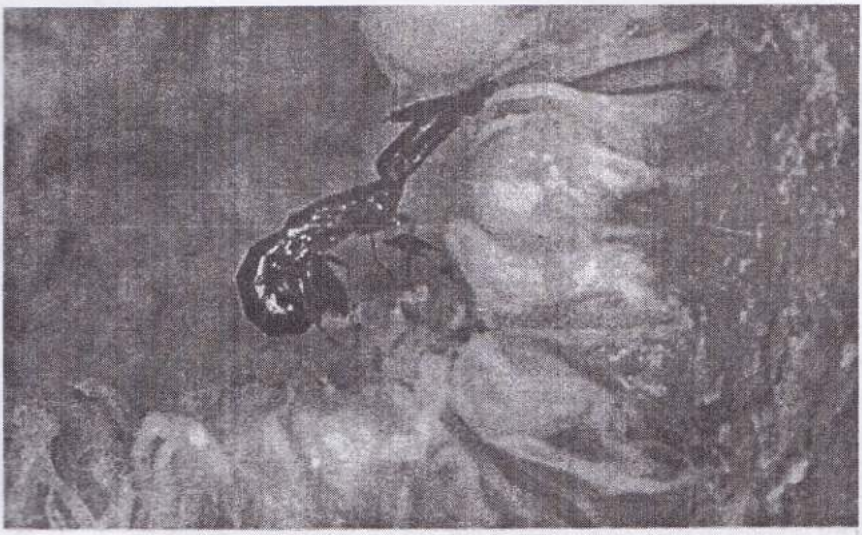
বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এর কারণ ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের সেই বৈচিত্রের মহাসমারোহের পর বিবর্তনের উপর এক ধরনের রাশ টেনে ধরার ব্যাপার দেখা দিয়েছে। এই রাশটি এসেছে নিয়ন্ত্রণকারী জিনের (রেগুলেটরি জিন) থেকে। ক্রমে ক্রমে এই নিয়ন্ত্রণকারী জিনগুলো সৃষ্টি ও কার্যকর হয়েছে, অন্যান্য জিনের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, এবং দেহ-পরিকল্পনার মৌলিক রূপগুলোর বিবর্তনকে একটি সীমিত খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করেছে। দেহ গঠনের নিয়ন্ত্রণে হক্স জিন, প্যাক্স জিন ইত্যাদি কিছু নিয়ন্ত্রণকারী জিনের ভূমিকা আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি। ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে এই নিয়ন্ত্রণকারী জিনগুলো যথেষ্ট বিকশিত হয়ে উঠেনি, নিয়ন্ত্রণ তাই ঢিলেঢালা ছিল। পরে এগুলো আরো কার্যকর হওয়াতে দেহ গঠনের ক্ষেত্রে বিবর্তনের স্বাধীনতা বেশ খানিকটা কমে গেছে। এসব আমরা ব্যাখ্যা করতে পারছি অতি সম্প্রতি বিভিন্ন প্রাণির সকল জিন অর্থাৎ জেনোম

উদ্ঘাটন করতে পারার ফলে। এর আগে এক একটা জিনকে স্বাধীনভাবে বাস্তবায়িত হতে সক্ষম বলে মনে করা হলেও পুরো জেনোমকে এক সঙ্গে বিবেচনা করতে পেরে আমরা দেখছি জেনোমের নিয়ন্ত্রণকারী অংশগুলো বাস্তবায়নকারী জিনগুলোর প্রকাশে কী রকম বিরাট ভূমিকা রাখছে। একই রকম কারণেই শিম্পাঞ্জির সঙ্গে আমাদের জিনের পার্থক্য ২% এর কম হওয়া সত্ত্বেও জেনোমের সামগ্রিক খুবই ভিন্ন বাস্তবায়নে শিম্পাঞ্জির সঙ্গে মানুষের এত বড় পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

সহ-বিবর্তন: পরস্পরের প্রভাবে বিবর্তন

একটি পারিবেশিক সিষ্টেমের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির সদস্যদের ভেতর নানা রকম আন্তক্রিয়া থাকতে পারে। এগুলো কোন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সম্পর্ক, কোন ক্ষেত্রে সহযোগিতার, পরস্পর নির্ভরশীলতার, শিকার-শিকারির সম্পর্ক- ইত্যাদি নানা রকম। এসব আন্ত ক্রিয়ার ফলে এদের প্রত্যেকের পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে জেনেটিক বৈচিত্রগুলো থেকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্যটির প্রভাব অনুভূত হয়। অর্থাৎ অন্যটির প্রভাবও তার নির্বাচনী চাপের সঙ্গে যুক্ত হয়, এমনকি সেটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে উভয়েরই একরকম সহ-বিবর্তন ঘটে যাতে পরস্পরের কারণে এদের কিছু প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট ক্রমে বেশি বেশি প্রকটিত হতে থাকে।

যেমন শিকার-শিকারির উদাহরণটি নেয়া যাক। তৃণ-ভোজি পতঙ্গ বা পশুর সঙ্গে বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের সম্পর্ক এরকম। সেই প্রাণির হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারা বিবর্তনগত দিক থেকে টিকে থাকার জন্য উপকারি হওয়াতে ঐ প্রাণিকে দূরে রাখার মত বিষাক্ত পদার্থ ঐ উদ্ভিদে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তাতে প্রাণিটির নিজের বিবর্তন যে নিরস্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে তা তো নয়। এর ফলে বহু প্রজন্ম ধরে ঐ প্রাণিতে সেই বৈচিত্রগুলোই ক্রমে প্রাধান্য লাভ করেছে যাদের পাকস্থলীতে উদ্ভিদের ঐ বিষ ক্ষয় করার মত রাসায়নিক পদার্থ ছিল। শুধু তাই নয়, ঐ বিষক্ষয়ের কার্যকারিতা ক্রমেই বিবর্তনের ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ যেন দুই গোষ্ঠির মধ্যে এক ধরনের অস্ত্র প্রতিযোগিতার মত। উদ্ভিদটির বিষ যত তীব্রতর হয়েছে, প্রাণিটির বিষক্ষয় পদ্ধতি তত বেশি কড়া হয়েছে। ফলে উদ্ভিদ যেমন প্রাণিটির কারণে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারেনি, তেমনি প্রাণিটিও বিষ সত্ত্বেও ঐ খাবার থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়নি। এটিই-সহ বিবর্তন। হরিণ আর চিতা উভয়েই যে এত বড় দৌড়বিদ হয়েছে তাও হয়তো পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিবর্তনের কারণে– উভয়ের দৌড়বার পায়ের পেশি ও নিশ্বাসের দম ক্রমাগত উন্নততর হবার দিকে বিবর্তিত হয়েছে বলেই। এরকম সহ-বিবর্তনের অনেক উদাহরণ আমরা সর্বত্র দেখতে পাই। এ জন্যই আমাদের দেহে বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে। আবার এর ফলেই সে সব রোগ জীবাণুও ভিন্ন কৌশল নিয়ে বিবর্তিত হচ্ছে। যেখানে রোগটির প্রাদুর্ভাব বহুকাল ধরে রয়েছে যেখানে প্রতিরোধ ক্ষমতাও বহুকাল ধরে আছে। ইউরোপের মানুষ যখন আমেরিকা আবিষ্কারের পর সেই মহাদেশে বসতি স্থাপন করতে যায় তাদের রোগগুলোও সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমেরিকার আদি বাসিন্দাদের মধ্যে ঐ রোগগুলো ছিলনা বলে সেগুলোর প্রতিরোধ ক্ষমতাও ছিল না। ফলে ইউরোপীয় রোগে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে তাদের দেরি হয়নি।



ডুমুর এবং ডুমুরের ভোমরার সহবিবর্তন

সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগায়নের কথা ধরা থাক। প্রজাপতি, মৌমাছি, বোলতা, পাখি, বাদুড় প্রত্যেকে যে যে রকম উদ্ভিদের পরাগায়ন করে সেই উদ্ভিদের সেই ফুলের উপযুক্ত হয়ে এটি নিজকে বিবর্তিত করে নেয়। এই বিবর্তন দেহগত ভাবে তো ঘটে বটে এমন কি আচরণগত ভাবেও। যেমন ঐ ফুল ফোটার মৌসুম বা সময়ের সঙ্গে তাদের মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ ও ভ্রমণের আচরণগুলো বিবর্তিত হয়। অন্য দিকে ফুলগুলোও বিবর্তিত হয়েছে তাদের যার যার পরাগায়নকারীদেরকে ভাল ভাবে আকৃষ্ট করতে পারার জন্য এবং সে যখন ফুলের উপর আসে তখন যেন কার্যকরভাবে পরাগায়ন করতে পারে সেরকম হতে। এই ব্যাপারে বোধ হয় ডুমুরের ফুল আর ডুমুরের ভোমরা সবাইকে টেক্কা দিতে পারে। ডুমুরের ফুল খুব ছোট ছোট এবং এর ফলের মধ্যে ভেতরে লুকানো থাকে বলে প্রচলিত ধারণা হলো ডুমুরের ফুল নাই। কাউকে অনেকদিন দেখা না গেলে আমরা বলি সে 'ডুমুরের ফুল' হয়ে গেছে। এ ফুল যে এভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা তার পরাগায়নকারী ভোমরাটির সুবিধার জন্য। অদ্ভুত সরু ঐ ভোমরাটিই শুধু ফলের ছিদ্রপথে ঐ ফুলের কাছে যেতে পারে এবং সেখানে পুরুষ ফুল থেকে পরাগ স্ত্রী ফুলে নিয়ে যেতে পারে (একই ফলে দুটিই থাকে)। ডুমুরের ফুল ছোট হওয়ার ও লুকানো থাকার কিছু নির্বাচনী সুবিধা অবশ্যই রয়েছে, খুব সম্ভব সেটি নিরাপত্তার সুবিধা। একই সঙ্গে এর সঙ্গে তাল রেখে ডুমুরের ভোমরা ক্রমে সরু হয়েছে অন্য প্রতিযোগীদেরকে হারিয়ে দিয়ে এই ফুলের মধু নিতে পারার জন্য। এটি একদিনে এক প্রজন্মে হয়নি। উভয়ের ক্ষেত্রে এটি বহুকাল ধরে সহ-বিবর্তনের ফল।

বিবর্তন কি কোন লক্ষ্যের দিকে এগোয়?

অতীতে অনেক ক্ষেত্রে বিবর্তনকে একমুখি হতে দেখা গেছে– যেমন স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে ক্রমাগত দেহ বড় হওয়া, প্রাইমেটদের ক্ষেত্রে ক্রমাগত মস্তিষ্ক বড় হওয়া, জটিল হওয়া

ইত্যাদি। এতে আমাদের ধারণা হতে পারে যে বিবর্তন কোন উন্নত বা কাঙ্খিত লক্ষ্যকে সামনে রেখে সেদিকে এগুচ্ছে। যেমন আমরা মনে করতে পারি চোখ বা এরকম কোন কোন দেহাংশের কার্যকারিতাকে নিঁখুত করা, দেহকে নিঁখুত করা, কিংবা চিন্তার ক্ষমতাকে সর্বোত্তম করা– এমনি কোন কোন বড় লক্ষ্য নিয়ে বিবর্তন এগিয়েছে, এবং এখনো এগুচ্ছে। কিন্তু এটি সত্য নয়। এমনকি বিবর্তন সরলতর থেকে জটিলতর জীবের দিকে যায়– একথাও সব সময় সত্য নয়, যেমন সত্য নয় বিবর্তন প্রগতি-মুখি এমন কথাও। মোটের উপর বিবর্তন একটি অনিশ্চিত বিষয়। কোন সুদূরবর্তী লক্ষ্য নয়, বরং সমসাময়িক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন থেকেই এটি উৎসারিত হয়। প্রতিটি ধাপে সেই খাপ খাওয়ার কাজে যা সফল হবে, বিবর্তন সেদিকেই যাবে। পেছনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘদিনের সার্বিক বিবেচনায় একে উন্নতির দিক মনে হতে পারে, অথবা অবনতির দিক, কিন্তু বিবর্তন সে রকম কোন লক্ষ্য নিয়ে ঘটেনি।

তবে বিবর্তন তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে, তাৎক্ষণিক সুবিধা লাভের জন্য ধাপে ধাপে ঘটার সময় দেহের বিভিন্ন অংশকে পরস্পর সমন্বয় করে চলতে হয়েছে। অনেক সময় এক ধরনের একমুখি প্রবণতা দেখা দিয়েছে এই সমন্বয় করতে গিয়েই। যেমন ঘোড়ার আদি বিবর্তনে দেখা গেছে যে কয়েক কোটি বছর ধরে এর পেষণ দন্ত প্রজন্মের পর প্রজন্মে ক্রমে বড় হয়েছে। সেই সঙ্গে দেখা যায় যে ঘোড়া ছোট আকার থেকে শুরু করে ক্রমশ আকারে বড় হয়েছে। এখন বুঝা যাচ্ছে যে ঘোড়ার দাঁতের বড় হবার জন্য এর চোয়ালকে বড় হতে হয়েছে, সে কারণে মাথাকে বড় হতে হয়েছে, বড় মাথার কারণে পুরো দেহকেও বড় হতে হয়েছে। পাখির পূর্বসূরি যতদিন উড়েনি ততদিন তার বিবর্তন এক ধরনের ছিল। উড়তে গিয়ে তাকে দেহ-পরিকল্পনায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে হয়েছে। এর জন্য তার দেহকে আঁটসাট ও হালকা হতে হয়েছে, হাঁড়কে ঝাঁকরা হতে হয়েছে, একটানা ওড়ার সক্ষমতার জন্য হার্টকে দক্ষ হতে হয়েছে, উপর থেকে শিকার দেখার জন্য চোখকে তীব্র দৃষ্টির অধিকারী হতে হয়েছে- যার জন্য মস্তিষ্কেও পরিবর্তন আনতে হয়েছে। স্পষ্টত এদের মধ্যে একটি বৈশিষ্টকে জায়গা করে দেয়ার জন্য অন্যটিকে ঘটতে হয়েছে। স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্কের বিবর্তনে এমনটি ঘটেছে, বিশেষ করে বানর প্রভৃতি প্রাইমেটদের মধ্যে, আরো বিশেষ করে মানুষের মধ্যে। দৃষ্টির বোধকে অধিকতর উপযোগী হতে গিয়ে প্রাইমেটে মস্তিষ্কের ব্যতিক্রমী উন্নয়ন শুরু হয়েছিল। মস্তিষ্কের দর্শন অংশকে বড় করতে গিয়ে অন্যান্য অংশকেও বড় হতে হয়েছে। মানুষে এসে এটি এত বড় হতে হয়েছে যে মানুষ অকল্পনীয়ভাবে চিন্তার ক্ষমতা লাভ করেছে। মস্তিষ্ককে বড় করতে গিয়ে মানুষের চোয়ালকে ছোট করে গুটিয়ে সামনে চাপা সমতল করে নিতে হয়েছে।

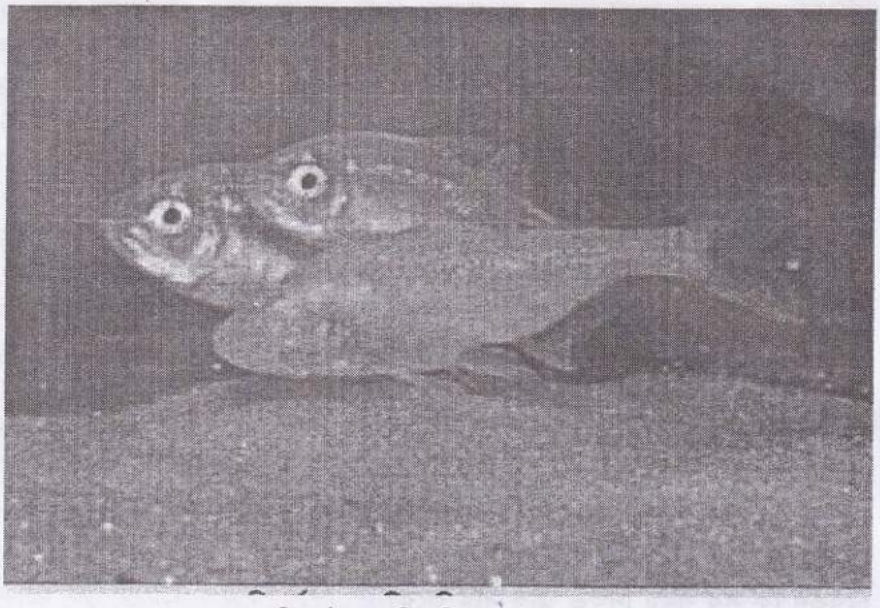
এ ভাবে সুসমন্বিত বিবর্তন যাদের মধ্যে হতে পারেনি তারা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পেরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন দাঁত বড়, চোয়াল বড়, মাথা বড় ও দেহ বড় হওয়ার ব্যাপারটি ঘোড়ার বিবর্তনে শেষ পর্যন্ত শুধু ঘোড়ার কয়েকটি ধারার মধ্যে সম্ভব হয়েছে। অন্য ধারাগুলোতে এই ভাবে হওয়ার শর্তগুলো পূরণ না হওয়াতে সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কাজেই বিবর্তনে যাকে আমরা সহজাত একমুখি প্রবণতা হিসাবে দেখি তা আদৌ সেরকম লক্ষ্যনিষ্ঠ কিছু নয়। আসলে একটির কারণে আরেকটি

পরিবর্তনের বাধ্যবাধকতা তাকে আপাতত একটি নির্দিষ্ট খাতে পরিবর্তিত হতে বাধ্য করেছে মাত্র। অন্য রকম বাধ্যবাধকতা এসে যখন ঐ খাতে আর এগুনো অসম্ভব করে তোলে, তখন সে অন্যদিকে মোড় নিতে বাধ্য হয়। যেমন এত কাল ধরে যার বড় হবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল সে হয়তো ছোট হবার দিকে এগুতে থাকে এবার, অথবা একই স্থিত আকারে থেকে যায়। বিবর্তনের ইতিহাসে এমনটি বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। উদাহরণ স্বরূপ প্রাইমেটদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক বড় হওয়ার প্রবণতাটি দীর্ঘদিন একই খাতে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু ষ্টারফিশের পূর্বসূরিদের এক সময় মস্তিষ্ক থাকলেও পরে তা মোড় নিয়েছে মস্তিষ্ক বাদ দেবার দিকে, যে কারণে আজকের ষ্টারফিশের মস্তিষ্ক নাই। জলে-স্থলে বিচরণশীল উভচর প্রাণি বিবর্তিত হয়েই পুরাপুরি স্থলের প্রাণি সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তার বহুকাল পর সেগুলোর কিছু স্তন্যপায়ী উত্তরসূরি তিমি, সীল ইত্যাদি আবার সমুদ্রে ফেরৎ যাওয়াটাই সুবিধাজনক মনে করেছে। অতি সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে মানুষের হাত থেকে আত্মরক্ষার পারিবেশিক চাপে বর্তমানে বড় ও সচরাচর দৃশ্যমান কিছু মাছ ও জলজ প্রাণি এখন আকারে ছোট হওয়ার দিকে ও সমুদ্রে অপেক্ষাকৃত প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে যাওয়ার দিকে বিবর্তিত হতে শুরু করেছে।

বিবর্তন কি সব সময় নিখুঁত জীব সৃষ্টি করে?

বিবর্তন যেমন কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ? এগোয়না, তেমনি শেষ অবধি নিঁখুত হবার জন্য কিছু চেষ্টা ধাপে ধাপে চালিয়ে যাচ্ছে একথাও বলা যাবে না। প্রাকৃতিক নির্বাচন সব ভাবে নিখুঁত বৈশিষ্টগুলোকেই নির্বাচিত করেনা, আপাতত টিকে থাকার জন্য সুবিধাজনক হবে, কাজ চলে যাবে, এমনগুলোকেই নির্বাচন করে। কাজ যদি চলে যায় তা হলে আপাতদৃষ্টিতে ভুল ব্যবস্থাকেও সে বজায় রেখে দেয়। এমনকি দীর্ঘকাল ধরেও ঐ খুঁতসহ ব্যবস্থা বজায় থাকে, যদি তাতে কাজ চলে যায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে। এরকম অনেক উদাহরণ আমরা এখনো দেখতে পাই। হাঙ্গর মাছ বিবর্তিত হয়েছে মাছের যুগের একেবারে শুরুতে বহু কোটি বছর আগে। এই দীর্ঘকালেও তার মধ্যে গ্যাস ব্লাডার বা পোটকা দেখা দেয়নি। সাধারণ মাছে এই ব্লাডারের কাজ হলো পানিতে একটি বিশেষ গভীরতায় থেকে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করা। হাঙ্গর এই সহজ কাজটির দিকে বিবর্তিত না হয়ে বিশেষ কায়দায় কষ্ট করে সাঁতার কেটে ভারসাম্য রক্ষা করেছে। তাতেও কাজ চলে গেছে বলে একে পোটকায় নিয়ে গিয়ে আরো নিঁখুত করার চেষ্টা চলেনি। এ জন্য হাঙ্গর বরং অন্যদিকে কিছু পরিবর্তন এনেছে– লিভারকে হালকা করেছে, মুখে বাতাস নেবার অভ্যাস করেছে। আমরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করি বলে ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে 'উন্নত' প্রাণিদেরকে বেশি নিঁখুত বলে মনে করি। কিন্তু অন্য বিচারে ব্যাকটেরিয়াও কম নিঁখুত বা কম সফল নয়, তাদের চারশ কোটি বছরের দীর্ঘ স্থিতিই তার প্রমাণ।

আসলে একবার কাজ চালাবার মত একটি বৈশিষ্ট চলমান পরিবেশের চ্যালেঞ্জগুলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলে ওটিই চলতে থাকে, 'নিঁখুত' বা 'উন্নত' হবার ধার না ধেরে। পরে যখন বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বড় রকম নূতন চ্যালেঞ্জ এসে পড়ে তখন হয়তো তাকে নূতন কিছু দিয়ে চেষ্টা করে ঐ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। এখন থেকে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে এক মহা বিপর্যয়ে ডাইনোসররা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত



বিতর্তন অবনতির দিকেও হতে পারে
(গুহায় বাসকারী এ প্রজাতির মাছ বিবর্তনে চোখ হারিয়েছে)

স্তন্যপায়ীদের বিবর্তন সীমিত ছিল। তারপর কিন্তু তাদের অনেক বিকাশ ঘটেছে, সেই পরিবেশ পরিবর্তন যখন এসেছে। চোখের বিকাশকে বিবর্তনের একটি অনন্য সৃষ্টি মনে করা হয়। কিন্তু মেরুদণ্ডী প্রাণিতে অতি জটিল প্রায়-নিঁখুত চোখের যে বিবর্তন ঘটেছে তার মধ্যেও কিন্তু বড় বড় খুঁত রয়ে গেছে যা মানুষের চোখে পর্যন্ত বিদ্যমান। অপটিক নার্ভটি রেটিনার মধ্য দিয়ে যেতে গিয়ে আমাদের দর্শনে কয়েকটি ব্লাইন্ড স্পট সৃষ্টি হয়েছে। দৃশ্যমান কিছু যদি ঠিক ঐ এলাকায় আসে তা হলে সেটি আর আমরা দেখতে পাইনা। অথচ বহু কালের বিবর্তনে এই খুঁতটি ঠিকই টিকে গেছে, এবং টিকে আছে। এর যে অসুবিধা তাতে এমন কোন সমস্যা হয়নি যার ফলে অন্য কিছু বিবর্তিত হতে হবে। তাছাড়া চোখে আরো কিছু সহ্য হবার মত ত্রুটি রয়ে গেছে। রেটিনাটি রয়েছে উল্টানো রূপে, এর আলোকসংবেদি অংশ এর তলায় ভেতরের দিকে। ফলে ঐ সংবেদি অংশে পৌঁছতে হলে আলোকে সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র ও রক্তবহ কৈশিক নালির জাল পার হয়ে যেতে হয়। যদিও এদের সূক্ষ্মতার কারণে এতে আলো তেমন শোষিত হয়না, আপেক্ষাকৃত বড় রক্তনালিগুলো কিন্তু কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে। এসব সমস্যা সত্ত্বেও চোখের কাজ চলে যায়, তাই এটি আর বদলায়নি, চোখকে আরো নিখুঁত করার কোন গরজ বিবর্তনের হয়নি। অন্যদিকে যথেষ্ট নিঁখুত চোখের অধিকারী হয়েও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে এর কোন ভূমিকা থাকেনি বলে কোন কোন প্রাণি চোখকে অপ্রয়োজনীয় বলে ত্যাগ করেছে, এমন নজির আছে। গুহার তলা দিয়ে প্রবাহিত নদীতে বাস করে এমন কোন কোন মাছে এক কালে চোখ থাকলেও পরে চোখহীনতার দিকে বিবর্তিত হয়েছে, অন্ধকার গুহায় চোখের ভূমিকা না থাকাতে। এখন তারা সম্পূর্ণ অন্ধ।

শুধু চোখ কেন, আমাদের খাদ্য নালি ও শ্বাস নালির কথাই ধরা যাক। বিবর্তনে ফুসফুস ধীরে গড়ে উঠার সময় এই দুই নালির পারস্পরিক অবস্থানটি ঠিক নিঁখুতভাবে ঘটেনি। খাবার গেলার সময় শ্বাস নালি বন্ধ রাখার যে ব্যবস্থা রয়েছে তা নিঁখুত না হওয়াতে প্রায়শ ভুল নালি দিয়ে খাবার চলে গিয়ে বিষম খাওয়ার বিপদ ঘটে। বিবর্তন এই বিপদকেও এত বেশি সামনে আনেনি যে তার ভুল সংশোধন হবে। হয়তো টিকে থাকা না থাকার ক্ষেত্রে এটি বড় কোন ভূমিকা রাখেনি বলেই এমন হয়েছে।

আসলে আমরা আগেই দেখেছি বিবর্তন হচ্ছে পুরানো জেনেটিক খসড়াকে সম্পাদনা করার মত। ঐতিহাসিকভাবে ভুলচুক সহ যে খসড়া আমরা পেয়েছি সেই এককোষী ক্ষুদ্র জীব থাকার আমল থেকে, তার অনেক কিছু বদলালেও সব কিছু নিঁখুত ভাবে হয়নি। আমরা সুদূর অতীত থেকে ভুল-শুদ্ধ মিলিয়ে যে জেনেটিক ঐতিহ্য বহন করছি বিবর্তন তা দিয়েই যথাসাধ্য কাজ চালাবার চেষ্টা করে। নিঁখুত এবং আদর্শ হবার কোন চাপ তার উপর নাই, শুধু তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিতে টিকে থাকার চাপটুকুই হয়েছে।

বিবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী, কেমন করে সে জ্ঞান কাজে লাগাবো

বিবর্তনে সামনে কী ঘটবে তা যেহেতু সুনির্দিষ্ট করে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়না যে জন্য কেউ কেউ একে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান বলতে চান। এটি ঠিক যে বিবর্তনে যেহেতু ইতস্তত বৈচিত্র বা সম্ভাবনার ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই সামনে কী হবে সেটি এর দ্বারা বলতে পারার সুযোগ সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাই বলে এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিছু মাত্র দুর্বল হয়না। বিজ্ঞানে অনেক কিছুই এরকম ইতস্তত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন আবহাওয়ার কথাই ধরা যাক। যে থিওরির ভিত্তিতে সামনের দিনগুলোর আবহাওয়ার বৈজ্ঞানিক চিত্র আঁকা যায় তা হলো 'কেওস' বা বিশৃঙ্খলার থিওরি। এরও ভবিষ্যদ্বাণী দেবার ক্ষমতা সীমিত। তারপরও যথেষ্ট নিঁখুত পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব, বিশেষ করে সামনের অল্প কয়েকদিনের জন্য। তেমনি বিবর্তন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে আমরা যথেষ্ট নির্ভুলতার সঙ্গে কতগুলো সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে বলতে পারি। অতীতে এরকম ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভুল হবার একটি চমকপ্রদ উদাহরণ হলো ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লব জোরদার হবার সঙ্গে সঙ্গে এক জাতীয় মথ প্রজাপতির রঙ বিবর্তিত হয়ে বেশ কালচে হয়ে পড়েছিল, কয়লার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন কালো দালান কোঠা গাছপালা ইত্যাদির রঙের সঙ্গে গা মিলিয়ে শিকারির থেকে আত্মরক্ষা করার প্রয়োজনে। বিবর্তনটি খুব দ্রুত ঘটেছে বলতে গেলে অনেকের চোখের সামনেই। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে পরিবেশ সচেতন হয়ে শিল্প দূষণ কমতে আরম্ভ করলে এবং দালান কোঠা পরিস্কার করার কাজ শুরু হলে বিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে এর ফলে শিগ্‌গির এ প্রজাপতির রঙ হালকা হয়ে উঠবে। কারণ সে ক্ষেত্রে যারা এরকম হালকা রঙের তারাই আশে পাশে রঙের সঙ্গে মিশে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে বেশি। এখন দেখা যাচ্ছে আসলেও ঘটনা হয়েছে তাই। কাজেই সীমিত আকারে হলেও বিবর্তনের কিছু পূর্বাভাষ দেয়া যায়। আর কোন কোন ক্ষেত্রে এই পূর্বাভাষ দিতে পারাটি দারুণ কাজেও লাগে।

বাস্তব ক্ষেত্রে এমনি কাজের লাগার একটি উদাহরণ হলো রোগ জীবাণুর দ্রুত বিবর্তনে তাদের মধ্যে এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধ গড়ে উঠার সম্ভাবনাগুলোকে গবেষণায় এনে ঔষধ

উন্নয়নে কাজে লাগানো। তাছাড়া জীব বিজ্ঞানের নানা দিককে বুঝতে হলে তার বিবর্তনগত ব্যাখ্যাটি পাওয়া জরুরী। জীবজগতে অসংখ্য বিষয় আছে যার শুধু বিবর্তন-নির্ভর ব্যাখ্যাই রয়েছে। পাখি কেন গান গায়, তাদের মধ্যে কেন দীর্ঘ বাহারি লেজের এত বৈচিত্র, রাতে ফোটা ফুল কেন সাদা ইত্যাদি সাধারণ ঘটনাও এর অন্তর্ভূক্ত। বিবর্তন নির্ভর ব্যাখ্যা অনেক কার্য-কারণ বুঝে সমস্যা সমাধানের পথও করে দিয়েছে, যদিও সব ক্ষেত্রে নয়। বিবর্তনের অনুধাবন ছাড়া আজকের জীব বিজ্ঞান গবেষণা অসম্ভব। আর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলতে গেলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্ত হলো কী হবে তা বলা যতটা নয়, কী হবেনা, হতে পারবেনা তা বলতে পারা। বিবর্তন তত্ত্ব সেটি কিন্তু বেশ দক্ষতার সঙ্গে বলতে পারে। বিবর্তন তত্ত্বের প্রয়োগে আমরা জানি যে স্তন্যপায়ী ও পাখি সরীসৃপ-বিবর্তনের দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন শাখা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই দুই শাখার বিচ্ছেদ ঘটেছে সরীসৃপ বিবর্তনের একেবারে প্রথম দিকের যুগে। তাই অতীতের এমন কোন প্রাণির ফসিল যা অংশত স্তন্যপায়ী অংশত পাখি, তা যে পাওয়া যাবেনা সেটি বিবর্তন নিশ্চিত করে বলতে পারে। আসলেও তা পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে অংশত পাখি ও অংশত সরীসৃপ এমন প্রাণির ফসিল থাকার কথা, এবং তা পাওয়াও গেছে।

নিকটাত্মীয়ের প্রতি টান বিবর্তনজাত

-মা বাবার ক্ষেত্রে সন্তানের প্রতি টান এবং তাকে রক্ষা করার আকুতি শুধু মানুষের মধ্যে দেখা যায় তা নয়, জীব জগতে ব্যাপকভাবে তা দেখা যায়। এর থেকে বুঝা যায় যে আমরা এটি বিবর্তনগত ভাবে পেয়েছি, এটি কোন মানবিকতার বিশেষ গুণ নয়। আর এটি হওয়াই যে স্বাভাবিক তা বিবর্তনের অ আ ক খ থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়। ধরে নিতে পারি যে গোড়াতে একটি প্রাণির নানা বৈচিত্রের মধ্যে কোন মা সন্তানকে জিনগত কারণে সহজাত ভাবে আগলে রেখে রক্ষা করেছে, আর কোন মা ভিন্ন জিন থাকাতে সহজাত কারণেই তা করেনি, নির্লিপ্ত থেকেছে, অথবা সন্তানের ক্ষতি করেছে। দুই রকমের জেনেটিক বৈশিষ্টই হয়তো স্বাভাবিক বৈচিত্রের মধ্যে ছিল। এর মধ্যে শেষেরটি যেই মায়ের ছিল তার সন্তান শৈশবে না বাঁচারই কথা, বিশেষ করে অতীতে প্রাণিদের জন্য প্রতিকূল পরিবেশে। কাজেই সেই সন্তানরা মায়ের স্নেহহীনতার জিন বহন করলেও তাদের প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে নিজেদের সন্তান দেবার সুযোগ না ঘটাতে সেই জিনের সেখানেই সমাপ্তি ঘটেছে। অন্যদিকে সন্তানের প্রতি স্নেহময়তার জিন কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকে থাকার সুযোগ পাচ্ছে। কাজেই পরবর্তীতে মাতৃস্নেহই জেনেটিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ঠিক একই ভাবে পিতৃস্নেহের জিনও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। জীব জগতে স্নেহ, টান, সেজন্য ত্যাগ স্বীকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে জেনেটিক প্রভাব নিয়ে সাম্প্রতিক কালে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে।

বাবা মার ক্ষেত্রে যা সত্য তা অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের ক্ষেত্রেও আত্মীয়তার নৈকট্য অনুযায়ী প্রযোজ্য। যেমন ভাইবোনের ক্ষেত্রে দেখা যাক। ভাই বোনরা তাদের জিন একই বাবা মা থেকে পায় বলে তাদের অনেক জিন পরস্পর একই হয়ে থাকে। ভ্রাতৃস্নেহের নানা বৈচিত্রের মধ্যে যেই জিন ভাই বোনকে নিরাপদে রাখার জন্য নিবেদিত ছিল তার ভাই বোনের মধ্যেও সেই একই জিন থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি। ঐ নিরাপদে রাখার ফলে ঐ

রকম জিনধারী ভাই বোনরা ছোট বেলায় টিকে গেছে বেশি, সন্তান দেয়ার বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পেরেছে বেশি, কাজেই সেই জিনই যুগ যুগ ধরে সঞ্চারিত হয়েছে– ভাই বোনদের প্রতি টান থাকার জিন। আর যার জিন ভাইবোনকে শত্রুতা করার, তাদের প্রতি নির্লিপ্ত থাকার, বা তাদের ক্ষতি করার ছিল, সেই ভাইবোন বেঁচে থেকে সন্তান দেয়ার সম্ভাবনা কমে গিয়েছিল বলে সেই জিনও ক্রমে ক্রমে বিরল হয়ে গেছে। প্রক্রিয়াটি ভাইবোনের ক্ষেত্রে যে রকম কাজ করেছে, কাজিনদের ক্ষেত্রে তা কিছুটা কমে গেছে, কারণ কাজিনদের সঙ্গে একই জিন থাকার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম, যদিও যথেষ্ট রয়েছে। তাই এই পর্যায়ের আত্মীয়দের প্রতি কিছুটা হলেও আমাদের টান অনুভবের জিনটি প্রাধান্য লাভ করা স্বাভাবিক। এভাবে আত্মীয়তা যত কম নিকট হবে সহজাত টানও তত কম হবে।

এর পর নিকটাত্মীয়ের কথা ছেড়ে আমরা যদি নিজেদের জনগোষ্ঠি, বা জাতিতে আসি, সেখানেও সাধারণভাবে হলেও বেশ কিছু জিন-বৈশিষ্ট পরস্পরের সঙ্গে মিল থাকার সম্ভাবনা থাকে– অন্তত অন্য গোষ্ঠি, অন্য জাতির সঙ্গে মিলের তুলনায়। কাজেই স্বগোষ্ঠির বা স্বজাতির প্রতি ঐ টানের ব্যাপারটি জেনেটিক দিক থেকে কিছুটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অনেক প্রাণির ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে যায় যে দেখা যায় যে গোষ্ঠির অন্য সদস্যদেরকে রক্ষা করার জন্য নিজে মরে যাওয়ার ঝুঁকিও তারা নেয়। অবশ্য এরকম ক্ষেত্রে গোষ্ঠির মধ্যে আত্মীয়ই থাকে প্রধানত, যেমন মৌমাছির চাকে। এরকম আত্মঘাতী প্রবণতার জিনও যে টিকে রয়েছে তাও বিবর্তনগত সুবিধার জন্যই। নিজে মরে গেলেও সেই মরে যাওয়ার কারণে এই জিন-ধারী গোষ্ঠির অনেকে বেঁচে যেতে পারাতে ঐ জিনের প্রসার ঘটেছে। কাজেই গোষ্ঠির জন্য নিজেকে আত্মাহুতি দেয়ার জিন অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে– যেমন কোন কোন প্রজাতির পিপড়ার ক্ষেত্রে। তাই এরা বিপদের সময় নিজেরা আত্মাহুতি দিয়ে মরে গিয়ে মৃতদেহের উপর দিয়ে অন্য সঙ্গীকে চলে যাবার সুযোগ করে দেয়। এটি তারা কোন সজ্ঞান মহত্ত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে করছেনা, বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হওয়া তাদের সহজাত একটি জেনেটিক প্রকৃতির কারণেই করছে।

মানুষের ক্ষেত্রে আমরা এরকম বা অন্য ধরনের ত্যাগ স্বীকারকে মানবিক মহত্ত্ব মনে করি। কিন্তু যতক্ষণ সেটি শুধু নিকটাত্মীয় বা নিজের গোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে ততক্ষণ তাকে বিবর্তন জাত মনে করার সুযোগ থেকে যাবে। কিন্তু তার বাইরে গিয়ে যদি আমরা আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে, কিংবা স্বজাতি পরজাতি নির্বিশেষে এমনি ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত হই তখন তাকে বলা যায় বিশুদ্ধ মানবতা।

ক্ষুদ্র জীবন উঠলো মেতে

সেই প্রথম এককোষী জীব

পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষের কথা থেকে আমরা চলে গিয়েছিলাম সেই প্রাণ কীভাবে পরবর্তী প্রায় চারশত কোটি বছর ধরে বিবর্তিত হলো সেই প্রক্রিয়ার কথায়। বিবর্তনকে বুঝতে গিয়ে আমরা প্রাণের পুরো ইতিহাসের নানা জায়গা থেকে উদাহরণ নিয়েছি। এবার আবার গোড়াতে ফিরে গিয়ে সেই প্রথম এককোষী জীব থেকে ধারাবাহিক ভাবে শুরু করার পালা।

কোন রকমে জীবের ন্যূনতম বৈশিষ্টগুলো নিয়ে শুরু হয়েছিলো প্রথম জীবের– প্রতিলিপি হবার মত আর এন এ, আবার তাকে দিয়েই প্রোটিনের কাজ, এবং কোষ ঝিল্লির মাধ্যমে কোষ গঠন। সেই সঙ্গে সে মুহূর্ত থেকে তার মধ্যে দেখা গিয়েছিলো বিবর্তন সম্ভাবনা। ঐ ভাবে গঠিত একেবারে আদি প্রথম কোষগুলোর মধ্যেও যে বৈচিত্রগুলো ছিল তাদের সুযোগ নিয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনে ধীরে ধীরে এসেছিল পরবর্তী পদক্ষেপগুলো। আমরা দেখেছি শুধু আর এন এর বদলে ডি এন এ আনার কী সুবিধা ছিল। তা ছাড়া শুধু আর এন এর উপর নির্ভর না করে ধীরে ধীরে নানা রকম প্রোটিন, বিশেষ করে এনজাইমরূপী প্রোটিনের উপর কোষ গঠন সহ নানা কাজের দায়িত্ব দেয়ারও সঙ্গত কারণ ছিল বিবর্তনের পক্ষে। তাই অতি ধীরে আমাদের পরিচিত ব্যাকটেরিয়া জাতীয় এককোষী ক্ষুদ্র জীবের উদ্ভব হয়েছিল যাদের কিছু কিছু আজকে তাদের উত্তরসূরি ব্যাকটেরিয়া থেকে খুব ভিন্ন নয়।

কিন্তু বিবর্তনের পথে এগুতে গিয়ে একেবারে আদি জীবকোষগুলোকেও যে কাজটি তখুনি করতে হয়েছে তা হলো বংশবৃদ্ধি ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে নিজের ঐ আদি জেনেটিক বার্তাটির প্রতিলিপি সমান ভাবে দিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা। এককোষী সেই জীবের বংশ বৃদ্ধি ঘটেছে কোষের বিভাজনের মাধ্যমে - অর্থাৎ একটি কোষ দুই ভাগ হয়ে দুইটি হয়ে গিয়ে এখনো জীবকোষ মাত্রই এভাবেই আরো জীবকোষ সৃষ্টি করে। কোষ বিভাজন কেন হয়? প্রথম জীবকোষই বা কেন বিভাজিত হয়ে বংশবৃদ্ধির দিকে এগিয়েছিলো? এর উত্তর হলো কোষের ভেতর প্রতিলিপিকারক (প্রথম যুগে যা আর এন এ), বিরোজাইম ইত্যাদি



ব্যাকটেরিয়ার বিভাজন

প্রতিলিপি হবার মাধ্যমে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোষ ঝিল্লির সঙ্গেও বাড়তি অংশ যোগ হয়ে কোষ বড় হয়েছে। এভাবে কোষের ভেতরের জিনিস ও ঝিল্লির পরিমাণ দ্বিগুণ হলে কোষের পৃষ্ঠদেশও দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু কোষের মত কোন জিনিসের তলের (সারফেস) ক্ষেত্রফল দ্বিগুণ হলে ভেতরের আয়তন (ভল্যুম) বাড়বে দ্বিগুণের বেশি। যেহেতু দ্বিগুণের বেশি আয়তনে শুধু দ্বিগুণ জিনিস রয়েছে, ফলে এবার কোষের আর টান টান ভাবটি থাকবেনা বরং এটি কুঁচকে যাবে, যার ফলে কোষ ঝিল্লি ঢিলে হয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যেতে চাইবে। কম্পিউটার সিম্যুলেশনে এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

বিবর্তিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোষের ভেতর প্রতিলিপিকারকদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা হয়েছে। কোষের সঙ্গে কোষেরও প্রতিযোগিতা হয়েছে। যে কোষে প্রতিলিপিকারক দ্রুততর প্রতিলিপি তৈরি করতে পেরেছে, বিভাজিত হয়ে বংশবৃদ্ধির গতিও তার বেড়েছে। ফলে সংখ্যা বৃদ্ধিতে সেগুলোর প্রাধান্য লাভের সুযোগ বেশি ছিল। কোষ বিভাজনে প্রতিলিপিগুলোরও যথাসম্ভব সমান ভাবে বিভক্ত হওয়াটি বংশ বিস্তারের দিক থেকে জরুরী। কম্পিউটার সিম্যুলেশনে দেখা গেছে যে খুব সরল ক্ষেত্রে কোষে প্রতিলিপিকারকের (আরএনএ বা ডিএনএর) বৈচিত্র যদি মাত্র কয়েক রকম হয়, এবং তাদের মধ্যে যদি সম্পর্কটি সহযোগিতামূলক হয় অর্থাৎ একটি যদি অন্যটির জন্য প্রতিলিপি করতে পারার অনুকূল পরিস্থিতিটি সৃষ্টি করে, তা হলে এরা বিভক্ত সবগুলো কোষে বজায় থাকতে পারে। কিন্তু যদি প্রতিলিপিকারকের বৈচিত্র অনেক হয় তা হলে এদের কোন কোনটির বিভাজিত দুই কোষে একেবারে না যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সে ক্ষেত্রে কিছু প্রজন্মের পর সিষ্টেমটি ধসে পড়তে পারে। সরল কোষের জন্য তাই প্রতিলিপিকারকগুলো কোষের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে থাকলেই চলে, কিন্তু জটিলতর কোষের ক্ষেত্রে চলে না। এজন্যই পরে জটিলতর কোষে ক্রোমোজোমের আগমন ঘটেছে। এতে সব প্রতিলিপিকারক এক বা একাধিক বান্ডিলে সন্নিবিষ্টি হয়েছে সূতা যে ভাবে কাঠিতে জড়িয়ে রাখা হয় অনেকটা সেভাবে। এই ব্যবস্থায় পুরো বান্ডিলের অর্থাৎ ক্রোমোজোমের প্রতিলিপি এক সঙ্গে তৈরি হয় কোষে। বিভাজিত হবার সময় সব কোষেই

ক্রোমোজোমের পুরো প্রতিলিপি যায়। ফলে বহু রকমের প্রতিলিপিকারক (জিন) এতে থাকলেও বিভাজিত হবার সময় কোনটি হারিয়ে যেতে পারেনা।

যখন জীব জগত মানে ব্যাকটেরিয়া জগত

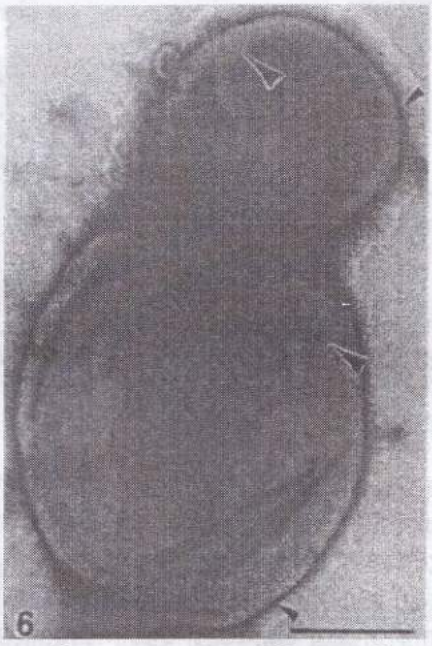
প্রাণের অর্ধেকটা বয়সে পৃথিবীতে ছিল শুধুই সরল ব্যাকটেরিয়া। এমনি ভাবেই কেটেছে দুই শত কোটি বছরের বেশি সময়। এরকম সরল এক-কোষী জীবকে বলা হয় প্রোকারিয়েট। আজও জীবজগতের একটি বড় অংশ এই ব্যাকটেরিয়া– প্রোকারিয়োট। আজকের তাদের মধ্যে একেবারে প্রথম দিককার ব্যাকটেরিয়ার সদৃশ উত্তরসূরিরাও রয়ে গেছে। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের দেহে যত ব্যাকটেরিয়া আছে তার সংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। বিভক্ত হয়ে অথবা নিজের দেহ থেকে একটি ক্ষুদ্রতর অংশকে



ষ্ট্রোমাটো লাইটে নূতন নূতন স্তরে বের হয়ে এসেছে

বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে (বাডিং) এসব এককোষী জীব বংশ বৃদ্ধি করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রুত মিনিটে একবার করে এরকম বংশবৃদ্ধি ঘটতে পারে, অনেকগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্য বংশবৃদ্ধির গতি অপেক্ষাকৃত ধীর। তবুও গড়পড়তা ১০ বছরে এদের এক লক্ষ প্রজন্ম পার হয়ে যেতে পারে!

কোষের দেয়ালের রাসায়নিক গঠনের বিচারে সেই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়- একটিকে বলা হয় আর্কিয়া, মানে প্রাচীন ধাঁচের, আর অন্য দলে সাধারণ সর্বত্র লভ্য নানা ব্যাকটেরিয়া। আর্কিয়ার আবার দুটি ভাগ রয়েছে। একটিকে এখন দেখা যায় সালফার সমৃদ্ধ উত্তপ্ত প্রস্রবণের মধ্যে যেমন আমেরিকার বিখ্যাত ইয়েলোষ্টোন পার্কে। এরকম চরম পরিবেশের উপযুক্ত ব্যাকটেরিয়াই হয়তো একেবারে আদিযুগের ব্যাকটেরিয়ার বর্তমান প্রতিনিধি। অন্য ধরনের আর্কিয়া অক্সিজেনমুক্ত অঞ্চলে কার্বন-ডাই- অক্সাইড, হাইড্রোজেন, মিথেন প্রধান পরিবেশে থাকে- যেমন এঁদো ডোবা বা



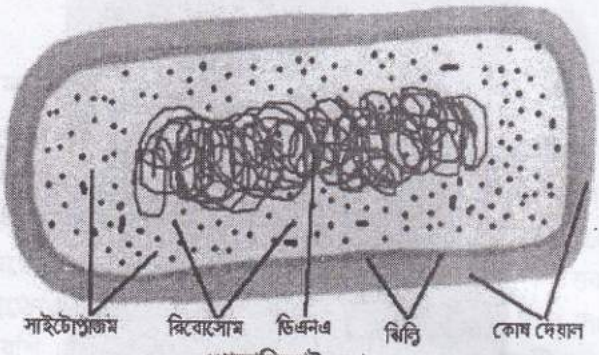
বাডিং এর মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া বংশবৃদ্ধি

সুইয়ারেজের ভেতর। আর সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে বহু রকমের প্রকারভেদ রয়েছে– অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশ, অক্সিজেনমুক্ত পরিবেশ, উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহ ইত্যাদি নানা পরিস্থিতির উপযুক্ত প্রকারে এদের পাওয়া যায়।

ষ্ট্রোমাটোলাইট শিলায় ব্যাকটেরিয়া

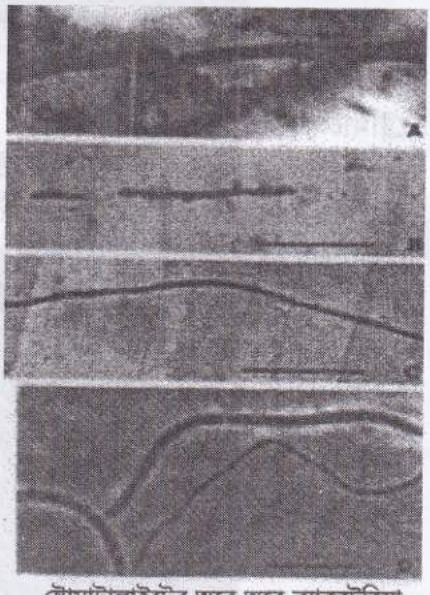
এর আগে আমরা প্রাণের সঙ্গে পৃথিবীর গোড়া থেকেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলেছি। এটি চমৎকার দেখা যায় ষ্ট্রোমাটালাইট নামে পরিচিত শিলার মধ্যে। জীব মাত্রই এক


ষ্ট্রমাটোলাইটের সমারোহে নীল সবুজ ব্যাকটেরিয়া
বাতাসে অক্সিজেন এনেছে



প্রোকারিয়োট কোষ

সঙ্গে পরস্পর নির্ভরতার মধ্যে একটি ইকোসিস্টেম বা জীব-পরিবেশ রচনা করে বাস করে। শুরু থেকেই ব্যাকটেরিয়া এভাবে একত্র বাস করে আসছে। শিগ্‌গির এক সময় তাদের পরস্পরের মধ্যে জিন বিনিময়ের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। ঐ ব্যাকটেরিয়ারা নিজ দেহ থেকে কিছু ডিএনএ প্রতিবেশি ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে বিনিময় করেছে। সুদূর অতীতে কিছু ব্যাকটেরিয়ার এমনিতরো ইকোসিস্টেম গড়ে উঠেছিল ষ্ট্রোমাটালাইট শিলাকে আশ্রয় করে। এটি এক রকম আদি পাললিক শিলা যা অগভীর সমুদ্রে পাতলা পরতে পরতে সৃষ্টি হয়েছে এবং তার অবয়বের একটি বড় অংশ ব্যাকটেরিয়ার দেহাবশেষ নিয়ে। ৩৫০ কোটি বছরের পুরানো এরকম শিলা কোন কোন জায়গায় এখনো টিকে রয়েছে সেদিনের ব্যাকটেরিয়া ফসিলকে ধারণ করে। সমুদ্রের সী-আর্চন জাতীয় প্রাণি সাধারণত এর ক্ষতি করে। কিন্তু পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া, সিনাইএর কাছে লোহিত সাগরের তীরে সমুদ্রের লবণাক্ততা এত বেশি যে সেখানে ওরকম ক্ষতিকর প্রাণি বাঁচতে পারেনা- তাই এখানে অগভীর তটে অনেক ষ্ট্রোমাটোলাইট দেখা যায়।

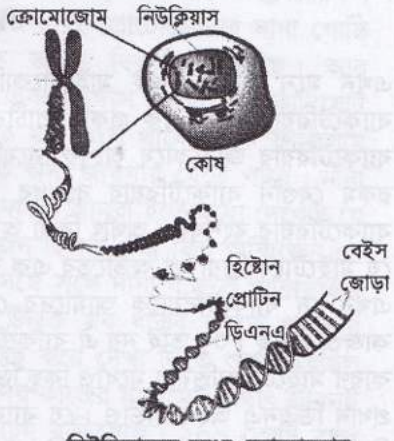

ষ্ট্রোমাটালাইটের স্তরে স্তরে ব্যাকটেরিয়া
(অনুবীক্ষণে দেখা ছবি)

ষ্ট্রোমাটালাইট যে রকম প্রাচীন ব্যাকটেরিয়ার আশ্রয় হয়েছিল তেমনি তার পাতলা স্তরগুলোও অনেকাংশে ব্যাকটেরিয়ার কাজের দ্বারাই সৃষ্ট। এদের মধ্যে শিলায় সবার উপরে যে ধরনের ব্যাকটেরিয়া ছিল তারা হলো নীলসবুজ ব্যাকটেরিয়া। আজকের উদ্ভিদের মত ক্লোরোফিল জাতীয় জিনিসে সমৃদ্ধ এই ব্যাকটেরিয়া সূর্যের আলোতে সালোক সংশ্লেষণে খাদ্য তৈরি করতে পারতো এবং

এভাবে অক্সিজেনও তৈরি করতো। সূর্যের কিছু আলো এরও নিচের স্তরগুলোতে পৌঁছতে পারতো, তবে শুধু সেই তরঙ্গ-দৈর্ঘের আলো যেগুলো নীলসবুজ ব্যাকটেরিয়ার ক্লোরোফিলে শোষিত হয়নি। এই আলো ব্যবহার করতে পারতো অন্য আর একরকম ব্যাকটেরিয়া– বেগুনি ব্যাকটেরিয়া, তাদের অন্য রকম ক্লোরোফিলের মাধ্যমে। এর ফলে অবশ্য অক্সিজেন তৈরি হতোনা বলে এরা আর্কিয়া শ্রেণির ব্যাকটেরিয়া। তারও নিচে থাকতো অন্য রকম ব্যাকটেরিয়া যারা খাবারের জন্য উপরের স্তরের ব্যাকটেরিয়াগুলোর মৃতদেহের উপর নির্ভর করতো। ষ্ট্রোমাটোলাইটের উপরের স্তরগুলো ওখানকার ব্যাকটেরিয়ার কারণে চটচটে হয়ে পড়লে তাতে চূণা পাথর ইত্যাদি খনিজের কণা আটকিয়ে ঐ স্তরগুলো অস্বচ্ছ হয়ে পড়তো। এ কারণে নিচের ব্যাকটেরিয়াগুলো শিলার পাশ থেকে খুবই পাতলা আরো স্তর তৈরি করেছে আলো পাওয়ার জন্য– পাতলা কাগজের মতই ফিনফিনে শত শত স্তর। আজ আমরা ষ্ট্রোমাটালাইটকে এভাবেই পাতলা অনেক স্তরে অতি প্রাচীন এককোষী প্রাণির ফসিলে সমৃদ্ধ অবস্থায় পাচ্ছি।

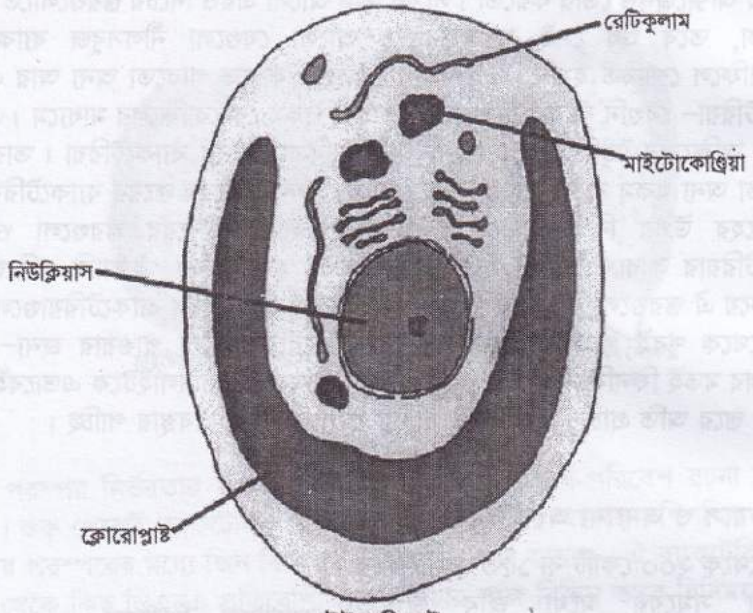
নিউক্লিয়াস ও অন্যান্য অংশ সমৃদ্ধ জীব কোষ

এখন থেকে ২০০ কোটি বা ১৫০ কোটি বছর আগের সময়ের মধ্যে জীব জগতে ব্যাকটেরিয়ার একচেটিয়াত্ব শেষ হয়ে এসেছিল একটি নূতন ধরনের উন্নয়ন। প্রোকারিয়োটের থেকে উদ্ভূত হয়েছিল ইউকারিয়োটের, ব্যাকটেরিয়া ছাড়া আজকের প্রায় সব জীব যেই গোষ্ঠির অন্তর্গত। এর বড় বৈশিষ্ট হলো এর জীবকোষ আর অতটা সরল থাকেনি। কোষের মধ্যে আর একটি ঝিল্লিঘেরা অংশ সৃষ্টি হয়েছিল যাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস। ডি এন এর স্থান হয়েছে ওখানেই। শুধু তাই নয় ঐ ডিএনএ এবং কিছু প্রোটিনের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ক্রোমোজোম– জীবের নীলনক্সা ধারণকারী সব জিনগুলোর ডিএনএ-কে একই সূত্রে একত্রে বান্ডিল করে রাখা এক একটি ক্রোমোজোম।



নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রোমোজোম,

তাছাড়া আরো পরিবর্তন আসলো জীবকোষে। এদের কোন কোনটিতে মাইটোকোন্ড্রিয়া নামে ছোট ছোট অংশ যোগ হলো যেখানে সরল জৈব পদার্থের অক্সিডেশনের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হলো। ফলে অন্য কোন শক্তি উৎসের উপর নির্ভর না করে এরা খাদ্য থেকে নিজেরা শক্তি তৈরি করে নিতে পারলো। আর অন্য এক ধরনের ইউকারিয়োট কোষে যোগ হলো ক্লোরোপ্লাষ্ট নামে আলোক সংবেদি অংশ যারা সালোক সংশ্লেষণে সক্ষম হলো। বলা বাহল্য প্রথম শ্রেণীর জীবগুলোই আজকের প্রাণি জগতের পূর্বসূরি, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবগুলো আজকের উদ্ভিদ জগতের পূর্বসূরি। বিজ্ঞানীরা

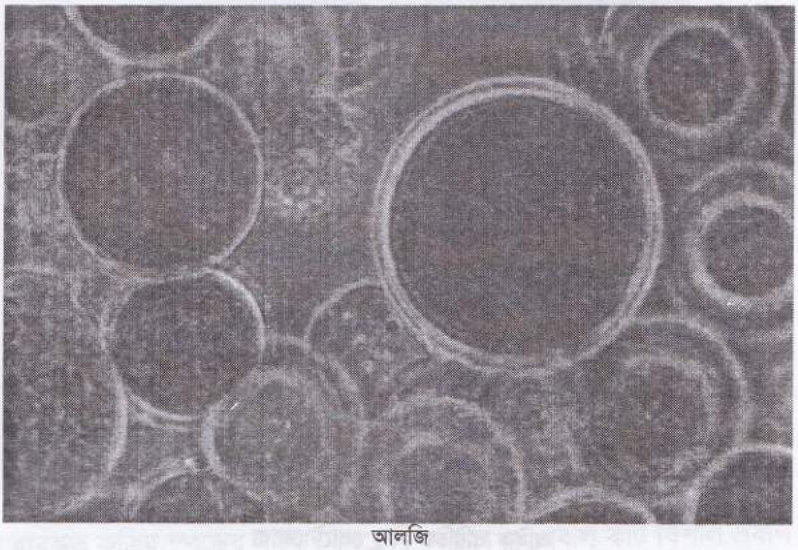


ইউকারিয়োট

এখন মনে করছেন এই মাইটোকোন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাষ্টগুলো আসলে নিজেরাই ব্যাকটেরিয়া ছিল– এক প্রকার প্রাচীন আর্কিয়া, যারা সাধারণ দলের এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার জীবকোষে আশ্রয় নিয়েছিল। এদের মধ্যে মাইটোকোনড্রিয়া ছিল এক রকম বেগুনি ব্যাকটেরিয়ার বংশধর, আর ক্লোরোপ্লাষ্ট ছিল এক ধরনের নীলসবুজ ব্যাকটেরিয়ার বংশধর। অর্থাৎ কিনা আমাদের কোষ সহ আজকের সকল প্রাণির কোষে যে মাইটোকোন্ড্রিয়া তা অতীতের এক রকম আশ্রিত ব্যাকটেরিয়া বই কিছু নয়। আমরা এখন সে ব্যাকটেরিয়াকে আমাদের দেহ-কোষের অংশ করে নিয়েছি, যা গুরুত্বপূর্ণ কাজও করছে। শুধু তাই নয় ঐ ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএও এখন আমাদের কোষে রয়েছে, কারণ মাইটোকোন্ড্রিয়ার মধ্যেও কিছু ডিএনএ রয়েছে, নিউক্লিয়াসে থাকা ক্রোমোজোমের প্রধান ডিএনএ অংশ ছাড়াও। যে ব্যাকটেরিয়া আশ্রয় নিয়েছিল সে পেয়েছে আশ্রয় ও নিরাপত্তা, আর যে আশ্রয় দিয়েছিল সে পেয়েছে শক্তি উৎপাদনের উপায়– এটি ছিল উভয়ের জন্য সুবিধাজনক একটি সহযোগিতা। এর থেকে আর এক ধাপ এগিয়ে বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন আমাদের ক্রোমোজোমের ডিএনএতেও অনেকখানি জুড়ে বর্তমানে অব্যবহৃত ও অস্বাভাবিক ডিএনএ রয়েছে যা আসলে অতীতে আমাদের কোষে আসা অন্যান্য কিছু পরাশ্রয়ী ব্যাকটেরিয়া অথবা ভাইরাসের অবদান হতে পারে।

এককোষী আলজি ও প্রোটোজোয়া, এবং অন্যান্য

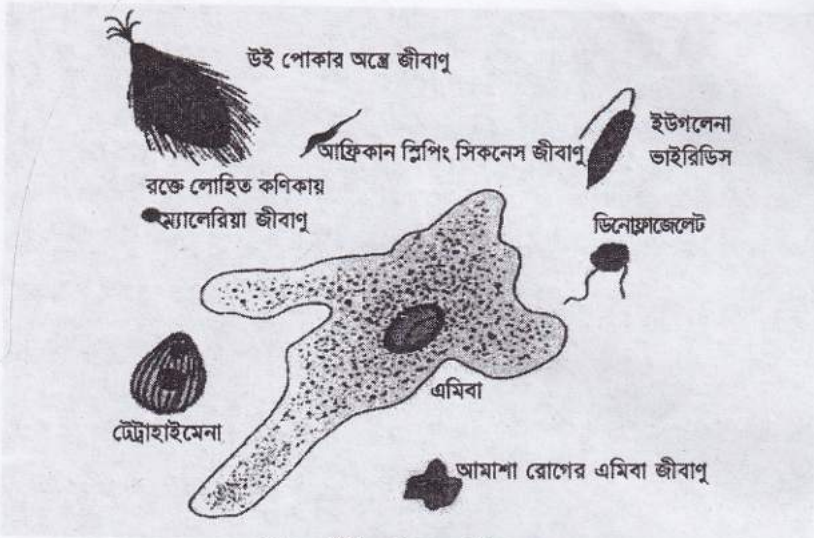
প্রথম ইউকারিয়োটগুলো নিজেরাও ছিল এককোষী, ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে তিন থেকে দশগুণের মত বড় হলেও এরাও বেশ ক্ষুদ্র। সার্বিক ভাবে এদের বলা হয় প্রোটিষ্ট।



আলজি

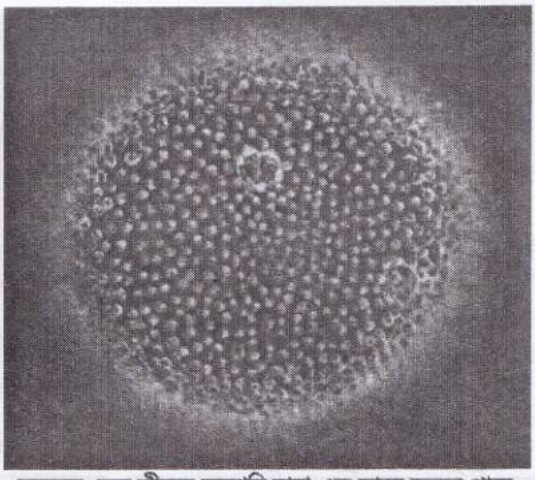
এদের দুটি প্রকার- যাদের ক্লোরোফিল আছে, তারা আলজি, আর যাদের ক্লোরোফিল নেই তারা প্রোটোজোয়া। ব্যাকটেরিয়ার মত আলজি এবং প্রোটোজোয়ার নানা গোষ্ঠি এখনো আছে। আলাজির থেকেই পরে উদ্ভিদ জগত বিকশিত হয়েছে। আর প্রোটোজোয়া থেকে বিকশিত হয়েছে প্রাণি জগত এবং ফাঙ্গাস জগত। প্রোকারিয়োট ব্যাকটেরিয়ার অনেকগুলোতে কোষের সঙ্গে লেজের মত অংশ থাকে যাকে ফ্লাজিলাম বলা হয়। এটি নেড়ে চেড়ে এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে। নানা রকম ফ্লাজিলাম বিবর্তিত হয়েছে বহু প্রোটিষ্টদের মধ্যেও। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে একেবারে আদিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেন ছিলনা। যা কিছু অক্সিজেন সে সময় পানির বিশ্লেষণ ইত্যাদিতে তৈরি হরেছে তা সঙ্গে সঙ্গে নানা ধাতুকে অক্সিডাইজ করে বাঁধা পড়েছে। যথেষ্ট অক্সিজেন তৈরি হয়ে উন্মুক্ত সব ধাতব বস্তুকে পুরাপুরি অক্সিডাইজ করে বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেন কিছু কিছু করে দেখা দিতে শুরু করেছিল সালোক সংশ্লেষণকারী নীলসবুজ ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদির কাজের মাধ্যমে। অর্থাৎ জীবনই বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন এনেছে এবং ক্রমাগত এর প্রাচুর্য বাড়িয়েছে। ২০০ কোটি বছর আগের কালে এসে এই প্রাচুর্য প্রচুর বেড়েছিল এবং তখন প্রোটিষ্টের জগতেও একটি সমারোহ এসেছে। ১৭০ কোটি বছর আগের ক্ষুদ্র প্রোটিষ্ট ফসিল আবিস্কৃত হয়েছে। ১০০ কোটি বছর আগে থেকে প্রোটিষ্ট ফসিলে প্রচুর বৈচিত্র দেখা গেছে– নানা ধরনের আলজি আর নানা ধরনের প্রোটোজোয়া। এ সময় প্রোটিষ্ট জগতে কোন কোন এককোষীরা বেশ কিছু বড় হয়েও উঠেছে। এক মিলিমিটারের কয়েক ভাগের এক ভাগ আয়তনের প্রোটিষ্ট ফসিল যথেষ্ট পাওয়া গেছে– এমনকি উর্ধ্ব সীমায় কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত বড় এক-কোষী এই জীব। এ সব ফসিলের কোন কোনটির কোষ-দেয়াল বেশ পুরু এবং সৌকর্যময়, কাঁটা ইত্যাদিতে সুসজ্জিত। মনে হয় অন্যান্য শিকারি প্রোটিষ্টদের থেকে আত্মরক্ষার্থেই এদের এই ব্যবস্থা।

এককোষী প্রোটিষ্টের বড় হওয়াটাও আত্মরক্ষার দিক থেকে এবং অন্যকে আক্রমণ করে



অধিক পরিচিত কিছু প্রোটোজোয়া

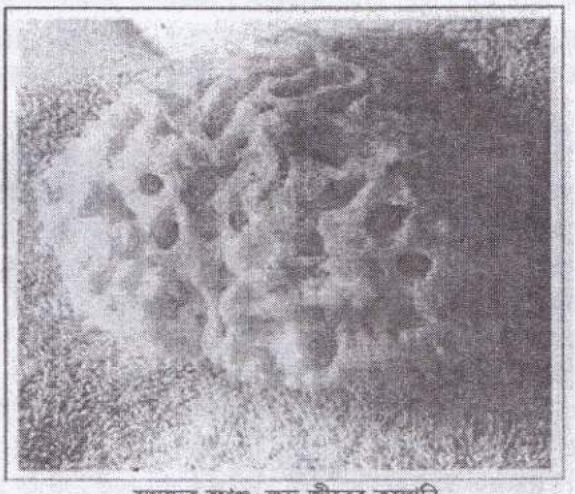
গিলে ফেলার দিক থেকে সুবিধাজনক- তাই বড় হবার দিকে বিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু একটি কোষের বেশি বড় হওয়ার আবার অসুবিধাও আছে, তাই প্রোটিষ্টগুলোর বড় হবার একটি ঊর্ধ্ব সীমা আছে। একটি কোষকে তার ভেতরে সব কার্যক্রম সুশৃঙ্খল ভাবে চালাতে হলে এর সব অংশের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখতে হয়, কারণ যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে এর উপাদানগুলো কাজ করে তা এরকম যোগাযোগের উপর নির্ভরশীল। কোষ বেশি বড় হয়ে গেলে তার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ধীর হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর দক্ষতা কমে যায়। কাজেই বিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচন কোষকে মোটামুটি ছোট আকারেই রেখে দেয়ার পক্ষে গেছে। একদিকে কোষকে ছোট রাখতে হচ্ছে, অন্যদিকে প্রতিযোগিতায় প্রাধান্য পাওয়ার জন্য দেহগতভাবে বড় হওয়াও দরকার, এই দোটানার একটি সমাধান হয়েছে এককোষী জীব একা না থেকে অনেকগুলো কোষের একটি সংঘবদ্ধ কলোনিই কার্যত একক একটি জীব হিসেবে আচরণ করা। কলোনির সব সদস্য সংঘবদ্ধ ভাবে একটি জীবের মত সব কাজ করতে পারে– নড়াচড়া, খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা ইত্যাদি। ফলে তারা কোষ ছোট রেখেই বড় হবার সুবিধাগুলো পেয়েছে। সেই প্রাচীন কৌশল এখনো অনেক ক্ষেত্রে বজায় রয়েছে। এর একটি খুব চমকপ্রদ উদাহরণ হলো ভলভক্স নামক ছোট জীব কলোনি। এতে অনেকগুলো ক্ষুদ্র এককোষী পরস্পর সংলগ্ন হয়ে প্রায় এক মিলিমিটার ব্যাসের একটি ফাঁপা গোলক গঠন করে। কোষগুলো গোলকের দেয়াল গড়ে তোলে। তাদের প্রত্যেকের ফ্ল্যাজিলাম লেজ রয়েছে এবং তা গোলকের বাইরের দিকে থাকে। ঐ লেজ সবাই এক সঙ্গে এমন সমলয়ে নাড়ে যে তাতে পুরো গোলকটিই একই দিকে দক্ষতার সঙ্গে চলাফেরা করতে পারে। তার মানে কলোনির সব সদস্যের এসব বিষয়ে একটি দারুণ বোঝাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিচিত সামুদ্রিক স্পঞ্জ এমনি একটি প্রোটিষ্ট কলোনি বই নয়। এটি নরোম, নমনীয়, বড় সাইজের কলোনি আমাদের



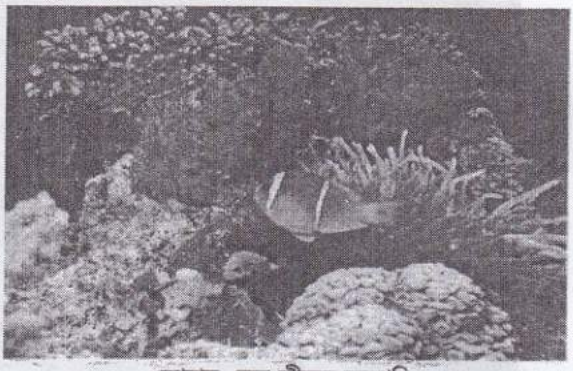
ভলভক্স: ক্ষুদ্র জীবের কলোনি যারা এক তালে চলতে পারে

নিত্য ব্যবহৃত কৃত্রিম স্পঞ্জের মতই দেখতে। তাছাড়া যে প্রবাল কীট বিশাল প্রবাল দ্বীপ, প্রাচীর ইত্যাদি গড়ে তোলে, তাও ক্ষুদ্র জীবের যৌথ বিশাল কলোনি ছাড়া কিছু নয়। এমনকি জেলিফিশের দেহের বিবর্তন ঘটেছে এরকম কলোনি থেকেই।

তবে কলোনি গঠনই উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের একমাত্র সমাধান নয়। কলোনি সম্মিলিতভাবে কাজ করে কার্যত একটি জীব হিসেবে আচরণ করে বটে, তবে আরো ভাল হয় যদি এককোষী জীবের কোষগুলো একটি বহুকোষী জীবে পরিণত হয়ে তাতে একাকার হয়ে যায়। এই সমাধানটি বহুকোষী জটিলতর জীব সৃষ্টির সুযোগ করে দিয়ে জীবজগতে বহু সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে, যার ধারাবাহিকতায় আমরাও এসেছি। অন্যরা যা পারেনি, কলোনির দ্বারাও যা সম্ভব নয়, তা সম্ভব হয়েছে নানা বিচিত্র রূপে বিবর্তিত



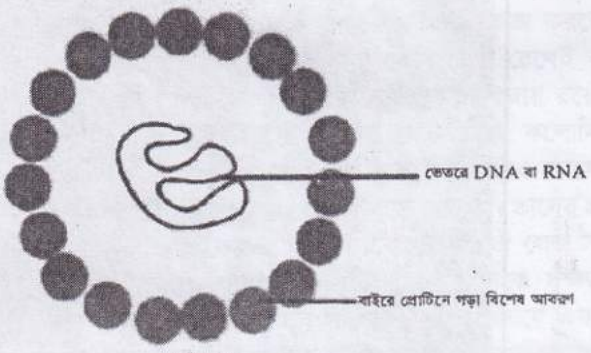
সমুদ্রের স্পঞ্জ: ক্ষুদ্র জীবের কলোনি



কোরাল: ক্ষুদ্র জীবের কলোনি

বহুকোষী জীবের মাধ্যমে। এখানে সব কোষ এক দেহ গঠন করে একটি শৃঙ্খলার অধীনে এসেছে, ঐ দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিশেষ বিশেষ কাজে এ কোষগুলো বিশেষায়িত হয়েছে এবং সম্মিলিত ভাবে বিবর্তিত হয়েছে। কালক্রমে কোন কোন কোষ হয়েছে পেশির, কোন কোনটি স্নায়ুর, কোন কোনটি চামড়ার, ইত্যাদি। ফলে এখন থেকে বিবর্তনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের লক্ষ্যবস্তু আলাদা আলাদা ভাবে কোষগুলো থাকেনি বা তার ভেতরের জিনগুলো থাকেনি। অনেক কোষে গড়া পুরো দেহাবয়বে পুরো জীবটিই হয়েছে নির্বাচনের লক্ষ্যবস্তু। পুরো দেহ নিয়ে তার সাফল্যই সব কোষের সাফল্য, তার টিকে থাকাই সব কোষের টিকে থাকা, তার মৃত্যুই সব কোষের মৃত্যু, এবং তার বংশধরই সব কোষের বংশধর।

ব্যাকটেরিয়া, প্রোটিষ্ট, এবং তারপর বহুকোষী জটিলতর জীব– উদ্ভিদ, প্রাণি, ফাঙ্গাস ইত্যাদি– তাদেরকে নিয়েই সেদিনের এবং আজকের জীবজগত। তবে এর মধ্যে আমাদের অতি আলোচিত আরো কেউ সুদূর অতীত থেকে রয়েছে যারা কখনো জীব, আবার কখনো জীব নয়। এরা হলো ভাইরাস। ভাইরাসে প্রতিলিপি হবার মত ডিএনএ আছে (অথবা আর এনএ), কিছু প্রোটিনও আছে। এর গঠন খুবই সরল– প্রধানত প্রোটিনের একটি আবরণের (কোট) ভেতর নিজের বৈশিষ্টগুলোর নীলনক্সা-বাহী



ভাইরাস

জেনোম। আসলে এটি নেহাতই জেনোম সর্বস্ব– নীলনক্সাটির অতিরিক্ত তেমন কিছু তার কোষে নাই। ফলে নিজে নিজে বাইরে যখন থাকে তখন ভাইরাসে জীবনের কোন লক্ষণ নাই- নেহাৎ একটি জড় কণিকার মত। নিজ থেকে শক্তি উৎপাদন এবং নিজের জেনোমের বার্তা অনুযায়ী প্রোটিন তৈরির ব্যবস্থা তার নাই। কিন্তু এই ভাইরাস যখন কোন জীবের কোষকে আক্রান্ত করে তখন ঐ কোষের প্রোটিন তৈরির যে ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ এটি নিয়ে নেয়। ঐ ব্যবস্থাকে ভাইরাস কাজে লাগায় নিজের জেনোমের ও নিজের কোষের অনেক প্রতিলিপি তৈরির কাজে। আক্রান্ত জীবকোষের নিজস্ব জেনোমকে সে ধ্বংস করে দেয় এবং কার্যত সে সেটিকে নিজের প্রতিলিপি তৈরির কারখানায় পরিণত করে। পরে ঐ জীবকোষ বিদীর্ণ করে মূল ভাইরাসের অসংখ্য হুবহু কপি বের হয়ে আসে, যারা অন্যান্য কোষকে আক্রমণ করে। এভাবে শুধু অন্য জীবকোষেই ভাইরাস নিজের জীবন্ত সত্ত্বা প্রকাশ করতে পারে।

বংশ বৃদ্ধির উন্নততর ব্যবস্থা: যৌন প্রজনন

ইউকারিয়োট বিবর্তিত হওয়াতে একটি বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসলো জীবকোষ বিভাজিত হয়ে নূতন জীবকোষ সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যে। আগেই এরকম জীবকোষে ক্রোমোজোমের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। প্রোটিনে গড়া কাঠামোর উপর এখানে দীর্ঘ ডিএনএ সূত্র বান্ডিল করা থাকে। এতে দুটি বড় বড় সুবিধা হয়ে যায়। একটি সুবিধা হলো সব জিন এক সঙ্গে প্রতিলিপি হতে পারে। দ্বিতীয় সুবিধাটি হলো কোষ বিভাজনের সময় সব জিনের কপি নূতন দুটি কোষের প্রত্যেকটির ভাগে যাওয়াটি এটি নিশ্চিত হয়। এজন্য মাইটোসিস নামে কোষ বিভাজনের যে নূতন উন্নত রূপটি দেখা দিলো সেটি রীতিমত অনন্য। এতে ক্রোমোজোমগুলোর প্রতিলিপি তৈরি হয়ে এদের এক সেট কোষের এই প্রান্তে এবং অন্য সেট তার বিপরীত প্রান্তে চলে যায়। এরপর কোষটি মাঝখানে বিভক্ত হয়, ফলে প্রত্যেক ভাগে পূর্বের মত হুবহু একই ক্রোমোজোম এক সেট করে চলে যায়।

আরো বৈপ্লবিক অন্য পরিবর্তন ঘটেছে যৌন প্রজননের প্রচলন হওয়ার মাধ্যমে। এতে করে বিবর্তনের ক্ষেত্রে কী ভাবে জোয়ার আসতে পেরেছে তা আমরা দেখেছি। যৌন প্রজনন অনেক রকম বৈচিত্র সৃষ্টির এবং অনেক রকম সম্ভাবনা সৃষ্টির সুযোগ করে দিয়েছে। জীবের ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে যে জীব বিবর্তনের এত বৈচিত্র, এত সাফল্য সম্ভব হয়েছে তা প্রধানত যৌন প্রজননের এই দারুণ কৌশলটির বদৌলতে। এক্ষেত্রে বহুকোষী জীবে কিছু কোষ শুধু প্রজনন কাজের জন্য বিশেষায়িত হলো– জনন কোষ রূপে। পুরুষ-জীবের ক্ষেত্রে এরা শুক্র কোষ এবং স্ত্রী-জীবের ক্ষেত্রে এরা ডিম্বকোষ। নূতন জীব সৃষ্টি হয় যৌন মিলনের ফলে একটি শুক্র কোষ আর একটি ডিম্ব কোষ যখন সংযুক্ত হয়ে সন্তানের প্রথম কোষটি গঠন করে। এখানে দুটি জনন কোষের জেনোম একত্রিত হয়। অন্য কোষের থেকে জনন কোষের পার্থক্য হলো অন্য কোষে যেখানে বাবা ও মা থেকে পাওয়া একই ক্রোমোজোমের দুটি করে সেট আছে (অবশ্য প্রত্যেকটির জেনেটিক বৈশিষ্টে যথেষ্ট ভিন্নতা নিয়ে), সেখানে জনন কোষে মাত্র এক সেট করে ক্রোমোজোম থাকে। শুক্র কোষের সেই এক সেট ও ডিম্ব কোষের সেই এক সেট

একত্রিত হয়ে সন্তানের প্রথম কোষে আবার যথারীতি দুই সেট হয়ে যায়। ফলে তখন তা আর জনন কোষ থাকেনা, সাধারণ কোষ হয়ে যায়।

দেহের সাধারণ কোষ থেকে মাত্র এক সেট ক্রোমোজোম বিশিষ্ট জনন কোষ কী ভাবে সৃষ্টি হয় সেটিও বেশ চমকপ্রদ ব্যাপার। মেইয়োসিস নামের এই প্রক্রিয়াটির সাক্ষাৎ আমরা ইতোমধ্যে পেয়েছি, বিবর্তনের বৈচিত্র সৃষ্টির আলোচনায়। এটি হতে গিয়ে বৈচিত্রের কত অসংখ্য মিশ্রণ সম্ভাবনা বিবর্তনকে নানা দিকে প্রবাহিত করার সুযোগ করে দিয়েছে সেটি রীতিমত বিস্ময়কর।

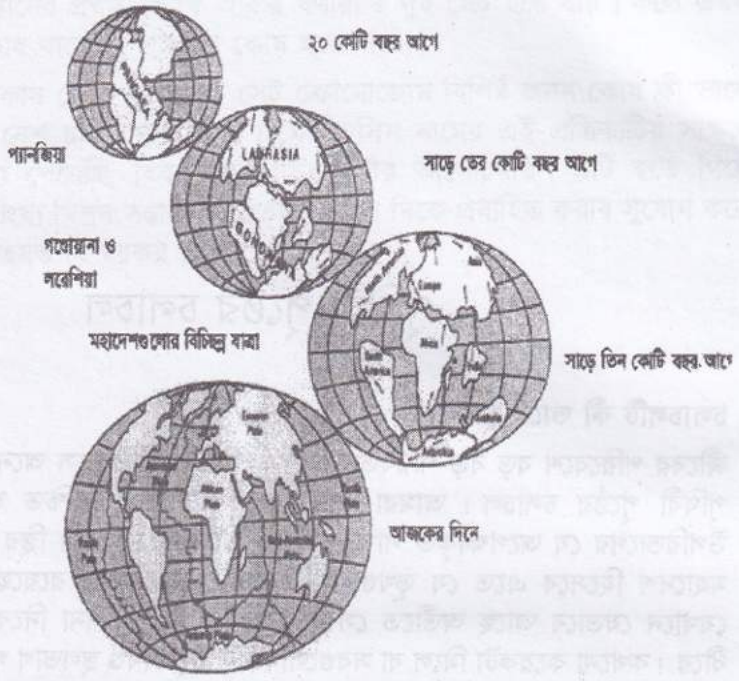
পৃথিবী পৃষ্ঠের চলাচল

চলাচলটি কী ভাবে বুঝা গেল

জীবের পরিবেশে বড় বড় পরিবর্তন এনে বিবর্তনের ইতিহাসে অনেক অবদান রেখেছে পৃথিবী পৃষ্ঠের চলাচল। আমরা বেশ কিছু বছর ধরে নিশ্চিত হয়েছি যে পৃথিবীর উপরিভাগের যে অপেক্ষাকৃত পাতলা ভূত্বক তা এক জায়গায় স্থির নাই। বিশেষ করে মহাদেশ হিসেবে এতে যে ভূখণ্ডগুলো সমুদ্র থেকে জেগে রয়েছে সেগুলো বর্তমানে যেখানে যেভাবে আছে অতীতে সেভাবে ছিলনা। এরা নানা দিকে সরেছে খুব ধীরে ধীরে। কখনো কয়েকটা মিলে বা সবগুলো মিলে বড় অখণ্ড স্থলভাগ গঠন করেছে, আবার কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পর থেকে সরে গেছে। এ সবের ফলে ভূপৃষ্ঠে নানা সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন সহ নানা রকম পরিবেশ পরিবর্তনে জীবজগতে কখনো বড় বড় উন্নয়ন, আবার কখনো বিপর্যয় ঘটেছে। জীবের নানা প্রজাতির স্থিতি, পরিবর্তন ও বিলুপ্তির উপর এগুলো দারুণ প্রভাব রেখেছে, যা আমরা ক্রমে দেখবো। বিশেষ করে গত পঞ্চাশ কোটি বছর ধরে জীবের ইতিহাসে এ প্রভাব আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

এখন দেখা যাক সুদূর অতীতে মহাদেশের এরকম নড়াচড়ার ব্যাপারটিতে আমরা নিশ্চিত হলাম কীভাবে। সন্দেহটি কারো কারো কাছে জেগেছিল ১৮০০ শতকের মাঝামাঝি স্রেফ পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের পূর্ব উপকূলের ত্রিভুজের মত বের হয়ে থাকা অংশটি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের বের হয়ে থাকা অংশের তলায় সুন্দর ফিট করে যায় অনেকটা জিগ্-স পাজলের টুকরাগুলো ফিট করার মত। একই ভাবে উত্তর আমেরিকাকে একটু মোচড় দিয়ে নিলেই তা ইউরোপের সঙ্গে সুন্দর ফিট করে যায়, যেটুকু ফাঁক উত্তরে থাকে তা গ্রীনল্যান্ড দিয়ে ভরাট করা যায়। এটি লক্ষ্য করে অনেকে বল্লেন এত মিল নেহাৎ দৈবক্রমে হতে পারেনা, বরং এককালে মহাদেশগুলো ওভাবে পরস্পর লাগানোই ছিল, পরে এখানটায় ভেঙ্গে পৃথক হয়েছে। এরকম চিন্তা অনুসরণ করেই ১৯১৫ সালে বিজ্ঞানী ভেগনার মহাদেশগুলো ক্রমে ক্রমে সরে যাওয়ার একটি তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন।

ভেগনারের তত্ত্ব আরো ভাল ভাবে সমর্থিত হলো যখন দেখা গেল যে মহাদেশগুলো শুধু ম্যাপের মধ্যে পরস্পর ফিট করেই যাচ্ছেনা, সত্যিকার জায়গার শিলাস্তরগুলো পর্যন্ত সংযোগ রেখার দুই পাশে পরস্পরের সঙ্গে মিলে যায়। যেমন পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলের শিলাস্তরগুলো ব্রাজিলের পূর্ব উপকূলের শিলাস্তরগুলোর সঙ্গে এমনভাবে সদৃশ



যে উভয় ভূখণ্ড একত্র করলে দুই দিকে শিলাস্তর প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন থাকে। এ যেন একটি পত্রিকাকে মাঝখান দিয়ে এলোমেলো ভাবে ছিড়ে দুজনে দুই টুকরা নিয়ে সরে গিয়েছিল। এবার আবার দুই টুকরা পরস্পরের কাছে এনে ঠিক ওখানটায় জোড়া লাগালে পত্রিকার লেখাগুলো এমনভাবে লাইনে লাইনে মিলে স্বচ্ছন্দে পড়া যাচ্ছে যে যেন পত্রিকাটি ছেড়াই হয়নি। এক্ষেত্রে যেন শিলাস্তর পড়ে বুঝা গেল ব্রাজিল আর পশ্চিম আফ্রিকা এক সময় একই ভূখণ্ড ছিল।

তবে ভেগনারের তত্ত্বে বড় রকমের সমস্যাও ছিল। মহাদেশগুলো এভাবে এতখানি সরে গেল কী করে? লাঙ্গলের ফলার মত সমুদ্র তল চষে গিয়ে মহাদেশকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে প্রচণ্ড শক্তির দরকার হবে। এ শক্তি কোথা থেকে পাওয়া গেল? তা ছাড়া এভাবে মহাদেশগুলো ছড়িয়ে পড়ার ফলে পৃথিবী আগের চেয়ে অনেক বড় হয়ে যাওয়ার কথা, সেভাবে বড় হবার কোন লক্ষণ তো নাই। এসব কারণে ভেগনার তত্ত্বের ফলাফলের স্পষ্ট সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও তত্ত্বটি সর্বজনমান্য হচ্ছিলনা। পরে ১৯৬০ এর দশকে আরো গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব এসে ভূপৃষ্ঠের চলাচলকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে সেই সঙ্গে এর পেছনের কারণও স্পষ্ট হয়েছে।

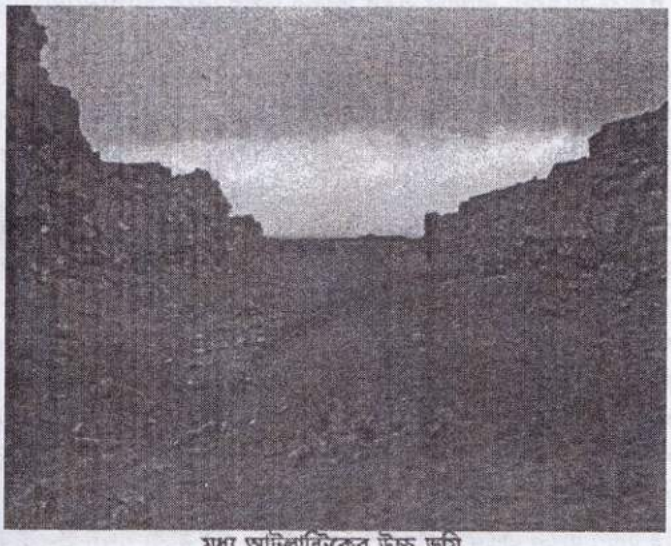
ইতোমধ্যে এরকম চলাচলের আরো ভাল প্রমাণ পাওয়া গেছে। আগে যে ফিটিং মহাদেশের স্থলের কিনারার মধ্যে দেখা গিয়েছিল তাতে যেটুকু খুঁত ছিল, দেখা গেল যে দুদিকেই অগভীর সমুদ্রে মহীসোপানটিকে মহাদেশের কিনারা ধরলে সেইটুকু খুঁতও থাকেনা। কম্পিউটার সে কাজ যে ভাবে করে দিল তাতে সন্দেহের কোন সুযোগই রইলোনা। তাছাড়া এখন এটি শুধু অতীতের ঘটনা নয়, বর্তমানেও যে মহাদেশগুলো সব সময় খুবই ধীর গতিতে সরছে তা উপগ্রহ ছবি থেকে ধরা পড়ছে, পরিমাপও করা

যাচ্ছে। যেমন উদাহরণস্বরূপ দেখা গেছে যে আটলান্টিক মহাসাগর প্রতি বছর দুই সেন্টিমিটার করে প্রসারিত হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব : প্লেইট টেকটোনিক

ভূ-পৃষ্ঠের চলাচলের কারণ ও তার ফলশ্রুতি সম্পর্কে আধুনিক প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সূত্রপাত রয়েছে ১৯৬০ এর দশকে। সমুদ্রতল গবেষণার মাধ্যমে সমুদ্রতল সম্পর্কে এসময় অনেকখানি বিশদভাবে জানা সম্ভব হচ্ছিল। সমুদ্রতলে ভূত্বকের পুরুত্ব খুব কম– মাত্র ৫-৭ কিলোমিটার, আর এটি খুবই উঁচুনিচু। যেমন মধ্য আটলান্টিকে সমুদ্রতলে রয়েছে রীতিমত একটি পর্বতশ্রেণী যার মাঝখানে আবার রয়েছে দীর্ঘ একটি নিচু জায়গা বিভাজন উপত্যকা। এখানটা বেশ আগ্নেয়গিরি সংকুল। এরকম পর্বতশ্রেণীর মাঝ বরাবর উপত্যকা সৃষ্টি হবার ব্যাখ্যা হলো এখানটায় ভূগর্ভ থেকে উত্তপ্ত গলিত বস্তু উঠে আসছে ও দুপাশে তা জমছে পর্বত হয়ে। এই উঠে আসার কারণ হলো ভূত্বকের তলায় গলিত অংশের ক্রমাগত পরিচলন-প্রবাহ। এভাবে বিভাজন উপত্যকার দুপাশে জমা বস্তু নূতন উঠে আসা বস্তুর চাপে ক্রমে আরো পাশের দিকে বিস্তৃত হচ্ছে, আর আটলান্টিক ক্রমে আরো প্রশস্ত হচ্ছে। একই চাপে দুপাশের মহাদেশও সরছে, কারণ পুরো ভূত্বক ভূগর্ভের ম্যান্টলের উপরিভাগে প্রায় চটচটে তরল পাতলা অংশের উপর ভাসছে।

ভূগর্ভ থেকে নূতন বস্তু ক্রমাগত উঠে আসলে ভূ-গঠনের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সেই পরিমাণ বস্তুকে আবার কোথাও না কোথাও ভূগর্ভে যেতে হয়। দেখা গেল মহাদেশের কিনারায় গিয়ে এটি মহাদেশের তলায় ঢুকে পড়ে, এবং তারপর ভূগর্ভে চলে যায়। আটলান্টিকের দুই পাড়ে অনেক জায়গায় এমনটি হচ্ছে। তেমনি একই রকম প্রক্রিয়ায় প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম তীরে, যেমন জাপানে, স্থলের তলায় ঢুকে পড়ছে

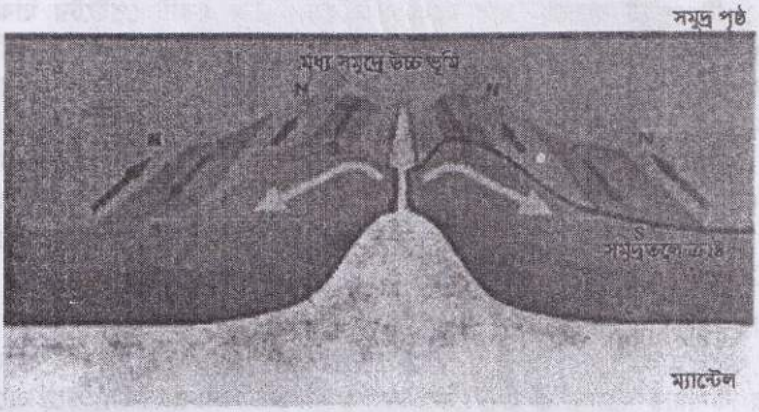


মধ্য আটলান্টিকের উচ্চ ভূমি
(আইসল্যান্ডে উন্মোচিত অংশ)

উঠে আসা বাড়তি বস্তু। যেসব অঞ্চলে এমনটি হয় যেখানে ভূত্বকের নিচে সব সময় অস্থিতিশীল অবস্থা থাকে– ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি লেগেই থাকে। জাপানসহ ঐ জায়গাগুলোর অবস্থা থেকে তা বেশ প্রমাণিত।

এসব বিষয়ের ভাল সুরাহা হয়েছে ভূত্বক চলাচলের আধুনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার মাধ্যমে, যার পেছনে বড় সাক্ষ্য প্রমাণ এসেছে সমুদ্রতলের ভূ-চৌম্বক পারমাপে। ভূগর্ভে তরল চৌম্বক ধাতুর প্রবাহের কারণে ভূচুম্বকত্ব সৃষ্টি হয়। তাই ঐ প্রবাহের পরিবর্তনের ফলে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্র যুগে যুগে উঠানামা করেছে, এবং বহু বছর পরপর তার দিকও পরিবর্তন করেছে। অর্থাৎ আজ যা পৃথিবীর চৌম্বক উত্তর মেরু তা অতীতে এক সময় দক্ষিণ মেরু ছিল, তারও আগে আবার বর্তমানের মতই ছিল। এমনি ভাবে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্র বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। এদিকে স্থলভাগে যুগে যুগে নূতন শিলাস্তর জমেছে আগ্নেয়গিরির লাভা জমে। অতীতে তরল লাভা ঠান্ডা হয়ে কঠিন হবার সময় ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্র সে সময় যে দিকে যেমন ছিল তেমনি ভাবে শিলা সেদিকেই সেভাবে চুম্বকায়িত হয়ে পড়েছিল। আর এই অবস্থায় একবার কঠিন হয়ে জমাট বেঁধে গেলে পরে চৌম্বকক্ষেত্রে পরিবর্তন এলেও ঐ শিলার চুম্বকায়নে আর পরিবর্তন ঘটেনা, জমাট বাঁধার সময়েরটাই রেকর্ড হয়ে থাকে। এখন আমরা তার চুম্বকত্ব মেপে বুঝতে পারি অতীতে সে সময় পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র কী রকম ছিল। এভাবে আজ আমরা ভূচুম্বকত্বের ইতিহাস জানতে পারছি। অনেক সময় এই শিলায় ভাঁজ সৃষ্টিতে, অথবা তা ভেঙ্গে দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে শিলাস্তরগুলোর আদিরূপ গোলমাল হয়ে গেলেও শুধু চুম্বক ক্ষেত্র দেখে তার স্তর বিন্যাসকে সঠিকভাবে চিনে নেয়া যায়। এ যেন এক রকম টেইপ রেকর্ডারের টেইপে গান রেকর্ড করার মত। টেইপের চুম্বক চূর্ণ যেমন গানের সিগন্যালের চৌম্বক ক্ষেত্র অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়ে স্থায়ী হয়ে যায়, তেমনি গলিত শিলা সেই সময়ের পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়ে জমাট শিলা রূপে স্থায়ী হয়ে যায়।

১৯৬০ এর দশকে গবেষণা জাহাজ সমুদ্র তলের উপর দিয়ে ম্যাগনেটোমিটার (চৌম্বকত্ব পরিমাপক) টেনে নিয়ে গিয়ে আটলান্টিকের সমুদ্র তলের চৌম্বক জরিপ করে ফেলেছিল। সেখানে এক চমকপ্রদ জিনিস আবিস্কৃত হলো। দেখা গেল মধ্য আটলান্টিকে সমুদ্রতলে পর্বতমালা ও বিভাজন উপত্যকার দুই পাশে উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি ফালিতে আজকের ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের বিপরীতমুখি চুম্বকত্ব রেকর্ড হয়ে আছে (দক্ষিণ মেরু উত্তর দিকে, উত্তর মেরু দক্ষিণ দিকে)– অনেকটা দুপাশে দুটি লম্বা ফিতার মত। তারপর এ দুটিরই পাশে আরো দুটি এমনি ফিতা– যাদের চুম্বকত্ব আজকের ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের একই অভিমুখি অর্থাৎ আগের দু'টার বিপরীত। এ ভাবে পরপর আগেরটির বিপরীতমুখি দুই পাশে জোড়ায় জোড়ায় আরো ফিতা। ব্যাপারটি এমন দাঁড়াল যে মধ্য আটলান্টিকের বিভাজন উপত্যকার এক পাশের এরকম ফিতাগুলো অন্য পাশের ফিতাগুলোর যেন ঠিক আয়নার প্রতিফলন। এর একটি ব্যাখ্যাই সম্ভব হতে পারে। বিভাজন উপত্যাকায় অনেকটা টুথপেষ্টের টিউবের মুখ থেকে টুথপেষ্ট বের হওয়ার মত করে গলিত শিলা বের হয়ে দুপাশে বিস্তৃত হয়েছিল। তখন ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক যে দিকে ছিল সেখানে সেরকম চুম্বকত্ব স্থায়ী হয়েছে। এটি ক্রমাগত ঘটেছে ও ঐ শিলাগুলো নূতন বের হওয়া গলিত শিলার চাপে ক্রমে ক্রমে দু'পাশে সরে গেছে। এর মধ্যে যখন ভূ-চৌম্বকত্বের দিক

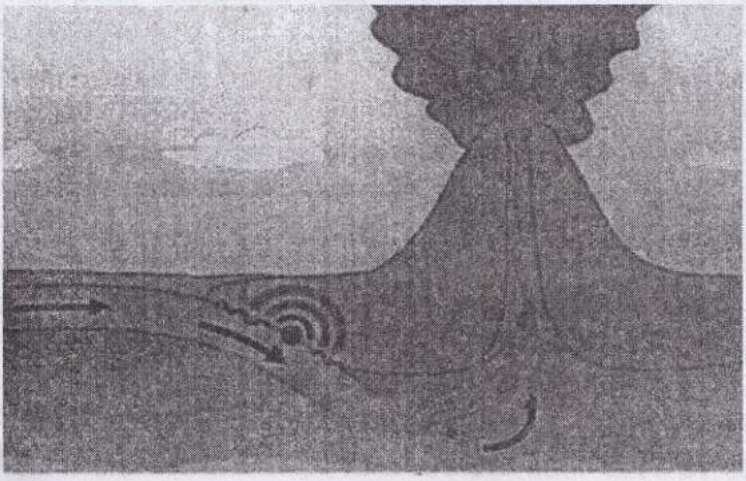


জমাট লাভাতে রেকর্ড হওয়া
চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক

সমুদ্রতল প্রসারণ ও ফিতার আকারে শিলা বিন্যাস

পরিবর্তিত হয়েছে বলে তখন ভিন্ন দিকের চুম্বকত্ববাহী ফিতা বিভাজন উপত্যকার দুপাশে সংলগ্ন হয়ে নূতন এসেছে, ও আগের ভিন্ন দিক বিশিষ্ট ফিতা দুপাশে কিছু দূরে সরে গেছে। এমনি ভাবেই দুপাশে জোড়া জোড়া শিলার ফিতা সৃষ্টি হয়েছে। কয়েক হাজার বছর পর পর সৃষ্টি হওয়া এসব শিলার ফিতা চৌম্বক ইতিহাস ধারণ করে আছে। এভাবে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি কী হারে ভূগর্ভ থেকে গলিত শিলা উঠে এসে সমুদ্র তলে দু'পাশের দিকে ক্রমাগত সরেছে ও চাপের সৃষ্টি করেছে, যার ফলে দু'দিকের মহাদেশ একটু একটু করে সরে গেছে।

এসব সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বাধুনিক তত্ত্বের মতে ভূগর্ভে ম্যান্টলের উপরিভাগের চটচটে তরল স্তরের উপর ভূত্বক কতগুলো প্লেইট বা পাতে বিভক্ত হয়ে ভাসছে। এরকম



ধ্বংসাত্মক প্লেট কিনারায় ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি

মোট ১৮টি প্লেইট রয়েছে- যার মধ্যে ৬টি বড়। এক একটি প্লেইটের মাঝখানটায় দেখলে আমরা খুব বড় ভূতাত্ত্বিক ঘটনা ঘটতে দেখবোনা, কিন্তু কিনারায় যদি দেখি তাহলে সেখানে প্লেইটে প্লেইটে ধাক্কাধাক্কি সহ নানা রকম সক্রিয়তা দেখা যায়। ইতোমধ্যে নূতন শিলা উঠে সমুদ্র তল দুপাশে বিস্তৃত হবার যে ঘটনা আমরা দেখেছি তাতে একদিকে প্লেইটের সঙ্গে প্লেইটের সংঘর্ষ ও ঠেলাঠেলিতে অস্থিতির বহু ঘটনা ঘটে, অন্য দিকে একটি প্লেইট থেকে সংলগ্ন অন্য প্লেইট বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাদেশগুলোকে এদিক ওদিক নিয়ে যায়। ভূ-ত্বকের চলাচলের এই সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে বলা হয় প্লেইট টেকটোনিক।

উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় প্লেইটগুলোর কিনারা সক্রিয় থাকে– হয় গঠনমূলক কিনারা হিসাবে, অথবা ধ্বংসাত্মক কিনারা হিসাবে। মধ্য আটলান্টিকে বিভাজন উপত্যকায় যা ঘটছে তা প্লেটের কিনারার গঠনমূলক রূপ। সেখানে ভূগর্ভ থেকে গলিত শিলা উঠে এসে নূতন নূতন সমুদ্র তল তৈরি করছে। আবার অন্য দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম তীরে জাপান অঞ্চলে যে ভাবে আমরা ঠেলা খাওয়া সমুদ্র তলের শিলাকে মহাদেশের তলায় ঢুকে পড়তে দেখেছি সেটি প্লেইটের ধ্বংসাত্মক কিনারা। এখানে দুই প্লেইটের কিনারায় সংঘর্ষে অতিরিক্ত ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি সৃষ্টি হচ্ছে। একই ভাবে বিভিন্ন প্লেটের মিলন স্থলের ধ্বংসাত্মক রূপ আমরা কালিফোর্নিয়া অঞ্চলে এবং পৃথিবীর অন্যান্য নানা জায়গায় দেখতে পাই।

গণ্ডোয়ানাল্যান্ড ও লরেশিয়া

প্রায় ১৪ কোটি বছর আগে পর্যন্ত আজকের দক্ষিণ আমেরিকা, অ্যান্টার্কটিকা, আফ্রিকা, ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া পরস্পর সংলগ্ন একীভূত একটি বিরাট ভূখণ্ড গঠন করেছিল। একে বলা হয় গণ্ডোয়ানাল্যান্ড। অন্যদিকে আজকের উত্তরের স্থলভাগগুলো– এশিয়ার উত্তর ভাগ, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এগুলোও মোটামুটি সংলগ্ন থেকে গঠন করেছিল আর একটি ভূখণ্ড, যাকে বলা হয় লরেশিয়া। পরে ধীরে ধীরে এর বিভিন্ন অংশ প্লেইট টেকটোনিকের প্রক্রিয়ায় বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে গিয়ে শেষ অবধি আজকের অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। যেমন ভারত গণ্ডোয়ানাল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধীরে ধীরে উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়েছে এবং ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে কিছুটা মোচড় নিয়েছে।

এভাবে অনেকখানি স্থান অতিক্রম করে কোটি খানেক বছর আগে ভারত বর্তমান অবস্থানে এসেছে। লরেশিয়ার দক্ষিণ ইউরেশিয়া প্লেইটের সঙ্গে এভাবে এসে ঠেলা দিয়েছে ইন্ডিয়া প্লেইট। এভাবে ভারত কার্যত ইউরেশিয়া প্লেইটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং সংঘর্ষ স্থান বরাবর ভূত্বক উপরের দিকে ফুলে উঠেছে, যার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে হিমালয় পর্বতমালা। পৃথিবীর অনেক পর্বতশ্রেণি এভাবে প্লেইটের সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তাই আজকে যেখানে পর্বতশ্রেণি আমরা তাকে অতীতের মহাদেশীয় কিনারা বলে চিনে নিতে পারি। সেই পর্বতশ্রেণি বরাবর ম্যাপকে ছিড়ে নিলেই বুঝতে পারবো অতীতের মহাদেশগুলো কী রকম ছিল সেগুলো অতীতে পৃথক বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড হিসেবে অতি ধীর গতিতে বিচরণ করেছে।



ইন্ডিয়া প্লেট ক্রমাগত উত্তরে সরে গিয়ে ইউরেশিয়ান প্লেটের সঙ্গে সংঘর্ষে

গণ্ডোয়ানাল্যান্ড ও লরেশিয়া– উভয়ের নানা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে আজকের মহাদেশগুলো তৈরি হয়েছে। অতীতের দিকে গেলে আমরা সব স্থলভাগকে ঐ দুই ভূখণ্ডে সংবদ্ধ অবস্থায় পাই। কিন্তু পৃথিবী-পৃষ্ঠে এদের সামগ্রিক অবস্থান বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন দূর অতীতে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড অনেক বেশি দক্ষিণে ছিল বলে তার যে অংশ এখন উষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে, তা এক সময় দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি জায়গায় বরফে আবৃত ছিল। এখানকার ২০ কোটি বছর আগের ভূ-তাত্ত্বিক চিহ্ন ও ফসিল থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার এক সময় গণ্ডোয়ানাল্যান্ড ও লরেশিয়া উভয়ে একত্রে থেকে একটিই নিরবচ্ছিন্ন স্থলভাগ ছিল– যার নাম দেয়া হয়েছে প্যানজিয়া। এসব সংযুক্তি ও বিচ্ছিন্ন হওয়া জীবজগতের বিবর্তনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে যুগে যুগে। যেমন আজকের সব রেইন ফরেষ্ট বা বাদল বন অতীতে সংলগ্ন জায়গায় ছিল, তাই সর্বত্র তার চরিত্র মূলত এক রকম– হোকনা আজ তা দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে, এশিয়ার মালয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়াতে, কিংবা আফ্রিকার কঙ্গোতে। পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে অবশ্য তাদের মধ্যে ভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণি বিবর্তিত হয়েছে। মহাদেশগুলো যখন এক ভূখণ্ডে ঘন সংবদ্ধ ছিল তখন সমুদ্রের জন্য স্থান বেশ বেড়ে গিয়েছিল। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ অনেক নিচে নেমে গিয়েছিল। এতে মহাদেশের অনেক জায়গা জলমুক্ত ছিল।



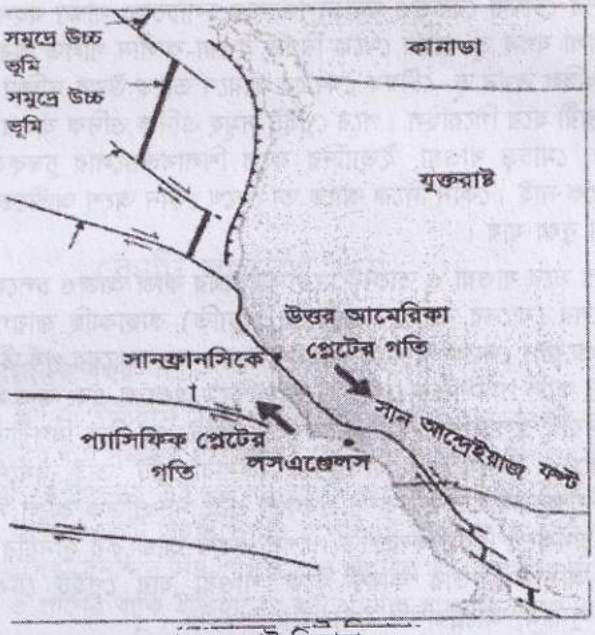
গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ২০ কোটি বছর আগে মেরুর কাছে বরফে ঢাকা

তাছাড়া এরকম একসঙ্গে সংবদ্ধ ভূখণ্ডে অনেক বেশি জায়গা সমুদ্রতীর থেকে অনেক দূরে থাকা সেখানে মহাদেশীয় চরম আবহাওয়া প্রাধান্য লাভ করেছিল, যা উদ্ভিদ ও প্রাণির বিবর্তনে প্রচুর প্রভাব রেখেছে। এগুলোর কিছুটা বিস্তারিত আমরা পরে দেখবো।

মহাদেশ চলাচলের আরো সাক্ষ্য

প্লেইট টেকটোনিক তত্ত্বের মাধ্যমে মহাদেশ চলাচলের প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে বুঝতে পারার মাধ্যমে ঘটনার আরো বেশ কিছু অতীত সাক্ষ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে। আজকের পর্বত শ্রেণিগুলো দেখে অনেক ক্ষেত্রে আমরা সেই রেখা বরাবর বিভিন্ন প্লেইটের অতীত সংঘর্ষের ইতিহাস দেখতে পাই। এর থেকে জানি যে হিমালয় অঞ্চল এখন সমুদ্র থেকে দূরে মহাদেশের অভ্যন্তরে থাকলেও এক সময় তা স্থলভাগের কিনারায় সমুদ্রের তীরে ছিল। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের পর্বত-সাক্ষী বিভিন্ন প্লেইট চলাচলের আভাস দিচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগর তলের প্লেইটের সঙ্গে উত্তর আমেরিকা প্লেইটের সংঘর্ষে আমেরিকার বিস্তীর্ণ ভূমি উঁচু হয়ে উঠেছিল সমুদ্র থেকে যার ফলে রকি পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে আল্পস, আন্ডিজ ইত্যাদিও।

পর্বত-সাক্ষ্যের মতই গুরুত্বপূর্ণ হলো হিমবাহের আঁচড়ের সাক্ষ্য। মেরু অঞ্চল থেকে চির বরফের যে জগদ্দল স্তুপ ধীরে প্রবাহিত হয়ে কঠিন বরফ-নদী হিমবাহ হিসাবে নিম্ন অক্ষাংশের দিকে এগিয়ে এসেছে, আজ তাদের প্রবাহের শেষ সীমা একেবারে উত্তর বা দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু মহাদেশগুলোর অতীত অবস্থানের কারণে এই হিমবাহ একদিন এমন সব অঞ্চলে ছিল যেগুলো এখন উষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর অধিকারী। কিন্তু হিমবাহ যেখানে যায় বরফের প্রবাহ তার সঙ্গে অনেক



ধ্বংসাত্মক প্লেট কিনারা :
কালিফোনিয়ায় ভূমিকম্পের কারণ

শিলাখণ্ড নুড়িপাথর বহন করে নিয়ে যায় এবং এগুলো বরফের তলায় বিশাল শক্ত ব্রাশের মত কাজ করে। বরফের চাপে এসবের আঁচড়ের চিহ্ন সেখানে থেকে যায় উঁচু নিচু খাদ, হ্রদ ইত্যাদি রূপে। পরে হিমবাহ না থাকলেও এই আঁচড়ের চিহ্ন দেখে বুঝা যায় যে হিমবাহ কদ্দূর পর্যন্ত গিয়েছিল। সে সব চিহ্ন এখন বলে দিচ্ছে মহাদেশগুলোর অতীত অবস্থান কোথায় ছিল।

একই ভাবে জীবের ফসিলগুলোও বলে দিচ্ছে সেখানকার আজকের যে জলবায়ু বা প্রাকৃতিক পরিবেশ তাতে ঐ রকম জীবের ওখানে থাকার কথা কিনা। ফসিল দেখে আমরা তখনকার জলবায়ু এবং ঐ ভূখণ্ডের তখনকার অবস্থান আন্দাজ করতে পারি। আগেই বলেছি কোন মহাদেশ অতীতে কোথায় কার সঙ্গে সংলগ্ন ছিল, কখন বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ইত্যাদি তথ্যের সঙ্গে আমরা উভয় স্থানের অতীত ফসিল ও বর্তমান জীব-বৈচিত্রকে মিলিয়ে দেখে অতীত ইতিহাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি। যেমন অষ্ট্রেলিয়া কখন গণ্ডোয়ানাল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো সেই সময় থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি অষ্ট্রেলিয়ায় ক্যাঙ্গারু, কোয়ালা প্রভৃতি বিচিত্র রকমের মারসুপিয়াল বিবর্তিত হবার এবং অন্য মহাদেশের মত প্লাসেন্টাল স্তন্যপায়ী সেখানে বিরল হবার কারণ। উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা এক সময় বিচ্ছিন্ন ছিল ও পরে সংলগ্ন হয়েছে– এই ঘটনা দক্ষিণ আমেরিকার ভিন্ন ধরনের প্রাণি বিবর্তনে যেমন ভূমিকা রেখেছে, তেমনি পরে উত্তর আমেরিকার আগ্রাসী কিছু প্রাণি প্রজাতি এখানে আসার ফলে এখানকার অনেক আদি প্রজাতির ধারা বিলুপ্ত হওয়াতেও অবদান রেখেছে।

শিলার সেই চৌম্বক রেকর্ডও মহাদেশগুলোর চলাচলের সাক্ষ্য বহন করছে। এখানকার অনেক শিলা যখন ভূ-গর্ভের থেকে নির্গত হওয়া-কালীন গলিত অবস্থা থেকে ঠান্ডা হয়ে জমাট বাঁধছিল তখন ভূ- চৌম্বক ক্ষেত্রের কারণে তাতে উত্তর-দক্ষিণ দিকের চুম্বকত্ব সৃষ্টি হয়ে তা স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। পরে প্লেইট সমূহ এদিক ওদিক যাওয়া আর তার কিনারার ভাঙ্গাভাঙ্গি, মোচড় খাওয়া, ইত্যাদির ফলে শিলাখন্ডগুলোর চুম্বকত্ব এখন আর উত্তর দক্ষিণ দিকে নাই। কোন দিকে আছে তা দেখে কোন অংশ অতীতে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা বুঝা যায়।

প্লেইটগুলো সরে যাওয়া ও তাদের মধ্যে সংঘর্ষের কাজ আজও চলছে, যে কারণে এ সব সংঘর্ষ স্থলের (যাদের বলা হয় ফল্ট বা বিচ্যুতি) কাছাকাছি জায়গাগুলোতে ভূমিকম্প ইত্যাদির প্রকোপ লেগেই থাকছে। যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব তীরে কার্লিফোর্নিয়ার কাছে সমুদ্র তলে প্যাসিফিক প্লেইট উত্তর পশ্চিমে এগুচ্ছে এবং তার সঙ্গে পাশাপাশি ঘষে কালিফোর্নিয়ার স্থলভাগে উত্তর আমেরিকা প্লেইট এর ঠিক বিপরীত দিকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে সরছে। উভয়ের সংযোগস্থলের কিনারা দুটি তাই ঘর্ষণের মধ্যে রয়েছে। কালিফোর্নিয়ার ক্রমাগত ভূমিকম্প প্রবণতা এবং সাম্প্রতিক কালে সানফ্রানসিস্কোর বড় কয়েকটি ভূমিকম্প এরই ফলশ্রুতি। শেষ অবধি আজকের দুনিয়ার এ রকমের অনেক ভূতাত্ত্বিক অস্থিতিশীলতার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় প্লেইট টেকটোনিকের মধ্যে– ভূমিকম্প, সুনামি, আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি।

কোটি বছরের দিন

একটি অতি দীর্ঘ কাল্পনিক বছর

ইতোমধ্যে পৃথিবী ও প্রাণের ইতিহাস নিয়ে আমরা যেটুকু আলোচনা করেছি তাতে সব কিছু কোটি কোটি বছরের দীর্ঘ সময়ের পদক্ষেপেই ঘটেছে। আমাদের নিজের জীবনকাল বা দৈনন্দিন সময় জ্ঞানের তুলনায় এই কালের পরিধি অনেক বিশাল। একে আমাদের অভ্যস্ত চিন্তার মধ্যে আনার একটি সহজ উপায় হলো এই দীর্ঘকালকে সংক্ষিপ্ত স্কেলে নিয়ে এসে তাকে আমাদের দৈনন্দিন দিন-পঞ্জির সঙ্গে তুলনীয় সময়ের মধ্যে ঘটেছে বলে কল্পনা করা। পৃথিবী ও প্রাণের বাকি ইতিহাসের আলোচনায় যাওয়ার আগে এক নজরে পুরো ইতিহাসটি দেখে ফেলার সুবিধার জন্য আমরা কিছুক্ষণের জন্য তাই করবো।

একটি কাল্পনিক বার্ষিক ক্যালেন্ডার আমরা শুরু করবো যথারীতি খৃষ্টীয় নববর্ষের শুরুর (১ জানুয়ারি) রাত বারটায়। এটি ঠিক আমাদের পৃথিবীর বছর হবেনা, হবে পুরো মহাবিশ্বের বছর। কল্পনা করি সেই নববর্ষের রাত বারটার মুহূর্তটি হলো মহাবিশ্বের শুরুর মুহূর্ত– বিগ ব্যাং। আর এখন আজকের যে মুহূর্তে আমরা আছি সেটি হলো ঐ কাল্পনিক বছরটির আগস্ট মাসের ৭ তারিখ মধ্যরাতে– অর্থাৎ বিগ ব্যাং এর পর আজ পর্যন্ত ৭ মাস ৭ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। অবশ্য সত্যিকার কালে অতিক্রান্ত হয়েছে চৌদ্দ শত কোটি বছর। এই ভাবে নেয়া কাল্পনিক বছরের প্রত্যেকটি দিন হবে আসলে সাড়ে ছয় কোটি বছর। কাল্পনিক দিনকে ঠিক এই দৈর্ঘ দেবার একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। পৃথিবীর যাবতীয় জীব-বৈচিত্রকে দারুণ ভাবে ধ্বংস করা শেষ গণবিলুপ্তির ঘটনাটি ঘটেছিল আজ থেকে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে। আমাদের কাল্পনিক বছরের প্রত্যেক দিনকে সাড়ে ছয় কোটি বছর ধরলে সেই গণবিলুপ্তিটি ঘটেছিল এখন থেকে এক দিন আগে– আমাদের কাল্পনিক ক্যালেণ্ডারে ৬ আগস্ট মধ্যরাতে। ঐ গণবিলুপ্তিতে ডাইনোসররা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে স্তন্যপায়ীদের অভাবনীয় বিকাশের সুযোগ ঘটেছিল। আমাদের নিজেদের দিক থেকে বিবেচনা করলে সেটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমরা আসার দ্রুত পদক্ষেপগুলো তখন থেকেই নেয়া শুরু হয়েছিল– দেহ গঠন, আচরণ, মস্তিষ্ক বিকাশ সব দিক থেকে। তাই এই শেষের 'একদিনের' কাহিনীকেই আমরা বেশি মনোযোগ দিয়ে দেখতে চাই। কিন্তু তার আগে দ্রুত এক নজর দেখি এই ক্যালেন্ডারের ইতোমধ্যে অতিবাহিত পুরো ৭ মাস ৭ দিনে বাকি কী ঘটেছিল।

কাল্পনিক নববর্ষের দিন মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়ে গ্যালাক্সি, তারা, এবং আমাদের সূর্য সৃষ্টি হতে হতে এর ছয় মাসের বেশি সময় লেগে গিয়েছিল। এতে আমাদের পৃথিবীর জন্ম প্রক্রিয়া

শেষ হয়েছে ২৮ মে– যদি চাঁদ সৃষ্টি হয়ে, ভূত্বক গঠিত হয়ে, পৃথিবীর কিছুটা স্থিত হওয়াকেই সেই জন্ম প্রক্রিয়া শেষ বলে ধরে নিই। পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষ হতে হতে অবশ্য আরো প্রায় ৮ দিন লেগে গেছে, সেটি ঘটেছে ৬ জুন নাগাদ। তারপর জুলাই এর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শুধু এককোষী প্রাণিই ছিল যদিও বির্বতনের ফলে তার মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল নানা বৈচিত্র। এরপর বহু-কোষী প্রাণির উদ্ভব হয়ে তার নানা বৈচিত্র দেখা দিলেও এ সময়ের ফসিল খুব বেশি আমাদের হাতে এসে পৌছায়নি। আগস্ট মাসের আগের তেমন বেশি সরাসরি ফসিল সাক্ষ্য আমাদের কাছে কম, যদিও তখন বহু জীব বেশ বড় ও জটিল হয়ে উঠেছে বলে প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু আগস্টের শুরুর আগে আগে হঠাৎ করে ফসিল বৈচিত্রে বিরাট জোয়ার এসেছে– বিশেষ করে নানা রকম খোলস-ওয়ালা অনেক শ্রেণীর অনেক ধরনের জীবে। আমাদের কাল্পনিক ক্যালেন্ডারে এটি মাত্র আট দিন আগের ঘটনা হলেও আসল সময়ে এটি প্রায় ৫৫ কোটি বছর আগের কথা। তারপর থেকে আমাদের ফসিল ইতিহাস যথেষ্ট সমৃদ্ধ, যার ভিত্তিতে আমরা এ সময়ের জীব বিবর্তনের নানা গতিবিধি বেশ কিছু বিস্তারিত বুঝতে পারছি। সেদিক থেকে এই শেষ 'আট দিন' আমাদের পুরো কাহিনীতে কিছুটা বিস্তারিত ভাবে আমরা দেখতে পারবো– কীভাবে পৃথিবীর নানা পরিবর্তন ও দুর্যোগের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের বৈচিত্র নানা মোড় নিয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে সেই আট দিন অর্থাৎ ৫৫ কোটি বছরকে ভালভাবে দেখলেও এখন আপাতত খুব সংক্ষেপে কোনদিন কী হয়েছে একটু দেখে ফেলা থাক।

গত 'আট দিন'

সেই ফসিল বৈচিত্র যে দেখা দিয়েছিল তার সমারোহ নানা দিকে বিস্তৃত ও উন্নত হয়েছিল বটে, কিন্তু আগষ্ট শুরুর (আমাদের কাল্পনিক ক্যালেন্ডারে) সেই দিনগুলোর পর জীববৈচিত্রের এমন হঠাৎ ঝলকানি পরে আর কখনো দেখা যায়নি। সেটি ঘটেছিল সমুদ্রের পানিতে, প্রাণের অস্তিত্ব যেখানে শুরু হয়ে দীর্ঘকাল সেখানেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেখানে অমেরুদণ্ডীদের পরপর এসেছে বিচিত্র মেরুদণ্ডী প্রাণি, প্রধানত মাছ। তাদেরই কিছু প্রজাতির মধ্যে পানি থেকে মাঝে মাঝে ডাঙায় উঠে আসার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল– ডাঙার জীবনের জন্য নিজকে পরিবর্তিত করে। এভাবে স্থলেও প্রাণের বৈচিত্র আসতে খুব বেশি আর দেরী হয়নি। উদ্ভিদ স্থলেই প্রথম দেখা দিয়েছে, তারপর এখানে রীতিমত বনের রাজত্ব। আর এর মধ্যে উভচর থেকে পূর্ণ স্থলবাসী সরীসৃপ আর কীট পতঙ্গ দেখা দিয়েছিল প্রচুর বৈচিত্রে। সরীসৃপের নানা শাখায় ভবিষ্যতের ডাইনোসর, পাখি আর স্তন্যপায়ীদের অঙ্কুর উপ্ত হচ্ছিল। ঐ শেষ আট দিনের মধ্যে একের পর এক এসব ঘটে চলেছিল। তবে তা নিস্তরঙ্গ ছিলনা মোটেই। ওর মধ্যে দুই এক দিন পর পর ঘটছিল এক একটি এক এক রকমের বিশ্ব-দুর্যোগ এবং তার ফলে ঘটছিল জীবের এক একটি গণবিলুপ্তি। প্রজাতি বৈচিত্রের একটি বড় অংশ এভাবে প্রত্যেকবার বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছিল জীব জগতকে নূতন করে সাজাবার সুযোগ। গণবিলুপ্তিতে যে সব প্রজাতি বেঁচে যাচ্ছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাদের মধ্য থেকেই বিকশিত হচ্ছিল নূতন নূতন জীবের সম্ভাবনা।

অবশেষে এসেছিল সেই সর্বশেষ গণবিলুপ্তি– সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে, যে কারণে আমরা আমাদের দিনের দৈর্ঘ সাড়ে ছয় কোটি বছর করেছি। একটি বিশাল উল্কাপাত হয়েছিল সেদিন, আমাদের কাল্পনিক ক্যালেন্ডারে এখন থেকে ঠিক এক দিন আগে। এই শেষ দিনটির কথা আমরা এখন একটু বিস্তারিত বলবো– শুধু দিন হিসেবে নয়, তার ঘন্টা মিনিট হিসেবেও।

'এক দিন' আগের ঐ গণবিলুপ্তি জীব জগতে ডাইনোসরদের রাজত্ব শেষ করে দিয়েছিল খুবই অল্প সময়ের মধ্যে সকল ডাইনোসরকে বিলুপ্ত করে। যে স্তন্যপায়ীরা এর আগে খুব ছোট আকারে বিনীত জীবন যাপন করছিল তাদের মধ্য থেকেই আসলো এবারকার সমারোহ। উল্কাপাতের দুর্যোগটি আমাদের ক্যালেন্ডারে ঘটেছিল ঠিক ২৪ ঘন্টা আগে রাত বারটায়। এর ধাক্কা ঘন্টা খানেকের মধ্যে সামলে নিয়েই স্তন্যপায়ীদের ও অন্যান্যদের নূতন ভাবে বিকাশ শুরু হয়েছিল। রাত ৩ টার মধ্যে পৃথিবীর অনেক অঞ্চলেই বেশ উষ্ণ ও অনুকূল পরিবেশে এই বিকাশ ও তার বৈচিত্র দ্রুততর হয়েছে। উষ্ণ রক্তের অধিকারী স্তন্যপায়ীদের মধ্যে মস্তিষ্ক এবং সার্বিক স্নায়ু ব্যবস্থার একটি নূতন যুগ সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের আকার নাটকীয় ভাবে বড় হয়ে পড়ছিল। ভোর ৬টার ভেতর স্তন্যপায়ী প্রজাতির সংখ্যা শীর্ষে পৌছে গিয়েছিল। সকাল ৮টার ভেতর আমাদের পরিচিত বিচিত্র স্তন্যপায়ীদের বিভিন্ন ফ্যামিলির পূর্বসূরিরা দেখা দিয়েছিল। এর মধ্যে তারা নানা বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্টের দিকে বিবর্তিত হচ্ছিল। যেমন- ঘোড়া শুরুতে ছোট কুকুর সাইজের অবস্থা থেকে ক্রমে উঁচু ও বড় হয়ে আজকের অতি চেনা বৈশিষ্টগুলো লাভ করছিল। ঐ কুকুর সাইজের শূকর জাতীয় একটি স্তন্যপায়ী আবার জলচর হবার দিকে বিবর্তনে তিমি হয়ে উঠেছিল ঐ সময়েই– ঐ শেষ দিনের সকালে। তখনকার দারুণ স্তন্যপায়ী বিকাশের মধ্যে একটি দল ছিল প্রাইমেট– বানর জাতীয়। এরা মস্তিষ্ক ও অন্যান্য কিছু দিক থেকে সবার কাছ থেকে এগিয়ে ছিল।

দুপুর বারটার মধ্যে সাধারণভাবে পৃথিবীর উত্তাপ চরমে উঠে। তারপর নেমে এসেছিল শৈত্য। এ সময়টার শুরুর দিকটা জীব-বৈচিত্র সৃষ্টির যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষ ভাবে বিকশিত হয়েছে বড় প্রাইমেটদের একটি শাখা এইপ্ বা নরবানর গোষ্ঠি। বানরদের তুলনায় বেশ বড় দেহী এইপ্দের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবেই মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটেছে– আকারে ও জটিলতায়। বুদ্ধি-নির্ভরতার স্পষ্ট অগ্রগতি তাদের মধ্য থেকেই শুরু হয়েছিল। বিকেল ৪টার দিকে রীতিমত একটি শৈত্যযুগ সৃষ্টি হয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে এর প্রকোপ বেশি ছিল বলে সেখানে বিশেষ রকমের প্রাণিরা বিবর্তিত হয়েছিল। যেমন উত্তরাঞ্চলে ছিল অতি বিশালদেহী লম্বা পশমধারী ম্যামথ– আজকের হাতির একটি পূর্বসূরি। আমাদের দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটেছিল রাত দশটার দিকে। এ সময় আফ্রিকাতে এইপ্দের মধ্য থেকে মানুষের পূর্বসূরিরা তাদের পৃথক যাত্রা শুরু করেছিল– এখন থেকে দুই ঘন্টা আগে, অর্থাৎ আসল সময়ে প্রায় ৫৪ লক্ষ বছর আগে। ঐ সময় রাত দশটায় মানবসদৃশ গোষ্ঠির এই প্রথম পদক্ষেপ শুরু হলেও ১০টা ৪০ মিনিটের মধ্যেই আমাদের কাছাকাছি অনেক গুণে গুণান্বিত ভিন্ন মানব প্রজাতি হোমো ইরেকটাসরা বিবর্তিত হয়ে পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে তাদের আদি স্থান আফ্রিকা থেকে। প্রকৃত সময়ে ২০ লক্ষ বছর আগে বিবর্তিত হয়ে এর পর পর তারা

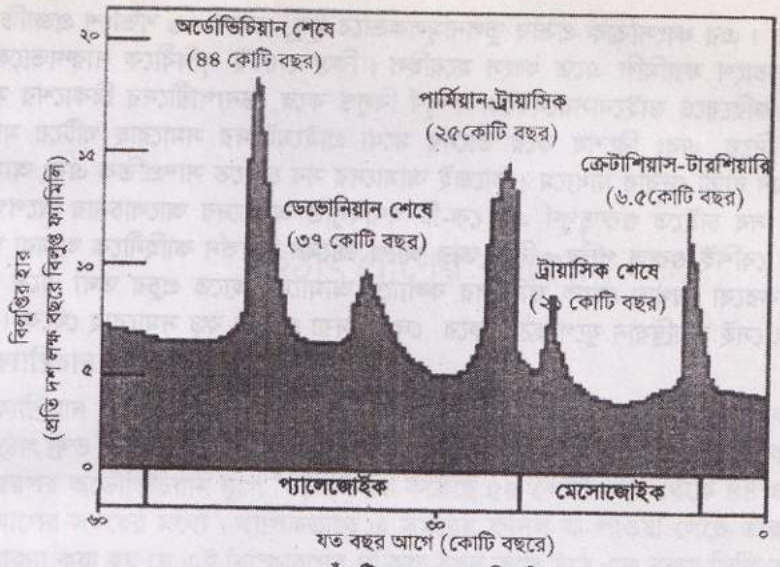
ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং জাভা মানুষ, পিকিং মানুষ, জর্জিয়া মানুষ হিসাবে আমরা তাদের ফসিল এ সব জায়গায় পেয়েছি।

এখন থেকে মাত্র সাড়ে তিন মিনিট আগে ভিন্নতর মানবপ্রজাতি থেকে আজকের মানুষের অর্থাৎ হোমো সেপিয়েন্সের আবির্ভাব হয়েছিল আর তাদের বিশ্বকে জয়ের ও বিশ্বকে আবিষ্কারের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল। প্রকৃত সময়ে সেটি প্রায় দেড় লক্ষ বছর আগের কথা। কাল্পনিক ক্যালেন্ডারে মহাবিশ্বের ৭ মাস ৭ দিনের, এবং প্রাণের ২ মাস ১ দিনের ইতিহাসে আমাদের প্রজাতির মানুষের কালটি মাত্র সাড়ে ৩ মিনিট। কিন্তু এই 'সাড়ে তিন মিনিটেই' আমরা পুরো ইতিহাসটিকে অনুসন্ধান করার মত জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি। জীব বিবর্তনের পুরো কাহিনীর মধ্যে এই সক্ষমতাটিই আমাদেরকে অনন্য করে তুলেছে। এই পর্যায়ে আমরা আমাদের এই অতি দীর্ঘ বছরটির কল্পনা ছেড়ে দিয়ে আবার প্রকৃত সময়েই সব কিছু বিবেচনা করতে শুরু করতে পারি।

কয়েকটি ভূতাত্ত্বিক যুগ ও পাঁচটি গণবিলুপ্তি

৫৫ কোটি বছর আগের ঐ হঠাৎ ফসিল বৈচিত্রের যুগটি ভূতাত্ত্বিক নামকরণ অনুযায়ী ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ। এটি এবং পরবর্তী বেশ কিছু যুগের নামকরণ এসেছে এখনকার বিশেষ বিশেষ জায়গার শিলা বৈশিষ্টের সঙ্গে ঐ যুগের প্রধান শিলা বৈশিষ্টগুলোর মিল দেখে ঐ জায়গাগুলোর নামে। আজকের ভূতাত্ত্বিক গবেষণা এবং আবিষ্কৃত ফসিল সম্পদের বিশ্লেষণ থেকে এ যুগগুলোতে পৃথিবীর আর প্রাণের পরিস্থিতি কখন কী দাঁড়িয়েছিল সে সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট জানি। ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের পর পর যে যুগটি তার নাম অর্ডোভিচিয়ান যুগ। এই দুটির জীববৈচিত্র সমারোহে যথেষ্ট মিল ছিল। অর্ডোভিচিয়ান যুগের একেবারে শেষের দিকে ৪৪ কোটি বছর আগে এসেছিল প্রথম বড় দুর্যোগ, যার ফলে ঘটেছিল আমাদের জানা প্রথম গণবিলুপ্তি। একে বলা হয় অর্ডোভিচিয়ান গণবিলুপ্তি। এমনি করে একে একে আরো চারটি গণবিলুপ্তি ঘটেছে, যার সর্বশেষটি সেই সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে। এগুলো আমরা এখানে শুধু উল্লেখমাত্র করবো, কারণ আগামী অধ্যায়গুলোতে জীব বিকাশের ইতিহাস দেখতে গিয়ে প্রধান মাইল ফলক হিসাবে এদের প্রত্যেকটির বিস্তারিত আমাদের আবার দেখতে হবে। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে বিবর্তনের অংশ হিসাবে সব সময় কিছু কিছু প্রজাতি বিলুপ্ত হচ্ছে, আবার নূতন প্রজাতি সৃষ্টিও হচ্ছে। কিন্তু আমরা গণবিলুপ্তি বলি শুধু তখনই যখন সব প্রজাতিগুলোর মধ্যে অর্ধেক বা তার বেশি অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে বিলুপ্ত হয়।

এক একটি গণবিলুপ্তি ঘটেছে– হয় মহাদেশগুলো চলাচল, বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন, ব্যাপক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদির ফলে, অথবা উল্কাপাতের মত হঠাৎ করে আসা কোন প্রাকৃতিক দূর্ঘটনায়। ৪৪ কোটি বছর আগের যে প্রথম গণবিলুপ্তির কথা উপরে বলা হলো তা তখনকার শতকরা ৮৫ ভাগ প্রজাতিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। অবশ্য জীবের বিভিন্ন ফ্যামিলি বিলুপ্ত করেছিল শতকরা ২৬ ভাগ। অর্থাৎ অন্যান্য ফ্যামিলিগুলোর অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হলেও সেগুলোর কিছু কিছু প্রজাতির বেশ কিছু সদস্য বেঁচে গিয়েছিল। এ জাতীয় গণবিলুপ্তিতে জীব জগত একটি বড় ধাক্কা খায় বটে, কিন্তু বেঁচে যাওয়া প্রজাতিগুলো থেকে তা আরো নূতন নূতন দিকে মোড় নেবার ও নূতন



পাঁচটি প্রধান গণ-বিলুপ্তি

সম্ভাবনা সৃষ্টির সুযোগও তা করে দিয়েছে।

অর্ডোভচিয়ান যুগের পরে এসেছিলো সিলুরিয়ান, এবং তারপর ডেভোনিয়ান যুগ। তখন ৩৭ কোটি বছর আগে ঘটেছিল দ্বিতীয় গণবিলুপ্তি– ডেভোনিয়ান গণবিলুপ্তি। এটিও আগেরটির প্রায় সমান ধ্বংসকারী– শতকরা ৮৩ ভাগ প্রজাতি ও ২২ ভাগ ফ্যামিলি ধ্বংস হয়েছিল। এর পরের যুগগুলো ছিল ক্রমান্বয়ে পার্মিয়ান ও ট্রায়াসিক। পার্মিয়ান আর ট্রায়াসিক যুগের সন্ধিক্ষণে ঘটেছিল সব চেয়ে ভয়াবহ গণবিলুপ্তি– পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক গণবিলুপ্তি, এখন থেকে ২৫ কোটি বছর আগে। এতে শতকরা ৯৪ ভাগ প্রজাতিই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল আর শতকরা ৫১ ভাগ ফ্যামিলি। প্রজাতি বৈচিত্রের এই হারে বিলুপ্তির পরও তার থেকে উঠে এসে আবার পৃথিবীতে নানা প্রাণির সমারোহ দেখা গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, আরো নানা রকম বিকাশের উদ্ভব হয়েছিল তখন, যার ফলে আমরা পেয়েছি ডাইনোসর, পাখি ও স্তন্যপায়ীর মত যুগান্তকারী বিবর্তন সমূহ। এরপর ট্রায়াসিক যুগের শেষের দিকে ২১ কোটি বছর আগে এসেছিল আর একটি অপেক্ষাকৃত মৃদু বিলুপ্তি– ট্রায়াসিক গণবিলুপ্তি। শতকরা ৮০ ভাগ প্রজাতি আর ২২ ভাগ ফ্যামিলি এতে বিলুপ্ত হয়েছিল। ট্রায়াসিকের পরের যুগটি জুরাসিক এবং তারপর যথাক্রমে ক্রেটাশিয়াস ও টারশিয়ারি। ট্রায়াসিক যুগে ডাইনোসরদের বৈচিত্র শুরু হলেও এরা প্রাধান্য লাভ করেছে জুরাসিক যুগে, এবং তা 'জুরাসিক পার্ক' নামের উপন্যাসটি ও জনপ্রিয় সিনেমাটির কল্যাণে আমরা অনেকে বেশ জানি। এই ডাইনোসর প্রাধান্যেরই অবসান ঘটিয়েছিল শেষ গণবিলুপ্তিটি যার কথা ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছি। ক্রেটাশিয়াস ও টারাশিয়ারি যুগের সন্ধিক্ষণে একটি বিশাল উল্কাপাতের ফলে দেখা দিয়েছিল সাড়ে ছয় কোটি বছর আগের এই গণবিলুপ্তি। এর নাম ক্রেটাশিয়াস-টারাশিয়ারি গণবিলুপ্তি, প্রায়ই উল্লেখ করতে হবে বলে আমরা এর সংক্ষিপ্ত নাম কে-টি গণবিলুপ্তিই বেশি ব্যবহার

করবো। এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব তুলনামূলকভাবে মৃদু, কারণ ৭৬ শতাংশ প্রজাতি এবং ১৬ শতাংশ ফ্যামিলি এতে ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু সেটিই পৃথিবীকে দারুণভাবে হাত বদল করিয়েছে ডাইনোসরদেরকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে, স্তন্যপায়ীদের বিকাশের সুযোগ করে দিয়ে, এবং বিশেষ করে তাদের মধ্যে প্রাইমেটদের সমারোহ ঘটিয়ে মানুষের আগমন বার্তা দেবার মাধ্যমে। কাজেই আমাদের সব চাইতে সাম্প্রতিক এবং আমাদের কাছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এই কে-টি গণবিলুপ্তি আমাদের আলোচনায় অপেক্ষাকৃত একটু বেশিই গুরুত্ব পাবে। কিন্তু তার আগে জীবের বিবর্তন কাহিনীকে আমরা আবার শুরু করবো যেখান থেকে ফসিলের কল্যাণে আমাদের হাতে প্রচুর তথ্য এসে গেছে, অর্থাৎ সেই ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে হঠাৎ করে দেখা দেয়া প্রাণের বড় সমারোহ থেকে।

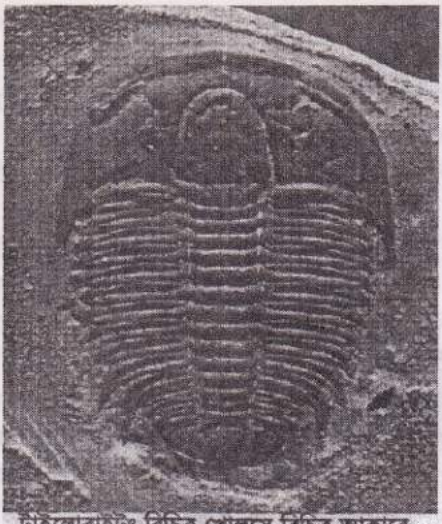
হঠাৎ প্রাণের ঝলকানি

ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ

ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ কথাটি বলা হয় ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শুরু থেকে নানা জীব প্রজাতির হঠাৎ দ্রুত বৈচিত্র লাভের বিষয়টি বুঝাতে। আসলে এই ঘটনা ক্যাম্ব্রিয়ান থেকে শুরু হয়ে এরপর অর্ডোভিচিয়ান যুগে বিস্তৃতি লাভ করেছে ৫৫ কোটি বছর থেকে ৪৪ কোটি বছর আগের সময়ের মধ্যে। ব্যাপকভাবে এ সময়ের ফসিল যা পাওয়া গেছে তার বিশ্লেষণে ধারণা করা হয় যে এই বিস্ফোরণের প্রক্রিয়া যখন তুঙ্গে উঠে এক রকম স্থিতি অবস্থা লাভ করেছে– তখন প্রজাতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২০-২৫ কোটিতে। এমন সমারোহ পরে আর কখনো দেখা যায়নি। এতে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রাণি জগতের শ্রেণি বিভাজনে যাকে অর্ডার বলা হয় তার বড় বৈচিত্র এ সময় দেখা দিয়েছিল। শ্রেণি বিভাজনে অর্ডারের বৈশিষ্ট হলো একই অর্ডারের প্রাণির সাধারণভাবে একই দেহ-ডিজাইন হয়ে থাকে। যেমন কাঁকড়া গোষ্ঠির সব প্রজাতির একই অর্ডার– এবং আমরা



ক্যাম্ব্রিয়ান-অর্ডোভিচিয়ান যুগের সমুদ্রে
(৫৫-৪৪ কোটি বছর আগে)



ট্রাইলোবাইটঃ বিচিত্র খোলসে বিচিত্র আকারে
(আধ মিলিমিটার থেকে আধ মিটার)

তাদের দেহ-ডিজাইন দেখেই তা বুঝতে পারি। এর ভেতর অবশ্য বহু ফ্যামিলি, বহু গণ এবং বহু প্রজাতি রয়েছে যেগুলোর দেহ অবয়ব দেখে আলাদা করা কখনো কখনো অপেক্ষাকৃত কঠিন। আজ থেকে ৬০ কোটি বছর আগে জীব জগতে অর্ডার ছিল মাত্র গুটি কতেক। অথচ এই ৪৫ কোটি বছরে এসে হঠাৎ করেই যেন এদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫০টিতে। এ পর্যন্ত আর কোন সময় জীবের দেহ গঠনে বৈচিত্রের এরকম উল্লম্ফন দেখা যায়নি। এসবের মধ্যে যে বৈশিষ্ট বিশেষভাবে দেখা গেছে তা হলো এসব জলজ প্রাণির শক্ত খোলস যার অনেকগুলোই রীতিমত বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্রের মত। এর মধ্যে রয়েছে ভেদ করার মত তীক্ষ্ণ তুরপুনের মত, নখরের মত, সাঁড়াশির মত, ইত্যাদি। তাছাড়া ধারালো অথবা পেষণে সক্ষম নানা অংশ সহ বিচিত্র মুখও তাদের ছিল। আধ সেন্টিমিটার থেকে আধ মিটার পর্যন্ত নানা আকারের ও নানা ডিজাইনের ট্রাইলোবাইট নামের প্রাণি ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের বড় বৈশিষ্ট। এগুলো সব উকুনের আকৃতির খোলসযুক্ত বহু প্রজাতির প্রাণি। তাছাড়া প্রায় ৪০০ ফ্যামিলির যে অসংখ্য প্রজাতির প্রাণি সেই যুগের সমুদ্রে দেখা দিয়েছিল তাতে শামুক-ঝিনুক টাইপ, বৃশ্চিক টাইপ, স্পঞ্জ, প্রবাল ইত্যাদি বিভিন্ন রকম ছিল। প্রবালের দেহ সমন্বয়ে প্রবাল দ্বীপ বা প্রাচীর গড়ে উঠার নমুনা তখন থেকেই দেখা যায়। এ সময় নানা প্রাণির মধ্যে পরিবেশ থেকে খনিজ পদার্থ আত্মীকরণের ক্ষমতা দেখা যায়। এর মধ্যে বেশি দেখা যায় ক্যালশিয়াম কার্বনেট বা ক্যালশিয়াম ফসফেট গ্রহণ করে তা দেহে অঙ্গীভূত করে খোলস গড়তে। এগুলো হয়ে পড়লো দেহের পাথুরে অংশ, প্রধানত চূনা পাথরে গড়া। অন্য কিছু ক্ষেত্রে মাটি-বালি জাতীয় সিলিকাকেও এভাবে আত্মীকরণ করতে দেখা গেছে যেমন- নানা প্রোটিষ্ট ও স্পঞ্জে। এমনকি মুখের ধারালো কোন কোন অংশে আত্মীকৃত লৌহ অক্সাইডও দেখা গেছে, রীতিমত লোহার ছুরির মত।

বিস্ফোরণ কেন ?

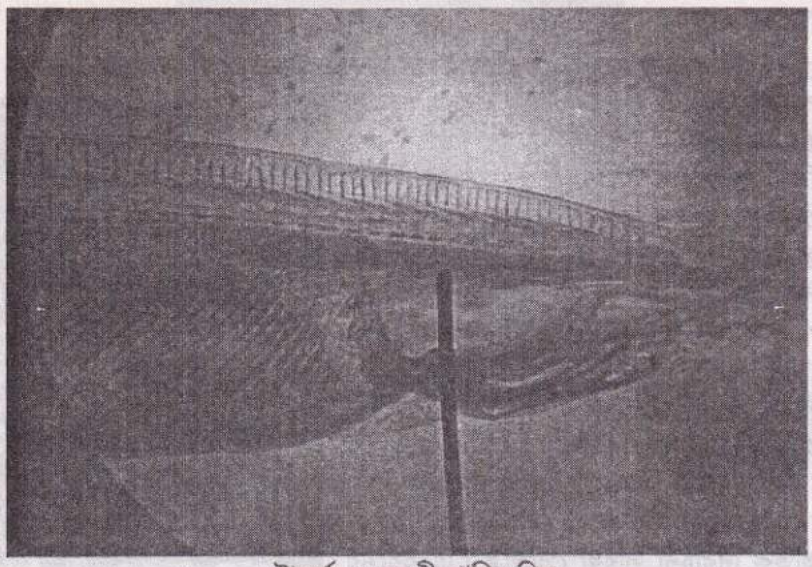
আধুনিক বিজ্ঞানীরা অবশ্য ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের হঠাৎ ফসিল বৈচিত্রকে মৌলিক অর্থে বিস্ফোরণ বলতেই নারাজ। এখন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে প্রাণির এই ব্যাপক বিচ্ছুরণ হঠাৎ করে হয়নি। ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের বহু আগে থেকেই বৈচিত্র সৃষ্টি হচ্ছিল যাকে বলা যায় প্রস্তুতি পর্ব। কিন্তু সে যুগের প্রাণিগুলো ছিল নরোমদেহী যারা ফসিল রেখে যাওয়ার উপযুক্ত ছিলনা। ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে এসে শক্ত খোলসের প্রাণি বিকশিত হলে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়– তাই ঐ সময়কার ফসিলের প্রাচুর্য দেখা যায়। এ সময় বিবর্তনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। Hox জিনের মত নিয়ন্ত্রণকারী জিনের সৃষ্টি হয় হয়তো কোন কোন দৈবাৎ মিউটেশনের ফলে, যা বিশেষ প্রাকৃতিক নির্বাচনী সুবিধা পেয়েছে। এ ধরনের জিন নিয়ম করে বিশেষ বিশেষ রকম দেহ গঠনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে– শরীরের কোন অংশে কী হবে তা নির্দিষ্ট করে দিয়ে। প্রথম দিকে এই নিয়ন্ত্রণ ছিল ঢিলে ঢালা- তাই নিয়মের মধ্যে ও বহু বৈচিত্র সৃষ্টির সুযোগ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি বিবর্তিত হয়ে কড়াকড়ি বেড়েছে। তাই ক্যাম্ব্রিয়ান বা তারপর অর্ডোভিচিয়ান যুগে হঠাৎ করে বহু দেহ-ডিজাইনের বহু অর্ডার সৃষ্টি হলেও, পরে অর্ডারের এই বৈচিত্র আর বাড়তে পারেনি। এর পর কতগুলো নির্দিষ্ট অর্ডারের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু খাতের ভেতর দিয়েই শুধু দেহ ডিজাইন বৈচিত্র ঘটতে পেরেছিল। ফসিল বৈচিত্র দেখে ঐ সময়ের জীব- বৈচিত্র যে অনেকটা বিস্ফোরণের রূপে এসেছিল বলে মনে হচ্ছে, তা কিন্তু পরে থাকেনি- এটিই তার কারণ।



জীবের খনিজ আত্মীকরণঃ ক্যাম্ব্রিয়ান-অর্ডোভিচিয়ান ফসিল বৈচিত্র (৫৫-৪৪ কোটি বছর)

অর্ডোভিচিয়ান বিলুপ্তি

অর্ডোভিচিয়ান যুগের শেষের দিকে এসে বড় ধরনের যে অভিনবত্ব প্রাণি জগতে এলো তা হলো আভ্যন্তরীন মেরুদণ্ড সৃষ্টি। দেহের ভেতর হাড় ও মেরুদণ্ড অপেক্ষাকৃত বড় শরীরকে ধারণ করতে সক্ষম হলো। এ কারণে এটি ছিল একটি বড় রকমের বিকাশ। এরা প্রাণির শ্রেণী বিভাজনে নূতন একটি ফাইলাম নিয়ে এলো। মূল স্নায়ুর সঙ্গে ছোট দন্ডের মত নটোকর্ড নামক অংশ দিয়ে এর আভাস মিলে বলে এই ফাইলামকে কর্ডাটা বলা হয়। অর্ডোভিচিয়ানে এটি সবেমাত্র দেখা দিয়েছিল মাত্র। এর পূর্ণ বিকাশ ঘটে পরে সিলুরিয়ান যুগে প্রধানত মাছের সৃষ্টি ও বিচ্ছুরণের মাধ্যমে। বিচিত্র মাছের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল মেরুদণ্ডী প্রাণির প্রথম সার্থক প্রকাশ– যা সুযোগ করে দিয়েছে আরো বড় বড় সব বিবর্তনগত উল্লম্ফনের। কিন্তু ঐসময়েই জীব জগতকে ধাক্কা সামাল দিতে হয়েছে



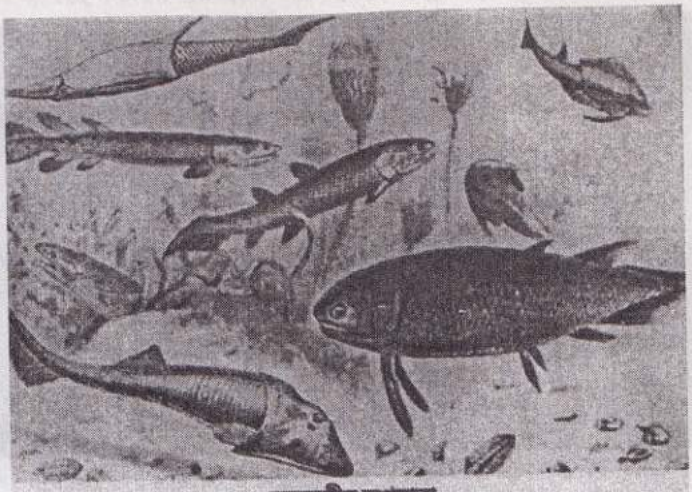
নটোকর্ডঃ মেরুদণ্ডী প্রাণির চিহ্ন

তার প্রথম প্রমাণিত গণবিলুপ্তি অর্ডোভিচিয়ান গণবিলুপ্তির, ৪৪ কোটি বছর আগে।

আধুনিক গবেষকরা মনে করেন এই বিলুপ্তি দুটি পর্যায়ে ঘটেছিল। প্রথম পর্যায়ের মূলে ছিল মহাদেশগুলোর চলাচল। এই চলাচলের কারণে সে সময় উত্তরে লরেশিয়া আরো ঘন সংবদ্ধ হয়েছিল। এর ফাঁকে ফাঁকে যে সাগর, খাঁড়ি, প্রণালী ইত্যাদি ছিল স্থল ভূখণ্ডগুলো আরো আঁটসাট হয়ে জড়ো হয়ে সেগুলো বিলুপ্ত হয়েছে। এর একটি ফল হলো প্রজাতি বৈচিত্রের জন্য প্রয়োজনীয় ভূবনের সংখ্যা কমে গিয়ে বহু প্রজাতির উপর বিলুপ্তির চাপ সৃষ্টি করেছে। গণবিলুপ্তির দ্বিতীয় পর্যায়ের কারণ দক্ষিণে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অবস্থান তখন মেরু অঞ্চলের কাছে চলে যাওয়া। এর ফলে সেখানে তখন চরম শৈত্য দেখা দিয়েছে। বিশ্ব উষ্ণতা কমে গিয়ে সে সময় আজকের ভূ-পৃষ্ঠ উষ্ণায়নের উল্টো একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল– যাতে সাগর পৃষ্ঠও নিচে নেমে গিয়েছিল। ভূবন বিনষ্টি ও তখনকার জলজ-জীব-সর্বস্ব জীব বৈচিত্রের প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার এটিও একটি কারণ ছিল। ৪৪ কোটি বছর আগে ঐ সময়টায় গিয়ে কেন যে গণহারে প্রায় ৮৫ শতাংশ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেল, ক্যাম্ব্রিয়ানের সেই প্রাণের ঝলকানি সাময়িকভাবে হলেও ম্রিয়মান হয়ে গেল, তার পুরো হদিশ অবশ্য এখনো খুব স্পষ্টভাবে পাওয়া যাচ্ছে না।

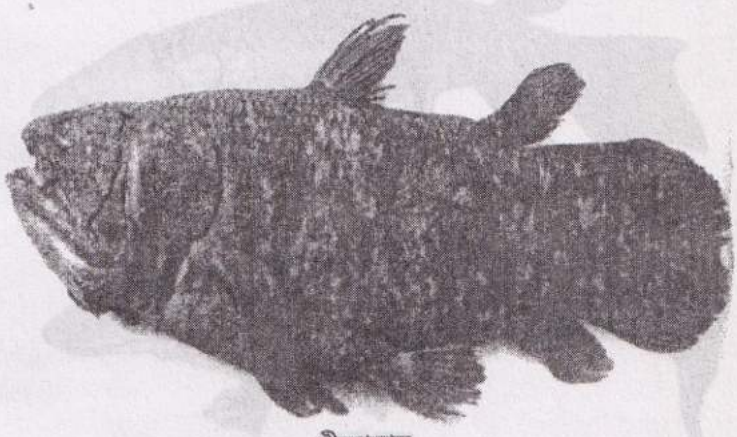
বিপর্যয়ের পর মাছের মেলা

গণবিলুপ্তির বিপর্যয়ের ধাক্কা কেটে উঠতে শুরু করেছিল পরবর্তী সিলুরিয়ান যুগের সূচনায় এবং তার বড় ফলশ্রুতিটি এসেছে সিলুরিয়ান আর তার পরের ডেভোনিয়ান যুগের মাছ বৈচিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে। এসময় গণ্ডোয়ানাল্যান্ড ক্রমে দক্ষিণ মেরু অঞ্চল থেকে উত্তর দিকে সরে এসে লরেশিয়ার কাছে এসেছে। শৈত্য যুগ কেটে গিয়ে ভূপৃষ্ঠ উষ্ণ হয়েছে, সমুদ্র জলের উচ্চতা বেড়েছে। ফলে উপকূল অঞ্চলে দেখা দিয়েছে প্রচুর লেগুন, বদ্বীপের



মেরুদণ্ডীর অগ্রযাত্রা
সিলুরিয়ান-ডেভোনিয়ান মাছ বৈচিত্র (৪৪-৩৬ কোটি বছর আগে)
সেক্যালের অনেক মাছই চোয়ালবিহীন

খাঁড়ি, এবং বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল। অগভীর এসব জলরাশিতে এক এক জায়গায় এক এক পরিবেশ, এক এক রকম ক্ষুদ্র জীববৈচিত্র, এক এক রকম লবণাক্ততা। এসব সৃষ্টি করলো মাছের জন্য শত শত বিভিন্ন রকম ভূবন, যাতে মাছের প্রজাতি বৈচিত্র দেখা দেয়ার সুবিধা হলো। সে সময় তাই দেখা দিয়েছিল মাছের ১৫টি মৌলিক শ্রেণি– যার মধ্যে বর্তমানে মাত্র পাঁচটি অবশিষ্ট রয়েছে। প্রথমে দেখা দিয়েছিল চোয়ালবিহীন মাছ। তারপর চোয়ালযুক্তদের মধ্যে আজকের হাঙ্গর প্রাণির পূর্বসূরিরা– হাড়সদৃশ কার্টিলেজে যাদের কাঠামো গড়া, হাড়ে নয়। পরে হাড়বিশিষ্ট মাছের দলই প্রধান হয়ে উঠেছে। ওদের আবার দুটি দল দেখা ছিল– একটি রশ্মির মত ছড়িয়ে পড়া পাখনা বিশিষ্ট মাছ–



সীলোকান্থ
মাংসল-পাখনা মাছের 'জীবন্ত ফসিল'



সীলোকান্তের ফসিলঃ মাংসল-পাখনা মাছ
১৪ কোটি বছর আগের

আজকে প্রায় সব মাছ যে দলে পড়ে। অন্যটি হলো পিণ্ডাকৃতি পাখনা বিশিষ্ট মাছ। এদের পাখনা বেরিয়ে এসেছে মাংসল পিণ্ডের আকারে, আমাদের পরিচিত পাতলা ছড়ানো পাখনার মত করে নয়। ডেভোনিয়ান যুগে এরকম পিণ্ডাকৃতি পাখনার মাছের বহু বৈচিত্র ছিল, কিন্তু কালক্রমে এ বৈচিত্র কমে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে বলে মনে করা হতো। ১৯৩৮ সনে কীভাবে এরকম মাছ সীলোকান্ত জীবন্ত পাওয়া গিয়ে এ ভুল ভেঙ্গেছে সেটি এর আগে বলা হয়েছে। কিন্তু সেই ডেভোনিয়ান যুগে এরকম মাছের কোন কোন শাখা বির্বতনের দিক থেকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এদের থেকেই উদ্ভূত হয়েছে চার পায়ে হাঁটা প্রাণি। চারটি পিণ্ডাকৃতি পাখনা ক্রমে পায়ে পরিণত হয়েই



মাংসল-পাখনা মাছ



প্রথম উভচর

মাংসল-পাখনা মাছ থেকেই চার-অঙ্গী সব প্রাণির উদ্ভব

এটি সম্ভব হয়েছে। চারপেয়ে প্রাণি পানি থেকে উঠে এসে স্থল জয় করেছে প্রথমে উভচর হিসাবে, তারপর সরীসৃপ স্তন্যপায়ী ইত্যাদি সব সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়ে। এভাবে বিবর্তনকে আজকের দিনের পথে এগিয়ে নিতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল ৩৬ কোটি বছর আগে নাগাদ পিণ্ডাকৃতি পাখনার মাছ।

সাধারণভাবে সব মাছের ক্ষেত্রে যা হয়, ঐ মাছের মধ্যেও চারটি পিণ্ডাকৃতি পাখনার সামনের দুটিই অধিক শক্তিশালী ছিল। কিন্তু চারপেয়ে প্রাণির মধ্যে বরাবর পেছনের পা দুটিকেই অধিক শক্তিশালী দেখা যায়। প্রথম যুগের চারপেয়েদের ফসিলেও পেছনের পা'কেই অধিক সুগঠিত দেখা যায়। পিণ্ডাকৃতি পাখনা মাছ থেকে শুরু করে কার্যকর উভচর পর্যন্ত সদৃশ প্রাণিগুলোর ফসিল পরম্পরায় লক্ষ্য করলে এরকম বিবর্তনের স্পষ্ট স্বাক্ষর দেখা যায়। এর মধ্যে এক পর্যায়ে কোন ভাবে জোরটি সামনের অঙ্গ থেকে পেছনের অঙ্গে চলে গিয়েছিল।

উভচর প্রাণি অবশ্য চট্ করেই তেমন বিস্তৃতি পায়নি। ডেভোনিয়ান যুগের শেষের দিকের তার অল্প কিছু ফসিল পাওয়া গেলেও এরপর দু'কোটি বছরের মত কালের তার ফসিল আর পাওয়া যায়নি। তারপর থেকে অবশ্য এদের প্রাচুর্য ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়েছে– জল থেকে স্থলের দিকে এগিয়েছে জীব বিবর্তন।

অবশেষে স্থলে জীব

স্থলে জীবের চ্যালেঞ্জগুলো

জীবের উন্মেষ হয়েছে পানিতে। তারপর থেকে তার অস্তিত্বের একটানা সময় পানিতেই জীবের বিকাশ ঘটেছে। এই দীর্ঘ সময় স্থলভাগ প্রাণের অনুকূল ছিলনা। এখানে জীবের জন্য বেশ কিছু সমস্যা ছিল। সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি জীবের জন্য মারাত্মক। এ কারণেই আমাদের কাছে অনুজীব ধ্বংসের যে সব পদ্ধতি হয়েছে তার একটি হলো আলট্রাভায়োলেট রশ্মি বিকিরণ। সূর্যের আলোতে আলট্রাভায়োলেটের উপস্থিতিটি বেশ তীব্র। আমরা এর থেকে নিরাপদে আছি তার কারণ আমাদের বায়ুমণ্ডলে এখন ওজোন গ্যাসের একটি নিরাপত্তা আবরণ রয়ে গেছে যা সূর্যের আলট্রাভায়োলেট অধিকাংশই শোষণ করে। কিন্তু অতীতে এই ওজোন আবরণ ছিলনা। তবে পানিও আলট্রাভায়োলেট শোষণ করে। এ কারণে অতীতে একমাত্র পানিতেই জীব বেঁচে থাকতে পেরেছে, ওজোন আবরণের অনুপস্থিতিতে স্থলে সেটি সম্ভব ছিলনা।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রথমদিকে দীর্ঘদিন মুক্ত অক্সিজেন যে ছিল না তা আমরা দেখেছি। পরে ধীরে ধীরে এরকম অক্সিজেন বাতাসে বেড়েছে। ওজোন গ্যাসও অক্সিজেন পরমাণুতে গড়া। অক্সিজেন গ্যাস অণু যেখানে দুটি অক্সিজেন পরমাণুতে গড়া, ওজোন অণু গড়া তিনটি অক্সিজেন পরমাণুতে। অক্সিজেনের অভাবেই তাই অতীতে বায়ুমণ্ডলে ওজোন আবরণ গঠিত হতে পারেনি অনেক দিন।

স্থলে জীবের আর একটি সমস্যা ছিল দেহ শুকিয়ে যাওয়া। দেহকোষে পর্যাপ্ত পানি না থাকলে জীব বাঁচতে পারেনা। পানির মধ্যে ডুবে থাকলে শুকিয়ে যাওয়ার ভয় নাই। স্থলে এ সমস্যার সমাধান করতে তাকে ঘন ঘন পানি গ্রহণের ব্যবস্থাই শুধু করতে হয়নি, এ পানি শরীরে ধরে রাখার জন্য ওয়াটারপ্রুফ ত্বক সৃষ্টি করতে হয়েছে যার মধ্য দিয়ে দ্রুত পানি হাওয়া হয়ে যেতে পারবেনা। সেটি না করতে পারা পর্যন্ত তাই জীবের স্থলবাস সম্ভব হয়নি। এমনকি পানি থেকে উভচর প্রাণিরা যখন স্থলে আসা অভ্যাস করেছে তখনো তারা পানির কাছে থেকেছে ঘন ঘন পানিতে যেতে পারার জন্য, এবং পানিতে ডিম দেবার জন্য। ওদের বাচ্চা পানিতেই জন্মে সেখানেই বড় হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত না ডিমের ভেতরেই বাচ্চার জন্য পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে ততদিন স্থলে ডিম দেয়া ও বাচ্চা ফুটানো সম্ভব হয়ে উঠেনি। শক্ত খোলসের মধ্যে পানি ধারণক্ষম ডিমের বিবর্তনের মাধ্যমে সরীসৃপ ও পাখিরা পরে সেই ব্যবস্থা করেছে। স্তন্যপায়ীরাতো একেবারে মায়ের গর্ভেই পানির মধ্যে ভ্রূণ থেকে সন্তান বড় করার ব্যবস্থা করেছে।



প্রথম উভচর উপকূলে ওঠে এসেছিলো সিলুরিয়ান-ভেভোনিয়ান

পানির গুরুত্ব সম্পর্কে একটি তত্ত্ব হলো নরোম খোসার ডিমকে ভিজিয়ে রাখার প্রয়োজনেই প্রথম দুধের সৃষ্টি হয়েছিল। অন্য দিকে কেঁচোর মত কীট এবং শিকড়যুক্ত উদ্ভিদ পানির সমস্যার সমাধান করেছে আর্দ্র মাটির খুবই সান্নিধ্যে থেকে।

অক্সিজেন নির্ভর হয়ে উঠার পর থেকে জীবের আর একটি অপরিহার্য জৈবিক কাজ অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বিনিময়। পানির সরাসরি সংস্পর্শে যথেষ্ট তল থাকলে সরাসরি পানি থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেন নিয়ে সেখানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করা যায়। স্থলে বাতাস থেকে এটি করতে হলে ফুসফুস বা অনুরূপ কোন ব্যবস্থা প্রয়োজন। ফুসফুসের অভ্যন্তরে প্রচুর তল সৃষ্টি করা হয় যেখানে বাতাসের সঙ্গে এই গ্যাস বিনিময় চলতে পারে। এরকম ব্যবস্থা বিবর্তিত হবার আগে স্থলে বাস সম্ভব ছিল না। ছোট পোকা-মাকড়ে অবশ্য ত্বকে ট্র্যাকিয়া নামের ব্যবস্থা বা অন্য রকম ছিদ্র পথে একই কাজ করা হয়। এক্ষেত্রে বড় প্রাণি বা উদ্ভিদের একটি উভয়-সংকট থাকে। গ্যাস বিনিময়ের জন্য ত্বককে সছিদ্র রাখলে এর মাধ্যমে সহজে পানি হারিয়ে ফেলার ভয় থাকে। আবার পানি সংরক্ষণের জন্য ত্বককে ওয়াটারপ্রুফ করলে, গ্যাস বিনিময় না করতে পারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাবার ভয় থাকে। ফুসফুসের আভ্যন্তরীন গ্যাস বিনিময়ে অনেক প্রাণিতে এ সমস্যার সমাধান হয়েছে। আর উদ্ভিদে এর সমাধান হয়েছে পাতায় স্টোমাটা নামক ছোট ছোট কপাটের ব্যবস্থা করে, যা প্রয়োজনে খোলাবাঁধা করা যায়।

স্থলে জীবের আরো কিছু সমস্যা রয়েছে। যেমন দেহের বর্জ্য নিষ্কাশনের সমস্যা। পানির জীব খুব কম শক্তি ব্যয়ে এটি করতে পারে। এর কারণ পানিতে বিবর্তিত জীবগুলোর দেহবর্জ্য এসেছে প্রধানত এমোনিয়া রূপে। এটি দেহের জন্য বেশি বিষাক্ত বটে কিন্তু এটি তৈরিতে শক্তি কম লাগে। পানিতে থাকা জীব এই দ্রবণশীল বর্জ্য অনবরত পানিতে ধুয়ে দিতে পারে বলে বিষাক্ত হলেও বর্জ্যকে এই রূপে তৈরিই তার জন্য সুবিধাজনক। অন্যদিকে স্থলের প্রাণির এভাবে অনবরত ধুয়ে নিষ্কাশনের সুবিধা নাই বলে তাকে কম বিষাক্ত বর্জ্য তৈরি করতে হয়– ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ইত্যাদি রূপে, যা মলমূত্র রূপে মাঝে মাঝে ত্যাগ করলেই চলে, বাকি সময় শরীরেই রাখা যায়। এর অসুবিধা হলো

এরকম জটিল বর্জ্য তৈরি করতে শক্তি প্রয়োজন হয় বেশি। অর্থাৎ দেহের বর্জ্য নিষ্কাশনে স্থলের জীবকে অধিক শক্তি ব্যয় করতে হয়। এর জন্য শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে অধিক দক্ষ হয়ে উঠতে হয়েছে।

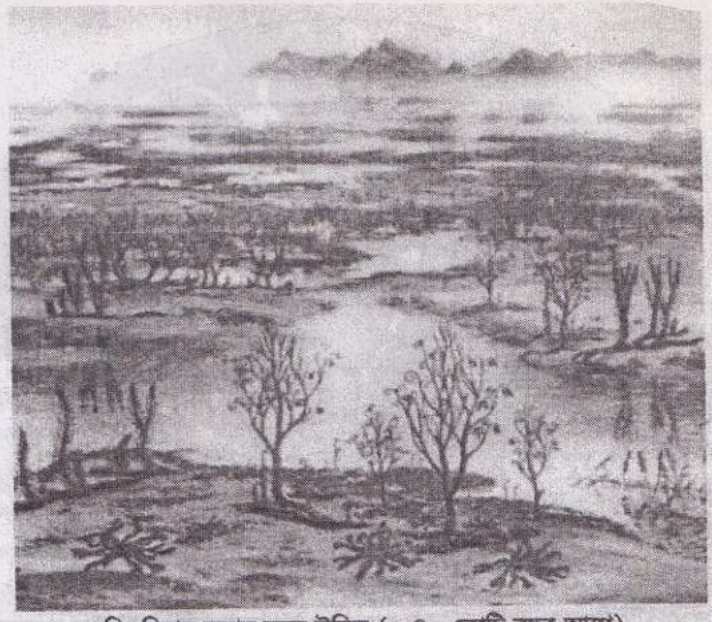
নিজের দেহভার বহন করাও স্থলের জীবের একটি সমস্যা– বিশেষ করে দেহ যদি বেশি বড় ও ভারি হয়। পানিতে ভার বহনের অনেক- খানি কাজ জীব পানির উপরেই ছেড়ে দিতে পারে, পানির প্লবতার গুণের উপর। স্থলের প্রাণিকে তার দেহভার বহন করতে হয় প্রধানত নিজের হাড়ের উপর। দেহভার আয়তনের সঙ্গে সমানুপাতিক আর আয়তন বাড়ে দৈর্ঘের কিউবের (ঘন) হিসাবে। অন্যদিকে হাড়ের দৃঢ়তা বাড়ে কিন্তু দৈর্ঘের বর্গ হিসাবে। কাজেই দেহ যত বড় হবে সেটি বহন করার জন্য হাড়কে তত বেশি বেশি হারে মোটা হতে হবে– যা এক পর্যায়ে অসম্ভবের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে। এজন্য স্থলের প্রাণি কত বড় হতে পারে তার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পানির সব চেয়ে বড় প্রাণি নীল তিমি তাই স্থলের বড় প্রাণি হাতির থেকে অনায়াসে ২০ গুণ বড় হতে পারে।

যথেষ্ট খাদ্য যোগাড় করা স্থলের প্রাণির জন্য বেশ কষ্টকর, বিশেষ করে বড় প্রাণির ক্ষেত্রে। পানিতে এটি তুলনামূলকভাবে সহজ– খাদ্য পানিতেই চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে অল্প নড়াচড়া করে জলজ প্রাণির অনেকেই সেখানে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। এমনকি একশ্রেণীর তিমির মত বিশাল প্রাণিও শুধু হা করে থাকলেই প্রয়োজনীয় খাদ্য তার মুখে ঢুকে পড়ে একটি জালের ভেতর দিয়ে– যে কারণে এরকম জলজ প্রাণিকে ফিল্টার ফীডার বলা হয়। এত সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই কিন্তু স্থলে জীব এসেছে, এবং এখানেই এটি অধিকতর বিকশিত হয়েছে।

স্থলে উদ্ভিদের উদ্ভব

সিলুরিয়ান যুগে উদ্ভিদের উদ্ভব হয়েছিল, এবং তা হয়েছিল স্থলে – প্রায় ৪২ কোটি বছর আগে। অবাক ব্যাপার হলো জীব জগতের উচ্চতম শ্রেণিভাগে যে ক'টা কিংডম (জগত) আছে তাদের মধ্যে সর্বশেষ উদ্ভব হয়েছে উদ্ভিদ জগত। প্রাণি, আলজি, ছত্রাক (ফাঙ্গাস)– এসব কিংডম বহু আগেই দেখা দিয়েছে, ইতোমধ্যে বহু রূপে বিবর্তিত হয়েছে, তার পরেই এসেছে উদ্ভিদ, অন্যগুলোর মত যার শুরুটা পানিতে হয়নি। তবে উদ্ভিদেরও শুরু স্থলের ভেজা জায়গায় হয়েছে– পানির কিনারায়। প্রথমে আলজি স্থলে এসেছে আর্দ্র ভূমিতে পিচ্ছিল জীব হিসেবে– যেমন এখনো পুকুর পাড়ের পাথরে শ্যাওলার মত দেখা যায়। এগুলো থেকেই বিবর্তিত হয়েছে আদি উদ্ভিদ। শুরুতে এসেছে দুইএক সেন্টিমিটার উঁচু ক্ষুদ্র উদ্ভিদ, তারপর আরো বিচিত্র, আরো বড়। ক্রমে অনেকগুলো গাছের আকার ও রূপ নিয়েছে। সে যুগে উদ্ভিদ মাত্রই ছিল অপুষ্পক উদ্ভিদ– ফার্ন, মস ইত্যাদি। বড় গাছের রূপ যারা নিয়েছিল তারাও ছিল এরকম অপুষ্পক উদ্ভিদ– বৃক্ষ-ফার্ন, ক্লাব মস, হর্সটেইল ইত্যাদি নামের গাছ। সে যুগের মত প্রকাণ্ড না হলেও বড় বৃক্ষ ফার্ন ইত্যাদি রূপে এদের উত্তরসূরিরা এখনো আছে, কোন কোনটি আমাদের দেশের বনাঞ্চলেও রয়েছে।

স্থলে বৃক্ষের বিস্তার ও উদ্ভিদের নানা বৈচিত্র এখানে এক নূতন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।



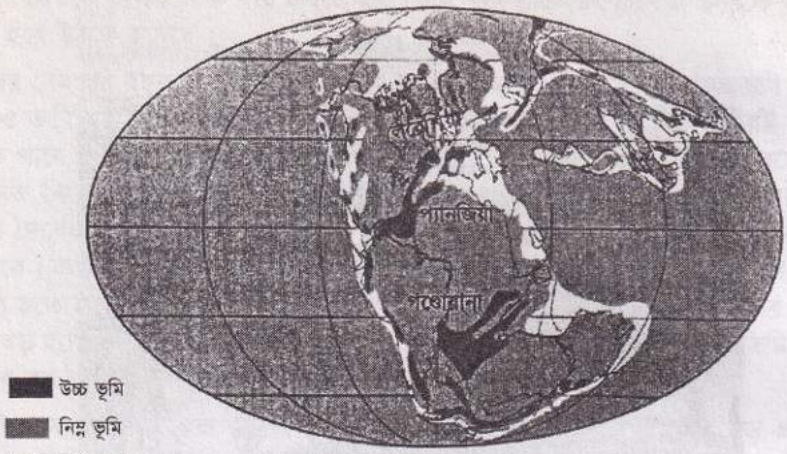
সিলুরিয়ান যুগের স্থলে উদ্ভিদ (~ ৪০ কোটি বছর আগে)
ব্যাকটেরিয়া, আলগি, ফাঙ্গাস, প্রাণি ও উদ্ভিদের মধ্যে উদ্ভিদের শুরুই সবার পরে

বৃক্ষের গঠন মজবুত, অনেক ক্ষেত্রে প্রকাণ্ড। এদের সৃষ্টি করা নানা ভূবনের কারণে জীবের জন্য ভূবন বৈচিত্র স্থলভাগে জলভাগের চেয়ে বেশি। কাজেই তাদেরকে আশ্রয় করে স্থলে প্রজাতি বিচ্ছুরণ ঘটতে দেরী হয়নি। পানিতে ক্ষুদ্র সালোক সংশ্লেষণকারী প্ল্যাংকটন কাজ করে প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদক হিসাবে। আর স্থলে এই প্রাথমিক উৎপাদক হলো সব উদ্ভিদ– প্রকাণ্ড বৃক্ষ সহ। এমন উৎপাদন বড় ধরনের জীববৈচিত্রকে পোষণ করতে সক্ষম। শিগ্‌গির স্থলে গড়ে ওঠা বিস্তীর্ণ ঘন বন এমনি জীব-বৈচিত্র গড়ে তুলেছিল, যেখান থেকে বিবর্তিত হয়েছে পরবর্তী কালের অভাবনীয় সব সম্ভাবনাময় ধারা।

ডেভোনিয়ান গণবিলুপ্তি

জীবের স্থল জয়ের মত এমন চমকপ্রদ সাফল্যের মধ্যেও কিন্তু পরবর্তী গণবিলুপ্তি এসেছিল প্রাকৃতিক দৈব দুর্বিপাকে। ৩৭ কোটি বছর আগের এই দ্বিতীয় গণবিলুপ্তিকে ডেভোনিয়ান গণবিলুপ্তি বলা হয়। যদিও এ সময় স্থলে জলে জীব ছিল, বিলুপ্তি প্রধানত ঘটেছিল সামুদ্রিক জীবে। ওদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল প্রবাল, স্পঞ্জ ইত্যাদি ধরনের জীব যারা দলবদ্ধভাবে তাদের দেহ থেকে দ্বীপ, প্রাচীর ইত্যাদি সমুদ্র তলে গড়ে তুলছিল। তাছাড়া কিছু কিছু প্রাচীন ধাঁচের মাছের প্রজাতিও বিলুপ্ত হয়েছিল এতে।

অন্যদিকে স্থলের উদ্ভিদ আর প্রাণিতে বড় রকমের বিলুপ্তি এসময় দেখা যায়নি। এই গণবিলুপ্তির কিছু ধরন থেকে মনে করা হচ্ছিল যে এর প্রধান কারণ বিধ্বংসী কোন উল্কাপাত। কিন্তু সরাসরি এর কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু ২০০১ সালে পশ্চিম



ডেভোনিয়ান বিলুপ্তির ঠিক আগে (~ ৩৬ কোটি বছর আগে)
গণ্ডোয়ানা ও লরোশিয়া একত্র হয়ে প্যানজিয়া তৈরি হচ্ছিল

অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশাল প্রাচীন উল্কাপাত জনিত খাদকে চিহ্নিত করা হয়েছে ঐ উল্কার পতনস্থল হিসেবে। নানা রকম আলামত এর দিকে নির্দেশ করলেও এই ব্যাপারে খুব বেশি নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছেনা। তা ছাড়া স্থলে উদ্ভিদ তেমন বিলুপ্ত না হওয়াটি এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে যায়– ওরকম বিধ্বংসী উল্কাপাতে, এর প্রচণ্ড শক্-তরঙ্গে, সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ডে অনেক উদ্ভিদ বিলুপ্তি স্বাভাবিক ছিল। এজন্য মনে করা হচ্ছে যে উল্কাপাতটির বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া এত বেশি ছিলনা। আসলে বিলুপ্তিটি বেশ কিছু সময় ধরে পর পর কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফল, একা ঐ উল্কাপাতের নয়। তার মধ্যে কতগুলোর কারণ হতে পারে এ সময় গণ্ডোয়ানাল্যান্ড ও লরেশিয়া পরস্পরের কাছে এসে প্রায় একীভূত হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া। এর ফলে সমুদ্রস্রোতে ও জলবায়ুতে বড় পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল যেগুলো বিশেষ করে জলজ প্রাণির উপর খুবই প্রতিকূল প্রভাব রেখেছিল।

বনের যুগে জীববৈচিত্র

পুরো পৃথিবীর একটি অখণ্ড স্থলভাগ

ডেভোনিয়ান গণবিলুপ্তির কালে লরেশিয়া আর গণ্ডোয়ানাল্যান্ড একীভূত হওয়ার যে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল তা শেষ হয়েছে পরবর্তী যুগ কার্বনিফেরাসে। কার্বনিফেরাস নামটি কিছুটা ব্যতিক্রমী, কারণ এটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে এই যুগ পৃথিবীর আদি বনের যুগ যখন অপুষ্পক বৃক্ষের ঘন সমারোহ দেখা দিয়েছিল। পরে সেই বৃক্ষ থেকে কার্বন ভূগর্ভে রূপান্তরিত হয়ে আজকের পীট ও কয়লার প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে। এই কারণেই এ যুগের নাম কার্বনিফেরাস। এর পরের যুগ পার্মিয়ানের সঙ্গে একত্রে এটি ৩৬ কোটি থেকে ২৫ কোটি বছর আগে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে সমৃদ্ধ জীব-বৈচিত্র রচনা করেছিল।

এ সবের পেছনে বড় অবদান রেখেছে লরেশিয়া আর গণ্ডোয়ানাল্যান্ডের সম্পূর্ণ একীভূত হওয়ার মাধ্যমে একটি মাত্র মহা-মহাদেশ প্যানজিয়া গঠন। এটি প্রায় উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত একটানা একক মহাদেশ। অনেকটা ইংরাজি C অক্ষরের আকারের এই একীভূত ভূখণ্ডের মাঝখানে একটি একক মহাসাগর যা বলতে গেলে প্রায় চারিদিকে আবদ্ধ। স্পষ্টত এর ফলে সমুদ্রের গতি-প্রকৃতি স্রোত সব বদলে গেছে। স্থল



কার্বোনিফেরাস যুগ (~ ৩৬ কোটি বছর আগে)
বৃক্ষ ফার্ন ও অন্যান্য অপুষ্পক উদ্ভিদের ব্যাপক ঘন বন ও প্রকাণ্ড পতঙ্গের কাল

ভাগের জলবায়ুতে ক্রমে ক্রমে এসেছে বেশি মহাদেশীয় চরিত্র। তবে গোড়া থেকেই যে বনের সমারোহ এতে সৃষ্টি হয়েছিল সেটি বায়ুমণ্ডল থেকে প্রচুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করেছে সালোক সংশ্লেষণে, একই ভাবে বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রাও বাড়িয়েছে। এ বনের অনেকখানি ছিল জলা বন। এ সব জলায় মরা গাছ পচে আবার কার্বন-ডাই-অক্সাইড হবার বদলে বরং কার্বন পীটকয়লা হিসেবে আটকা পড়ে জলার তলেই রয়ে গেছে। এরকম অক্সিজেন সমৃদ্ধ পরিবেশে বনের হাজারো ভূবন প্রাণির জন্য উন্মুক্ত হওয়াতে সে সময় দেখা দিয়েছিল নূতন নূতন জীব বৈচিত্র। কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ছায়াতল, নীচে গর্ত, ভেতরে কোটর– ঘন গাছপালার ফলে দেখা দিয়েছিল এসব হাজারো ভূবন। এর সঙ্গে গাছের আশ্রয়ী ছোট ফার্ন, মস, ফাঙ্গাস এসবের মধ্যেও কম ভূবন ছিলনা। এদের চমৎকার ব্যবহার করেছিল এ সময় বিবর্তিত হওয়া বিচিত্র রকমের উভচর, সরীসৃপ এবং কীট পতঙ্গ। এই শেষোক্তরাই সব চেয়ে ভাল ভাবে জাঁকিয়ে বসেছিল, এর মধ্যে ছোট আকারের হাজারো ভূবনে।

উভচর ও সরীসৃপ

পিণ্ডাকৃতি পাখনার মাছ কীভাবে বিবর্তিত হয়ে স্থলে আসা যাওয়া করেছে তা আমরা দেখেছি। সেখান থেকেই শুরু হয়েছে চারপেয়েদের যাত্রা– প্রাথমিকভাবে উভচর হিসাবে। উভচররা জলভাগের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে, সেখানে ডিম পেড়েছে, সেখানেই বাচ্চাদের দেখাশুনা করেছে। নানা সাইজের কুমির ধরনের অনেক উভচর এ সময় ধীরে ধীরে স্থলের উপযুক্ত হবার দিকে বিবর্তিত হয়েছে। এদের শক্তিশালী পায়ের হাড় স্থলে হাঁটার ও দৌড়ানোর উপযুক্ত, তাতে হাড়ের সংযোগগুলো, মেরুদণ্ড এবং সর্বাঙ্গীন হাড়ের কাঠামোটিও এ ধরনের জীবনের উপযোগী হয়ে গড়ে তুলেছিল। তবে গোড়া থেকেই এদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নানা বৈচিত্র। উভচরদের গভীর অতীতে খুব ধীরে সরীসৃপ



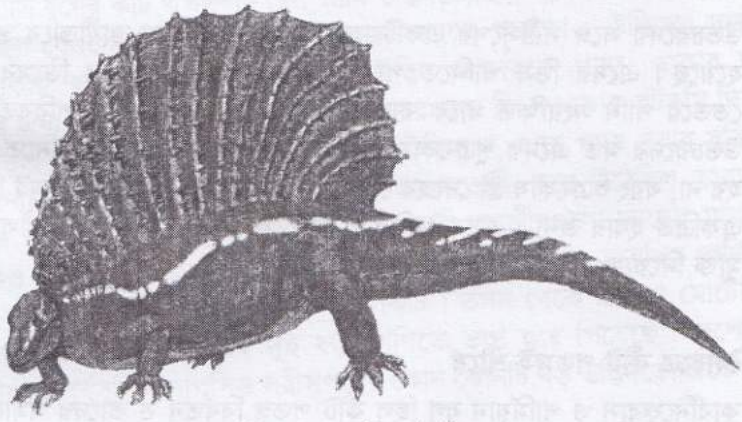
পার্মিয়ান জলাভূমি (২৭ কোটি বছর আগে)
উভচর আর প্রকাণ্ড পতঙ্গদের সমারোহ



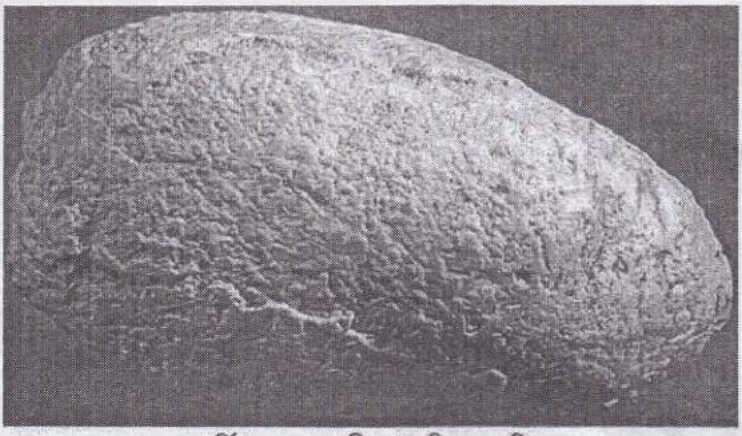
পার্মিয়ান যুগঃ স্থলবাসী সরীসৃপের শুরু

বিবর্তনের বীজ উপ্ত হয়েছে নানা ধারায়। এরকম একটি ধারা থেকে এসেছে আজকের কুমির জাতীয় প্রাণি। আবার সে ধারারই আর একটি শাখা বিবর্তিত হয়েছে ডাইনোসর হবার দিকে, যদিও ডাইনোসররা আমাদের কাল পর্যন্ত টেকেনি। ডাইনোরসমুখি শাখার একটি প্রশাখা বিবর্তিত হয়েছে আজকের পাখি রূপে। আজকের বাকি সরীসৃপদেরও সূত্রপাত ঐ উভচর ইতিহাসের গভীরে অন্যান্য ধারায়– একটিতে কচ্ছপ, অন্যটিতে সাপ, এবং আরো অন্যান্য টিকটিকি, গিরগিটি ইত্যাদি। এমনকি সম্পূর্ণ ভিন্ন আর একটি শাখা উভচর থেকে বিশেষ ধরনের স্তন্যপায়ীমুখি সরীসৃপে বিবর্তিত হয়ে আজকের স্তন্যপায়ী হয়েছে, আমরাও যার সদস্য।

উভচর থেকে সরীসৃপে বিবর্তিত হয়ে এসব নানা ধারায় যাওয়ার মধ্যে একটি সুন্দর



পার্মিয়ান যুগঃ সরীসৃপ বৈচিত্র
পাতলা খাড়া অংশ উত্তাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতো



পার্মিয়ান যুগের সরীসৃপের ডিমের ফসিল

সোজা নির্দেশক আছে– সেটি হলো আদি সরীসৃপের মাথার খুলিতে চোখের পেছনে থাকা গর্তের সংখ্যায়। যাদের এরকম কোন গর্ত ছিলনা তাদের বলা হয় এনাপসিড– এরা কচ্ছপের পূর্বসূরি। যাদের একটি গর্ত ছিল তাদের বলা হয় সিনাপসিড–এরা স্তন্যপায়ীদের পূর্বসূরি। আর যাদের দুটি গর্ত ছিল তারা ডায়াপসিড– ডাইনোসরদের পূর্বসূরি।

কার্বনিফেরাস ও পার্মিয়ান যুগে এবং তারপরেও নানা শাখার সরীসৃপদের দেহ বৈচিত্র চোখে পড়ার মত, কোন কোনটি বেশ বড় বড় আকৃতির। দেহের বিচিত্র অঙ্গ সজ্জাও বৈশিষ্টময়। বেশ কয়েকটির ছিল পিঠ থেকে খাড়া পালের মত তোলা অংশ। সরীসৃপকে বাইরের পরিবেশের উত্তাপের সমান দেহ উত্তাপ রাখতে হয় বলে মনে করা হয় এর প্রধান কাজ ছিল বেশি সূর্য কিরণ ধরে গা উত্তপ্ত করা– সোলার হীটার প্যানেলের মত। আবার দেহ বেশি গরম হয়ে গেলে দেহতাপ দ্রুত বিকিরণ করে ঠান্ডা হবার জন্যও এটি কাজে লাগতো।

উভচরদের সঙ্গে সরীসৃপের একটি বড় পার্থক্য ছিল এরা স্থায়ীভাবে স্থলের জন্য তৈরি হয়েছে। এদের ডিম পানিতে পাড়তে হয়না, কারণ তাদের ডিমের শক্ত খোলসের ভেতরে পানি সংরক্ষিত থাকে বাচ্চার জন্য। আর একটি বড় পরিবর্তন হলো মাছ বা উভচরদের মত এদের শুক্রকোষ ও ডিম্বকোষ দেহের বাইরে পানিতে পরস্পর মিলিত হয় না, বরং শুক্রকোষ স্ত্রী দেহের ভেতরে প্রবেশ করানো হয়, ওখানেই ডিম্বকোষের সঙ্গে একত্রিত হবার জন্য। এসব বৈশিষ্ট সরীসৃপকে পানির উপর নির্ভরশীলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়েছে।

বৈচিত্রে কীট পতঙ্গই শীর্ষে

কার্বনিফেরাস ও পার্মিয়ান যুগ ছিল কীট পতঙ্গ বির্বতন ও তাদের সমারোহ সৃষ্টির যুগ। তারপর থেকে বৈচিত্রে এরাই জীব জগতের শীর্ষে ছিল, এখনো আছে। আগেই বলেছি সে যুগের বনের হাজারো ভূবনকে সব চেয়ে ভাল ব্যবহার করতে পেরেছিল ঐ কীট

পতঙ্গরা। ওদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিল পানিতে ও স্থলে উভয় জায়গায় থাকার মত– হয়তো এভাবেই ওদের শুরু হয়েছিল। ওরকম উভচর পতঙ্গ এখনো আছে মে-ফ্লাই, ড্রাগন-ফ্লাই ইত্যাদি পানির ফড়িং হিসাবে। এরা পানিতে ডিম দেয়, এদের লার্ভা বা শূককীট পানিতেই বড় হয়। যদিও পতঙ্গের ডানার উৎস নিয়ে নানা থিওরি আছে, এখন সব চেয়ে সমর্থিত থিওরি হলো এই ডানা উভচর পতঙ্গের লার্ভার মধ্যে পানিতেই বিবর্তিত হয়েছে, তবে শুরুতে উড়ার জন্য নয়, পানিতে ভেসে চলতে বাতাস ধরার পাল হিসাবে। কানকোর একটি বর্ধিতাংশ এ কাজের জন্য ডানায় বিবর্তিত হয়েছিল। এর ফলে পানিতে থাকা কালে এরা দ্রুত ভেসে বিপদ থেকে সরে যেতে পারতো। বর্তমানে ষ্টোন-ফ্লাই নামের পানির ফড়িং এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তারা পানিতে থাকাকালে পালের মত ডানা তুলে দেয়, পানিতে ভেসে চলাচলের সুবিধার জন্য। তাই খুব সম্ভব ঐ কাজের জন্যই সে যুগের পতঙ্গদের ডানা বিকশিত হয়েছিল। পরে যখন তাদের আর পানিতে থাকতে হয়নি তখন উড়ার জন্যই কাজে লাগিয়েছে বিবর্তিত পতঙ্গরা তাদের ডানাকে। ডানার সাহায্যে উড়ার সুযোগ পতঙ্গের জন্য নানা সাফল্য নিয়ে এসেছে। তখন সে গাছে গাছে, উপরে নিচে ঘুরে বেড়াতে পারল, আবাস বা খাদ্যের খোঁজে, অথবা প্রতিরক্ষার কাজে। এটি পতঙ্গকে বিপুল বৈচিত্রের দিকে নিয়ে যেতে সহায়ক হয়েছে।

কার্বোনিফেরাস ও পার্মিয়ান যুগের পতঙ্গগুলোর একটি ব্যতিক্রমী দিক হল সে যুগে অনেক বড় বড় পতঙ্গ ছিল, আজকে যে আকারে ওদের দেখা যায়না। তখনকার বিশাল বিশাল উড়ন্ত গঙ্গা ফড়িং বনের ভেতরের একটি সাধারণ দৃশ্য ছিল বলেই মনে হয় তাদের ফসিল চিহ্ন থেকে। মিটার সাইজের পতঙ্গরা তখন গাছে গাছে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

উদ্ভিদভোজিতার প্রারম্ভ

জীবের ইতিহাসের অধিকাংশ সময় যেহেতু উদ্ভিদ ছিলনা তাই উদ্ভিদভোজিতাও ছিল না। জলজ প্রাণি তখন খাদ্যের জন্য নির্ভর করেছে আলজি ও অন্য জলজ প্রাণির উপর। স্থলে এসেও এটি অব্যাহত ছিল, এখানে উদ্ভিদের আবির্ভাব হবার পরেও। আসলে কার্বনিফেরাস যুগের কীট পতঙ্গরাই ছিল আদি উদ্ভিদভোজি। এদের পেটে এমন পরাশ্রয়ী অণুজীব ছিল যেগুলো উদ্ভিদের সেলুলোজ হজম করতে পারতো। উদ্ভিদের সঙ্গে নানা ভাবে পোকার অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক রয়েছে। উদ্ভিদ তাদেরকে খাদ্য, থাকার আশ্রয়, প্রতিরক্ষার জন্য কামোফ্লেজ করার অর্থাৎ লুকানোর জন্য মিশে থাকার পটভূমি দিয়েছে। তাদের উড়ার বিবর্তনের কারণও মনে করা হয় উদ্ভিদকে, গাছে গাছে ঘুরার সুবিধার্থে। স্থলের অন্যান্য বড় প্রাণিদের কোন কোনটা উদ্ভিদভোজি হয়ে উঠেছিল তারা আগে কীটভোজি ছিল বলে। কীটের সেলুলোজ হজমকারী অণুজীবগুলো তাদের মধ্যে গিয়ে তাদেরকেও সেলুলোজ হজম করার ক্ষমতা দিয়েছে। এভাবে শুরু হয়েছিল প্রাণির সঙ্গে উদ্ভিদের খাদ্য-খাদক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কটি। তখন থেকে প্রাণিরা মোটের উপর উদ্ভিদভোজি ও প্রাণিভোজি এই দুই বড় শ্রেণিতে ভাগ হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে স্তন্যপায়ীদের পূর্বসূরি সিনাপসিড সরীসৃপদের কোন কোনটি বড় উদ্ভিদভোজিতে পরিণত হয়েছিল।

উদ্ভিদভোজিতা শুরু হবার পর থেকে বিবর্তনের সেই অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে

গিয়েছিল উদ্ভিদ আর উদ্ভিদভোজি এই উভয়ের মধ্যে। উদ্ভিদকে তার প্রতিরক্ষাগুলো বিবর্তিত করতে হয়েছে কাঁটা, রোঁয়া, হুক,ফাঁদ, রাসায়নিক বিষ ইত্যাদি– যা উদ্ভিদভোজিকে নিরস্ত করতে পারে। ওদিকে উদ্ভিদভোজি প্রাণিরাও এই বাধাগুলোকে নিরস্ত করে যাতে উদ্ভিদভোজিতা বজায় রাখা যায় এমন সব বৈশিষ্ট বিবর্তিত হয়েছে। এই প্রতিযোগিতা ক্রমাগত চলেছে, এখনো চলছে। আর এর ভারসাম্যে উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদভোজি উভয়েই শুধু টিকেই থাকেনি, নানা বৈচিত্রে এগিয়ে গেছে।

বৃহত্তম গণবিলুপ্তি

কার্বনিফেরাস ও পার্মিয়ান যুগের কথায় আমরা স্থলের বনকে গুরুত্ব দিলাম বটে, কিন্তু ও সময়ের সমুদ্রও অতীতের সব প্রজাতিতে ভর্তি ছিল– নূতন নূতন প্রজাতিও যোগ হয়েছে। সেই ক্যামব্রিয়ান যুগে পানিতে যে নানা বিচিত্র ট্রাইলোবাইট দেখা দিয়েছিল সেগুলো তখনো ছিল। মাছের প্রচুর বৈচিত্র ছিল, বিশেষ করে হাঙ্গর জাতীয় মাছ। চিংড়ি ও লোবস্টার জাতীয় প্রাণিও প্রচুর ছিল। এ সময় অবশ্য এমোনায়ডদের প্রাধান্য শুরু হয়েছিল সমুদ্রে। এটি অক্টোপাস-স্কুইড জাতীয় প্রাণি, তবে কয়েক পাক খাওয়া শামুকের মত বিভিন্ন আকৃতির খোলসে ঢাকা। বিভিন্ন আকারের নানা প্রজাতির এমোনয়েড সমুদ্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট ছিল। ইতোপূর্বে দুটি গণবিলুপ্তিতে বেঁচে যাওয়া আরো নানা সামুদ্রিক প্রজাতি ও তাদের উত্তরসূরিরা তো ছিলই।

স্থলে ও জলে এই সমৃদ্ধ জীব বৈচিত্রকে আবার একটি গণবিলুপ্তির শিকার হতে হয়েছে পার্মিয়ান যুগের অবসানে– পার্মিয়ান আর ট্রায়াসিক যুগের সন্ধিক্ষণে ২৫ কোটি বছর আগে। আর পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক নামে পরিচিত এই গণবিলুপ্তিটিই ছিল সব চেয়ে বড় গণবিলুপ্তি– শতকরা ৯৫ ভাগ প্রজাতি যাতে বিলুপ্ত হয়েছিল। এসময় পৃথিবীতে প্রাণ বলতে গেলে খুব সংকীর্ণভাবে টিকে গেছে ভবিষ্যতের জন্য। অবশ্য জীবের ফ্যামিলির কথা বিবেচনা করলে ব্যাপারটি এতটা খারাপ ছিলনা, অর্ধেক সংখ্যক ফ্যামেলির কিছু না



পার্মিয়ান যুগঃ সমুদ্রে অমেরুদণ্ডী সমারোহ

কিছু প্রজাতি এতে টিকে গিয়েছিল। সমুদ্রে ট্রাইলোবাইট ও এমোনয়ডরা প্রায় সর্বাংশে ধ্বংসের মুখে পড়েছিল, অন্যান্য অনেকেও। কিন্তু অন্যদিকে সমুদ্রতলার দিকে থাকা বহু প্রজাতির মাছগুলো বেঁচে গিয়েছিল। স্থলে উভচর ও সরীসৃপের বেশ কিছু ধারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছিল। কার্বোনিফেরাস ও পার্মিয়ানের এমন সমৃদ্ধ বনের অনেকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে কীট পতঙ্গের আটটি পুরো অর্ডারও সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। অন্যগুলোরও যে যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

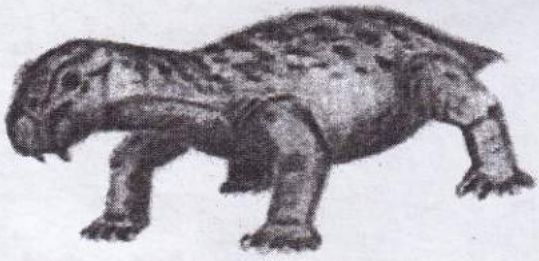
এত বড় যে বিপর্যয় তার কারণটি কিন্তু আমরা খুব নির্দিষ্ট করে বলতে পারছিনা। ঐ সময় সাইবেরিয়া অঞ্চলে প্রচুর আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়ে তাদের প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল। সেটিকে একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কাছাকাছি অঞ্চলের উপর সরাসরি প্রভাব ছাড়াও উদ্গীর্ণ ভস্ম ও সালফার-ডাই-অক্সাইড সারা পৃথিবী জুড়ে বিপর্যয় ঘটাতে সক্ষম ছিল। ঐ ভস্মের কারণে সূর্য কিরণ কম আসতে পেরে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা কমে গিয়েছিল, বায়ুমন্ডলে গ্রীন হাউজ গ্যাসও কমেছিল। অন্যদিকে একীভূত মহাদেশ প্যানজিয়া ক্রমে আরো আঁটসাট হচ্ছিল নিজের মধ্যে। এ সবের সম্মিলিত ফলে সাগর পৃষ্ঠ নেমে গিয়েছিল। এতে প্রতিকূল জলবায়ু সৃষ্টি হয়ে এবং অগভীর সমুদ্রের সমৃদ্ধ জীব-আবাস নষ্ট হয়ে গণবিলুপ্তির ঘটনা ঘটতে পারে। সুস্পষ্ট কারণ না জানলেও ফসিল সাক্ষ্য থেকে জীব-প্রজাতির উপর পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক বিলুপ্তির প্রভাব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বেশ স্পষ্ট।

ডাইনোসরের রাজত্ব

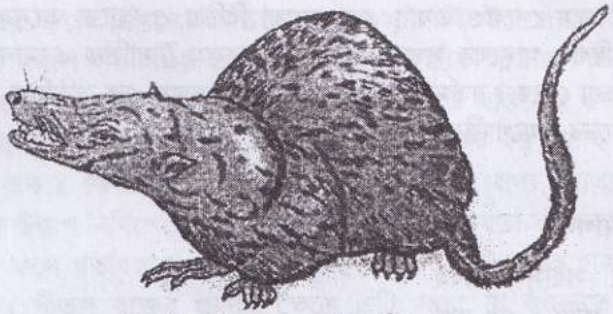
ট্রায়াসিক যুগের নূতনরা

পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক গণবিলুপ্তির প্রকাণ্ড ধাক্কার পর জীবজগত আবার তার বৈচিত্র খুঁজে পেয়েছে ধীরে ধীরে। ২৫ কোটি বছর থেকে ২১ কোটি বছর আগে পর্যন্ত– এই ট্রায়াসিক যুগটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেটি যতটা না এযুগের পূর্ণ বিকশিত জীবের জন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি এযুগে যা শুরু হয়েছিল তার জন্য। এই শুরুর দলে আছে ডাইনোসর-রা এবং স্তন্যপায়ীরা। ট্রায়াসিক যুগের শেষে আর একটি গণবিলুপ্তির পর জুরাসিক এবং তারপর ক্রেটাশিয়াস যুগের মধ্য দিয়ে ডাইনোসররা বিচিত্রভাবে যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে বিকশিত হয়েছে। স্তন্যপায়ীরা অবশ্য তেমন প্রাধান্য পায়নি এই পুরা সময়ে, ডাইনোসরদের দাপটের ফলে। কিন্তু তাদেরও সম্ভাবনাগুলো তৈরি হচ্ছিল তলে তলে। তাদের পূর্ণ সুযোগ এসেছিল আরো একটি গণবিলুপ্তিতে ডাইনোসররা পুরো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর।

স্তন্যপায়ীরা বিবর্তিত হয়েছিল সিনাপসিড ধারার সরীসৃপ থেকে। ট্রায়াসিক যুগের শেষের দিকে ইঁদুর সদৃশ প্রথম ছোট স্তন্যপায়ীরা দেখা দেয়। তার আগে দীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে বিবর্তন ঘটেছে সিনাপসিডদের। সরীসৃপরা যে রকম দেহের বাইরে পা ছড়িয়ে হেলেদুলে হাঁটে (টিকটিকি বা কুমিরে যা লক্ষ্য করা যায়) তার বদলে পা আস্তে আস্তে চলে এসেছে দেহের সরাসরি নিচে আরো দক্ষভাবে দেহভার নিয়ে। এভাবে এপাশ-



ট্রায়াসিক যুগে (২৫-২১ কোটি বছর আগে)
স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ : পা দেহের নিচে চলে আসছে



ট্রায়াসিক যুগের শেষের দিকে
ছোট স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব

ওপাশ না বেঁকে সোজা হাঁটার অভ্যাস হলো। এরা নিজের দেহ উত্তাপ সংরক্ষণ করতে পেরে উষ্ণ রক্তের অধিকারী হয়েছে। আর ডিম পাড়ার বদলে নিজের দেহের মধ্যে জন্মের আগে পর্যন্ত সন্তান ধারণ করেছে এবং জন্মের পর তাকে স্তন্য দিয়েছে। এই সব পরিবর্তন ঘটেছে খুবই ধীরে ধাপে ধাপে। পরে আমরা দেখবো স্তন্যপায়ীর বিকাশ কতভাবে জীবজগতে যুগান্তকারী ঘটনা ছিল।

ট্রায়াসিক যুগে প্রায় একই সময়ে আত্মপ্রকাশ করেছে প্রথম ডাইনোসররাও। এরা বিবর্তিত হয়েছে– ডায়াপসিড গোষ্ঠির সরীসৃপ থেকে। পরবর্তীতে এদের প্রাধান্যের যুগে এরা ছোট থেকে বড়, শান্ত থেকে ভয়ঙ্কর, সরল থেকে জবড়জঙ্গ ও বিকট দর্শন, এরকম বহুরকম প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়েছে। তবে ট্রায়াসিক যুগের প্রথম ডাইনোসররা ছিল ছোট, মিটার খানেক উঁচু, লম্বা গলা নিয়ে পেছনের পায়ে ভর করে চলতো।

ডাইনোসররা ও স্তন্যপায়ীরা দৃশ্যপটে আসলেও ট্রায়াসিক যুগের স্থলভাগের বড় আসনের দখল ছিল আগের মত সরীসৃপদেরই। ওদিকে সমুদ্রে সেই সময় বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার

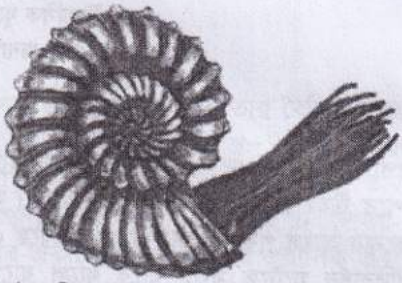


ট্রায়াসিক যুগের শেষ ভাগ (~ ২২ কোটি বছর)
বিচিত্র সরীসৃপ প্রাধান্যের মধ্যে প্রথম ছোট ডায়নোসর

করেছিল নূতন ধরনের অতিকায় এমোনয়েডরা। আগের বিলুপ্তিতে এদের অধিকাংশ প্রজাতি ধ্বংস হয়ে গেলেও এবার এরা আরো বিচিত্র ও আরো অনেক বড় আকারে বিকশিত হয়েছিল। মানুষের সমান আকারের এরকম ট্রায়াসিক এমোনয়েডের ফসিল বেশ কিছু পাওয়া গেছে। বর্তমানেও অবশ্য নটিলাস নামে এক সামুদ্রিক প্রাণি আছে যা এই এমোনয়েডের সমগোত্রীয়।

উষ্ণ রক্তের আগমন

মাছ, উভচর, সরীসৃপ সবই শীতল রক্তের প্রাণি। এর অর্থ হলো পরিবেশের উত্তাপ অনুযায়ী এদের দেহ উত্তাপ পরিবর্তিত হয়। তাই সামান্য প্রতিকূল উত্তাপে এরা বেশিক্ষণ থাকতে পারেনা, থাকলেও সক্রিয়তা বজায় রাখতে পারেনা। সাধারণ ফটোগ্রাফি যেভাবে আলো দিয়ে কাজ করে, ইনফ্রারেড ফটোগ্রাফি সেভাবে তাপ দিয়ে কাজ করে।



ট্রায়াসিক যুগ থেকে সমুদ্রে প্রাধান্য পাওয়া বিচিত্র এমোনয়ড

এরকম ফটোতে দেহের উত্তাপ ধরা পড়ে। এটি নাটকীয় ভাবে দেখাতে পারে ঠান্ডার মধ্যে একটি গিরগিটির রক্ত কী রকম শীতল হয়ে যেতে থাকে, আবার রোদের নীচে এলে এবং গরম পাথরের উপর দাঁড়ালে অল্প সময়ে কী ভাবে তা উষ্ণ হয়ে যেতে থাকে। সাধারণত এরকম ফটোতে শীতল অংশ নীল আর গরম অংশ লাল দেখায়।

প্রথম স্তন্যপায়ীদের মধ্য দিয়ে উষ্ণ রক্তের প্রাণির আবির্ভাব হয়েছিল। জীব বিবর্তনে এটি একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। উষ্ণ রক্তের অর্থ হলো প্রাণি নিজের দেহের উত্তাপ নিজের শক্তি উৎপাদনের ফলে একটি খুবই সুনির্দিষ্ট মাত্রায় সাধারণত বজায় রাখতে পারে। বাইরের পরিবেশের উত্তাপ উঠা নামা করলেও দেহের অভ্যন্তরের উত্তাপ সহজে পরিবর্তিত হয় না। স্তন্যপায়ীরা ছাড়াও তাদের কিছু পরেই বিবর্তিত পাখিরা এই গুণ অর্জন করেছিল। ডাইনোসররা উষ্ণ রক্তের অধিকারী ছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়, তবে উষ্ণ রক্তের কিছু সুবিধা তাদের রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থায় ছিল বলে প্রমাণ রয়েছে। স্তন্যপায়ীদের পরবর্তী অভূতপূর্ব বিকাশে তাদের উষ্ণ রক্তের হওয়াটি বিশেষভাবে কাজে এসেছে। তুলনীয় না হলেও পাখিদের সম্পর্কেও এটি বলা যায়। উষ্ণ রক্তের প্রাণিরা ত্বকের বাইরে পশম, পালক ইত্যাদি দিয়ে এবং ত্বকের নিচে চর্বি দিয়ে দেহের সুনির্দিষ্ট উত্তাপ সংরক্ষণ করে। আবার বেশি সক্রিয়তা বা বাইরের কারণে শরীর অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে গেলে এদের কোন কোনটি ঘাম ঝরিয়ে বা মুখ খুলে হাঁপানোর মধ্যে দিয়ে তাপ ত্যাগ করার চেষ্টা করে।

উষ্ণ রক্তের সুবিধাগুলো অনেক। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সব চেয়ে বড় সুবিধা এর হয়েছে যে এর ফলে মস্তিষ্কের নিউরোনগুলো সুনির্দিষ্ট উত্তেজনায় সুনির্দিষ্ট সাড়া দিতে পারে। উত্তাপ সব সময় একই থাকে বলে সঠিক মাত্রায় নিউরোন সিগনাল উৎপন্ন হয়ে এভাবে স্নায়ু সাড়া দিতে পারে, এবং উন্নত মস্তিষ্কের গুণাবলী দেখাতে পারে। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে মস্তিষ্কের নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নে এটি বড় প্রভাব রেখেছে। এটি প্রাণির টিকে থাকার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ– কারণ এর ফলে খাদ্য, আত্মরক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাইরের উত্তাপ নির্বিশেষে দেহের সাড়া দেয়া ও সক্রিয়তা সম্ভব হয়েছে। সুনির্দিষ্ট দেহ উত্তাপের ফলে গর্ভাবস্থায় ও জন্মের পর শিশু প্রাণি তার বৃদ্ধির হার সমানে বজায় রাখতে পারে। শীতল রক্তের প্রাণির ক্ষেত্রে এটি সম্ভব না হওয়াতে অনেক সময় আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে বৃদ্ধির হার দীর্ঘতর হতে পারে। যেমন কুমিরের ক্ষেত্রে শীতল আবহাওয়ায় বাচ্চা বড় হতে এত সময় লাগে যে এত দীর্ঘ দিন ধরে বাচ্চার উপর নজর রাখা তাদের পক্ষে প্রায়শ সম্ভব হয়না। নিশাচর হবার ক্ষেত্রে উষ্ণ রক্ত কাজে আসে। রাতে শিকারি প্রাণির উপদ্রব কম বলে অনেক প্রাণির জন্য নিশাচর হওয়াটি সুবিধাজনক। স্তন্যপায়ীরা ও পাখিরা সহজে এটি হতে পারে। কিন্তু রাত অপেক্ষাকৃত শীতলতর হওয়াতে শীতল রক্তের প্রাণিরা রাতে সতর্ক থাকতে বা সক্রিয়তা বজায় রাখতে পারে না। উষ্ণ রক্তের অধিকারি হয়ে স্তন্যপায়ীরা আরো কিছু বৈশিষ্ট অর্জন করেছে। শিরা ও ধমনীর দ্বারা হার্টের সঙ্গে রক্তের যে দ্বিমুখি সঞ্চালন তা রক্ত সঞ্চালনকে দক্ষতর করেছে। চার কক্ষ বিশিষ্ট হার্টের কাজ বিবর্তিত হয়ে এটি সম্ভব হয়েছে।

স্থলের প্রাণির ক্ষেত্রে উষ্ণ রক্ত সত্যিই একটি বড় পদক্ষেপ। জলজ প্রাণির ক্ষেত্রে অবশ্য সেটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ সমুদ্রের গভীরে উত্তাপ সব সময় প্রায় একই থাকে।

জুরাসিক যুগে ডাইনোসর

এর পরের জুরাসিক যুগটি এবং তার পর ক্রেটাশিয়াস যুগ– এই দীর্ঘ সময়, ২১ কোটি বছর আগে থেকে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে পর্যন্ত, পৃথিবীতে ছিল ডাইনোসরদের রাজত্ব। কিন্তু এইকাল শুরু হবার আগে পার হতে হয়েছে একটি গণবিলুপ্তি– ট্রায়াসিক শেষের গণবিলুপ্তি। এ বিলুপ্তির ফলেই সরীসৃপ জগতে ডাইনোসরমুখি প্রবণতাটি জোরদার হয়েছে। কিছু কালের মধ্যে সরীসৃপদের সামগ্রিক প্রাধান্যের স্থলে আসতে পেরেছে ডাইনোসর প্রাধান্য। এই বিলুপ্তিতে সমুদ্রে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এ পর্যন্ত মহা সমারোহে থাকা এমোনয়েডরা। অনেকগুলো গোষ্ঠি বিলুপ্ত হয়ে এদের উপস্থিতিটি যথেষ্ট ক্ষীণ হয়ে পড়েছিলো। এই গণবিলুপ্তির কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছেনা। এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক থিওরি এসেছে উত্তর আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে, এবং ইউক্রেনে কতগুলো উল্কার খাদের পরীক্ষার মাধ্যমে। মনে করা হচ্ছে যে একটি ধূমকেতু কয়েক টুকরায় বিভক্ত হয়ে পৃথিবীতে আছড়ে পড়েছিল– যার ফলেই ঐ গণবিলুপ্তি দেখা দিয়েছিল। এর প্রভাব প্যানজিয়ার উত্তরাংশে অর্থাৎ লরেশিয়া অঞ্চলেই তাই ঘটেছিল বেশি। সমুদ্র তখন দ্রুত নেমে গিয়ে আবার উঁচু হয়েছিল। এই পতন-

উত্থানও গণবিলুপ্তিতে অবদান রেখেছিল বলে মনে করা হয়।

জুরাসিক যুগে একীভূত মহাদেশ প্যানজিয়া ক্রমাগত ভেঙ্গেছে– নানা টুকরায়, নানা মহাদেশে, বিভক্ত হয়ে পরস্পর থেকে দূরে সরেছে। আঁটসাট স্থলভাগ টুকরা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে জল ভাগের আয়তন কমে যাওয়াতে সমুদ্র ক্রমে উঁচু হয়ে অনেক অগভীর সাগর ও জলাভূমি সৃষ্টি করেছিল। বর্তমানের এক তৃতীয়াংশ স্থলভাগ তখন সমুদ্রে ঢাকা ছিল। ভূত্বকের নানা প্লেইটের সংঘর্ষে অগ্ন্যুৎপাতের প্রবণতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। জলবায়ুতে উত্তাপও বেড়েছিল। এসময়েই কিছু কিছু দক্ষিণ ভূভাগ গণ্ডোয়ানা থেকে পৃথক হয়ে উত্তর দিকে সরে গিয়ে ইউরেশিয়া ভূখন্ডে চাপ দিয়েছিল। এর ফলে ভূত্বক কুঁচকে গিয়ে হিমালয়, আল্পস প্রভৃতি পর্বতশ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে। জলা বনের প্রাচুর্য যেমন ডাইনোসরসহ জীব জগতকে সমৃদ্ধ করেছিল, অন্য দিকে প্রচুর অণুজীবের সমারোহ ঘটিয়েছিলো। বনের গাছ মরে গিয়ে পীটকয়লা, কয়লা যেমন সৃষ্টি হয়েছে ঐসময়, তেমনি অণুজীবের কাজের ফলে খনিজ তেলের সঞ্চয়ও ঘটেছে ভূগর্ভে।

যে ডাইনোসর প্রাধান্যের কথা বলেছি, তার অর্থ হলো জীব জগতের ক্রমে বেশি বেশি ভূবন তাদের দখলে চলে যাওয়া। পরবর্তীতে স্তন্যপায়ীরা যেভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ-ভূবন নিজেদের দখলে আনতে পেরেছে এবং এখনো পারছে তা দেখে আমরা আঁচ করতে পারি সেদিনের ডাইনোসর প্রাধান্যটি কী ধরনের ছিল। ঘন বনে ওরা ছিল, খোলা জায়গায় ওরা ছিল, জলাভূমিতে ওরা ছিল– এমনি ভাবে বিভিন্ন আবহাওয়ায়, খুব উষ্ণ বা শীতল হলেও, সর্বত্র নানা পরিবেশে তারা ছিল। ডাইনোসরদের দীর্ঘ বিচরণ কালে তাদের বৈচিত্র ছিল অভাবনীয় রকমের, তবে সব রকম ডাইনোসর যে সব কালে ছিল বা সব স্থানে ছিল তা নয়। প্যানজিয়া ভাঙ্গা এক একটি ভূখণ্ডে এক এক কালে অপেক্ষাকৃত সীমিত কিছু প্রজাতির ডাইনোসর ছিল– যারা সে রকম পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল।

নিজেদের মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র থাকলেও সব ডাইনোসরদের দেহের একটি মোটামুটি সাধারণ গঠন ছিল– লম্বা গলা, ছোট মাথা, লম্বা লেজ এগুলো যার বৈশিষ্ট। এর মধ্যে ব্যতিক্রমও ছিল অনেক। আর লম্বা দাঁত, শিং, মাথার উপর কারুকার্য, গলায় চওড়া শক্ত চামড়ার কলার ইত্যাদি নানা ভূষণেও সজ্জিত ছিল অনেক রকম ডাইনোসর। আয়তনের কথায় আসলে মিটার খানেকের ছোট আকার থেকে শুরু করে বহু হাতীর সমান অতি প্রকাণ্ড আকারও ছিল, যার মত বড় স্থল-প্রাণি ডাইনোসরদের পর আর কখনো দেখা যায়নি।

ডাইনোসর শ্রেণি বিভাজন

জুরাসিক ও ক্রেটাশিয়াসের যুগের দীর্ঘ কালে বহু প্রজাতির ডাইনোসর বিবর্তিত হলেও তাদের সবগুলোকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করে ফেলা যায়, তাদের কোমরের বৈশিষ্ট অনুযায়ী। প্রথমটি অরনিথিশিয়ান বা পাখির মত কোমরের আর দ্বিতীয়টি সরিশিয়ান বা

টিকটিকির মত কোমরের। অরনিথিশিয়ানরা সব উদ্ভিদভোজি। আত্মরক্ষার বিচিত্র ব্যবস্থা এদের অনেককে অদ্ভূত দর্শন অবয়ব দিয়েছে। এদের মধ্যে অনেকগুলো দুই পায়ে হাঁটতো সামনের ছোট পা হাতের মত তুলে। হাতী সাইজের ইগুয়ানাডন এদের একটি, যার দারুণ প্রাচুর্য ছিল। দুইপেয়ে অরনিথিশিয়ানদের অন্য এক দলের ছিল হাতীর দাঁতের মত দুটি বের করা দাঁত যদিও অপেক্ষাকৃত ছোট। কোনটির ছিল মাথার মধ্যে শিং এর মত ফুলে উঠা অংশ, কোনটির মাথায় রঙীন চিত্র-বিচিত্র দাগ, কোনটির মুখ হাঁসের মত চেপ্টা, অনেকগুলোর মাথার খুলি শক্ত ও পুরু।



জুরাসিক যুগ
বিশাল দ্বিপদী ডায়ানোসর ইগুয়ানাডন

অরথিনিশিয়ানদের আর একটি ভিন্ন দল ছিল চারপেয়ে। এদের মধ্যে ছিল তিন রকমের ভিন্নতা। একটিতে পিঠের উপর খাড়া বড় বড় প্লেইট যা খুব সম্ভব উত্তাপ বাড়াতে ও কমাতে কাজে লাগতো। অন্যটিতে হাড় ও চামড়া লেগে গিয়ে তৈরি সারা গায়ে বর্মের মত– কোথাও বড় বড় কাঁটা, লেজে গদা– সব মিলিয়ে যেন একটি জলজ্যান্ত যুদ্ধের ট্যাঙ্ক। আরো একটিতে মাথায় একটি বা দুটি শিং, গলায় ছড়ানো ঝালরের মত কলার। অরনিথিশিয়ানদের এই দলের সব ক'টিতে আত্মরক্ষার জন্য প্রচুর ভারী বর্ম ও অস্ত্র শস্ত্র। বড় ভারী দেহে গতি কম বলে এই উদ্ভিদভোজিদের মধ্যে নিরাপত্তার এ ধরনের ব্যবস্থা।

অন্যদিকে সরিশিয়ান ডাইনোসরদের দুই প্রধান দল থেরোপড আর সরোপড। থেরোপডরা ছিল মাংসাশি, দুইপেয়ে। এদের প্রায় সবাই দ্রুতগামী, অনেকে রীতিমত হিংস্র। বেশ ছোট থেকে শুরু করে ১৪ মিটার লম্বা ভয়ঙ্কর-দর্শন টাইনোসেরস এই

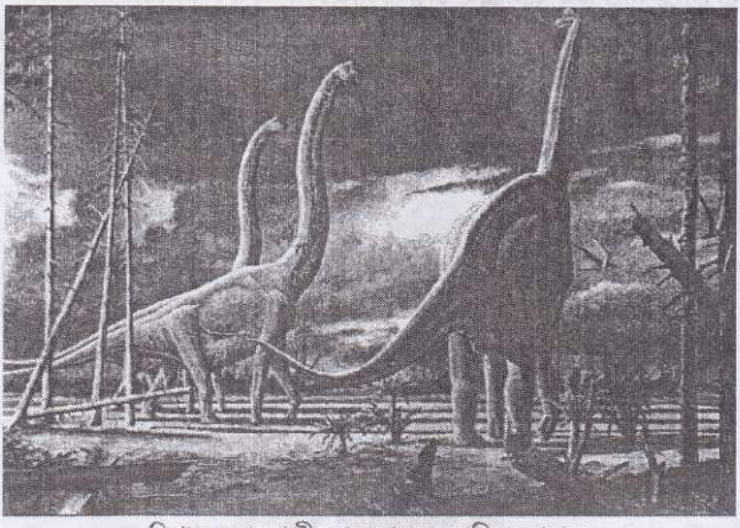


কিছু অরনিথিশিয়ান ডায়নোসর
এদের অনেকগুলো বিচিত্র বর্মধারী



টাইরানোসরাসঃ দুইপেয়ে, মাংসাশি সরিশিয়ানদের একটি

থেরোপডদের অন্তর্গত। এরা তুলনামূলক ছিমছামদেহী, শক্তিশালী পেছনের পায়ে দৌড়াত। সামনের পা দুটা নেহাৎ ছোট। এতে থাকা নখর খুব সম্ভব শিকারের দফা রক্ষা করতে সাহায্য করতো। অন্যদিকে সরোপডরা চারপেয়ে উদ্ভিদভোজী। অত্যন্ত বিশাল-দেহী হলেও এরা নিরীহ। স্তন্যপায়ীর মত দেহের তলাতেই খাড়া পা, না দৌড়ালেও



বিশাল তৃণভোজী ডায়নোসরঃ ব্রাকিওসোরাস

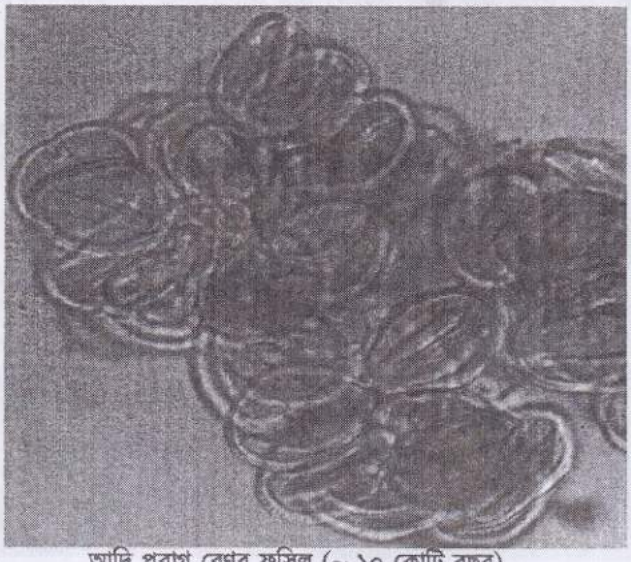
বড় বড় কদম ফেলে এগুতো জুরাসিক বনের মধ্যে। অতি লম্বা গলা, বিশাল দেহ, অতি লম্বা লেজ নিয়ে এরা খুবই বিশিষ্ট। তিনটা হাতির সমান ডিপ্লোডোকাস, নয়টা হাতির সমান ব্রাকিওসোরাস ইত্যাদি সেদিন অন্যান্য প্রাণিদের সম্ভ্রম জাগাতো, আজো যাদুঘরে রাখা এদের বিশাল ফসিল কঙ্কাল আমাদের সম্ভ্রম জাগায়।

এই বৈচিত্রের মধ্যে একটি মজার কথা হলো অরনিথিশিয়ান ডাইনোসররা পাখি-কোমরের হলেও পাখির সঙ্গে আরো গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো সরিশিয়ান ডাইনোসরদের। ওদেরই কিছু ছোট থেরোপড জাতীয় প্রজাতিকেই পাখির আদি জ্ঞাতিভাই বলে মনে করা হয় এখন। পাখি বিবর্তনের সে কাহিনী আমরা পরের অধ্যায়ে দেখবো, সেই সঙ্গে দেখবো ডাইনোসরদের জীবনের আরো কিছু কথা।

ফুল ফোটার দিনে মাটিতে আর আকাশে

সপুষ্পক উদ্ভিদের আবির্ভাব

জীব জগতে উদ্ভিদের শুরু থেকে জুরাসিক যুগ পর্যন্ত যত উদ্ভিদ, যত বন সবই ছিল অপুষ্পক উদ্ভিদের– বড় বড় বৃক্ষ-ফার্ন, ক্লাব মস, এবং পাইন জাতীয় গাছসহ নানা আকারের নানা রকম অপুষ্পক উদ্ভিদ, সবই শুধু সবুজ। ক্রেটাশিয়াস যুগের মাঝামাঝিতেই পৃথিবীতে নানা রঙের ছোঁয়া দেখা দিয়েছিল ফুলের আগমনে। সপুষ্পক উদ্ভিদের আবির্ভাব জীববৈচিত্রের যে জোয়ার নিয়ে আসলো আজকের পৃথিবীতে এখনো আমরা তার সুফল ভোগ করছি। সপুষ্পক উদ্ভিদ মানে ফুল-ফল-বীজের সমারোহ, যার মধ্যে উদ্ভিদ আর প্রাণির একটি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা নিহিত। একদিকে এরা দিয়েছে প্রাণির জন্য নূতন ধরনের খাবার- ফুলের মধু, ফল ও বীজের অভাবনীয় বৈচিত্রের মধ্যে নিরেট জমা পুষ্টি। অন্য দিকে সেটি পেতে গিয়ে ফুলে ফুলে পরাগায়ন, বীজকে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে উদ্ভিদের বিস্তার, এসব কাজে প্রাণির বড় ভূমিকা সৃষ্টি হয়েছে। আসলে সপুষ্পক উদ্ভিদের সৃষ্টি উদ্ভিদ আর প্রাণির এই ধরনের সহযোগিতার কারণে উভয়ের

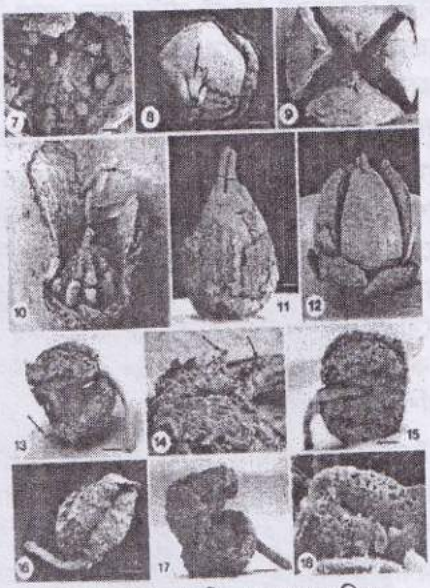


আদি পরাগ রেণুর ফসিল (~ ১০ কোটি বছর)
ফুল আর পতঙ্গের যৌথ যাত্রা

সহবিবর্তনেরই ফলশ্রুতি। ফুল-ফল-বীজে গড়া এই সপুষ্পক উদ্ভিদ ব্যবস্থার প্রাকৃতিক নির্বাচনী সুবিধা যেমন একদিকে সৃষ্টি হয়েছে অন্য দিকে এ ধরনের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করার নির্বাচনী সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে প্রাণিদের ক্ষেত্রেও। তাদের অনেকে তাই সেদিকেই বিবর্তিত হয়েছে।

সপুষ্পক উদ্ভিদের সঙ্গে প্রাণির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পেরেছে উভয়ের ক্ষেত্রে প্রচুর বৈচিত্র। যেমন ফুলের ফলের ক্ষেত্রে এসেছে রঙের ও আকৃতির শত শত বৈচিত্র, প্রাণিকে আকর্ষণের জন্য। এতে পতঙ্গরা যেমন আকৃষ্ট ও উপকৃত হয়েছে, তেমনি জীবনযাত্রার বড় পরিবর্তন এসেছে সেদিনের প্রধান প্রাণি ডাইনোসরদের ক্ষেত্রেও। সপুষ্পক উদ্ভিদ তাদের জন্যও নিয়ে এসেছিল এক বিরাট ভোজের আয়োজন। তাদের অধিকাংশই ছিল বিশালদেহী, এবং উদ্ভিদভোজি। এক একজনের জন্য দরকার হতো বিপুল পরিমাণে উদ্ভিদ খাদ্য। সপুষ্পক উদ্ভিদের আবির্ভাব ক্রেটাশিয়াস যুগের বনের মধ্যে উদ্ভিদ বৈচিত্রের যে জোয়ার এনেছিল তাতে তাদের সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের আচরণ দিয়ে তারা এই বনভূমির উন্নয়নেও সাহায্য করেছে। বিশালদেহী ডাইনোসররা উদ্ভিদ শুধু খায়নি, বনের গাছপালা দলিত মথিত করে ওলট পালট করে দিয়ে সেখানে নূতন উদ্ভিদ গজাবার সুবিধা করে দিয়েছে। কাজেই এক এক দিকের বন সাবাড় করে দিলেও শিগ্‌গির কয়েক মাসের মধ্যে সেখানে নূতন গাছ গজিয়েছে।

এই সপুষ্পক উদ্ভিদবৈচিত্রের সঙ্গে ক্রেটাশিয়াস যুগের ডাইনোস-বৈচিত্রের একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। উদ্ভিদভোজি নানা ডাইনোসর এই উদ্ভিদবৈচিত্রের নানা দিকের সঙ্গে নিজেদের ভূবন পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। যেমন বিশালদেহী ব্রাকিওসোরাস তার অনেক দীর্ঘ গলাকে উপরে তুলে উচ্চ বৃক্ষের দিকে নয় বরং ভূমি সমান্তরালে সামনের দিকে রেখে অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ ঝোপগুলোকে সাবাড় করে চলতো। এমনি ভাবে বর্মধারী ও হাঁস-মুখো অরনিথিশিয়ান ডাইনোসরগুলোও অনুচ্চ সপুষ্পক উদ্ভিদেই চারণ করতো। উচ্চ বৃক্ষ শাখাগুলো হয়তো দ্বিপদী উঁচু ইগুয়ানাডন জাতীয় ডাইনোসরদের দখলেই থাকতো।



আদি ফুল ফল বীজের নানা ফসিল

সরোপড ডাইনোসরদের দেহ অতি বিশাল হলেও সরু লম্বা গলার প্রান্তে মাথাটি ছিল খুবই ছোট। অতি বড় দেহ প্রতিপালন করার জন্য যে হারে উদ্ভিজ তাদেরকে গলাধকরণ করতে হতো সেটি বেশি চিবিয়ে খাওয়া সম্ভব ছিলনা। এগুলোকে চূর্ণ করে হজমের ব্যবস্থা হতো তাদের বিশাল পাকস্থলীতে থাকা বেশ কিছু শক্ত পাথরের

পেষণের মাধ্যমে। অন্যদিকে অর্নথিশিয়ান উদ্ভিদভোজিদের বিশেষ করে বর্মধারী ও হাঁস-মুখোদের চোয়াল বড় ও শক্ত ছিল। তাদের এজন্য বড় পেষণ পাকস্থলী দরকার হতোনা।

ডাইনোসর জীবন

ছোট মাথায় ছোট মস্তিষ্কের ডাইনোসর যে দীর্ঘ ১৩ কোটি বছর ধরে জীব জগতে প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিল তা শুধুমাত্র তাদের অনেকের বিশাল দেহ, বর্ম ইত্যাদির কারণে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রমাণ পাওয়া গেছে যে এরা প্রায় একশ' সদস্যের বড় দলে চলাফেরা করতো। তাদের সক্রিয়তাগুলো দেখলে ডাইনোসরদের উষ্ণ রক্তের প্রাণি বলে মনে হয়। ডাইনোসর ফসিল সব মহাদেশেই পাওয়া গেছে এমনকি সুদূর দক্ষিণে আন্টার্কটিকাতেও। আজকের মত এত শীতল না হলেও সেখানকার দীর্ঘ রাত্রি শীতল রক্তের প্রাণির জন্য খুব অনুকূল হবার কথা নয়, বিশেষ করে ডাইনোসরের গায়ে পশম বা পালকের কোন তাপ-নিরোধী আবরণ যেহেতু ছিলনা। তবে একই অভিমুখে অনেক ডাইনোসরের পদচিহ্ন কোথাও কোথাও পাওয়া গেছে, যা দেখে মনে হয় এরা হয়তো শীতের সময় দলবদ্ধভাবে উষ্ণতর অঞ্চলে সরে যেত। তবে এই সরে যাওয়া শীতের জন্য না হয়ে খাদ্য ফুরিয়ে যাওয়ার কারণেও হতে পারে। তা ছাড়া ডাইনোসর ফসিলে লোহার দাগ এমন ভাবে দেখা গেছে যা তাকে উষ্ণ রক্ত, চারকক্ষ বিশিষ্ট হার্ট বা দ্বিমুখি রক্ত সঞ্চালনের অধিকারি ছিল বলে সাক্ষ্য দেয়। অন্যদিকে ডাইনোসর ফসিলের হাড়ে বৃদ্ধির যে ধীর গতির চিহ্ন রয়েছে সেটি শুধু শীতল রক্তের প্রাণিতেই সম্ভব। এভাবে এদের উষ্ণ রক্ত হবার প্রমাণ যেমন আছে, শীতল রক্ত হবারও আছে। অনেকে মনে করেন উভয়েরই বৈশিষ্ট ডাইনোসর রক্তে ছিল। এরা কোন না কোন পদ্ধতিতে দেহের অভ্যন্তরের উত্তাপ ধরে রাখতে পারতো। তাদের দেহের বিশালতাও হয়তো একাজে সহায়ক হয়েছে।

উদ্ভিদভোজি ও প্রাণিভোজি ডাইনোসর একই সঙ্গে সহ-অবস্থান করেছে। প্রাণিভোজিদের ছিমছাম ক্ষিপ্রতা তাদেরকে শিকার ধরতে সক্ষম করেছে, অন্যদিকে উদ্ভিদভোজিদের বিশাল দেহ অথবা দেহের বর্ম ও আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রশস্ত্র তাদেরকে টিকে থাকার সুযোগ দিয়েছে। আমরা ডাইনোসরদের বৈচিত্র ও জীবনকে কিছুটা দেখার চেষ্টা করলাম, কারণ জুরাসিক ও ক্রেটাশিয়াস যুগের পর স্তন্যপায়ীরা যখন ডাইনোসরদের স্থান নিয়েছিলো তখন তাদের অনেক কিছু একই প্যাটার্ন অনুসরণ করেছে, যদিও স্তন্যপায়ীদের বিকাশের কৌশল খুবই ভিন্ন ছিল। আমাদের কুতূহল শেষ পর্যন্ত এই স্তন্যপায়ী বিকাশেই বেশি, কারণ আমরা তারই ফসল।

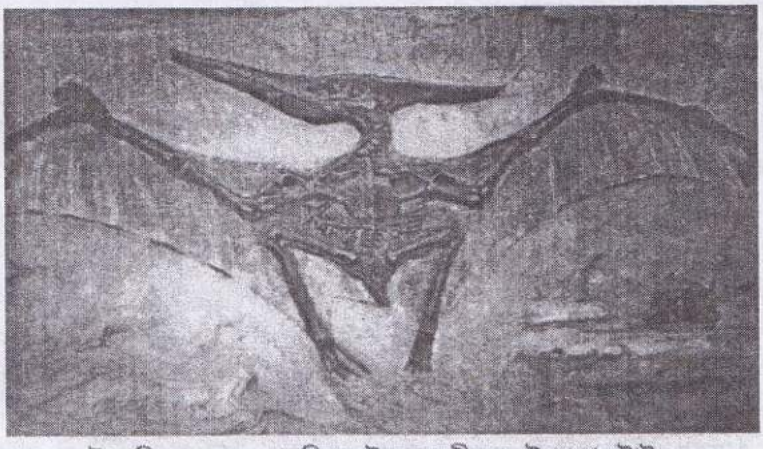
ডাইনোসর প্রাধান্যের যুগেও স্থলে সরীসৃপরা ছিল, যদিও তারা তখন সেখানে প্রাধান্য হারিয়েছে। সপুষ্পক উদ্ভিদের সঙ্গে কীট পতঙ্গও যে অভাবনীয় বৈচিত্র লাভ করেছিল তা বলা বাহুল্য। ওদিকে সরীসৃপরা সমুদ্রেও ছিল। তাদের কোন কোনটি সেখানে শুশুক অথবা ডলফিনের আকৃতি নিয়েছিল। অতি সম্প্রতি সে সময়কার বিশাল আকৃতির সামুদ্রিক সরীসৃপের নূতন ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া সরীসৃপদের এনাপসিড ধারা সেখানে সামুদ্রিক কচ্ছপে রূপ পেয়েছিল। সরীসৃপের যেই মূল ধারা থেকে ডাইনোসর

এসেছে সেই একই ধারা থেকে এসেছিল কুমির গোষ্ঠির প্রাণিরা। এরা এক সময় স্থলের সরীসৃপ ছিল, পরে জলে গিয়েছে, উভচর হয়েছে। একই রকম ঘটনা পরে স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রেও দেখা গেছে সিন্ধুঘোটক, সীল ইত্যাদির ক্ষেত্রে। জলজ প্রাণির মধ্যে অবশ্য তখনো এমোনয়েডদের যথেষ্ট প্রাধান্য।

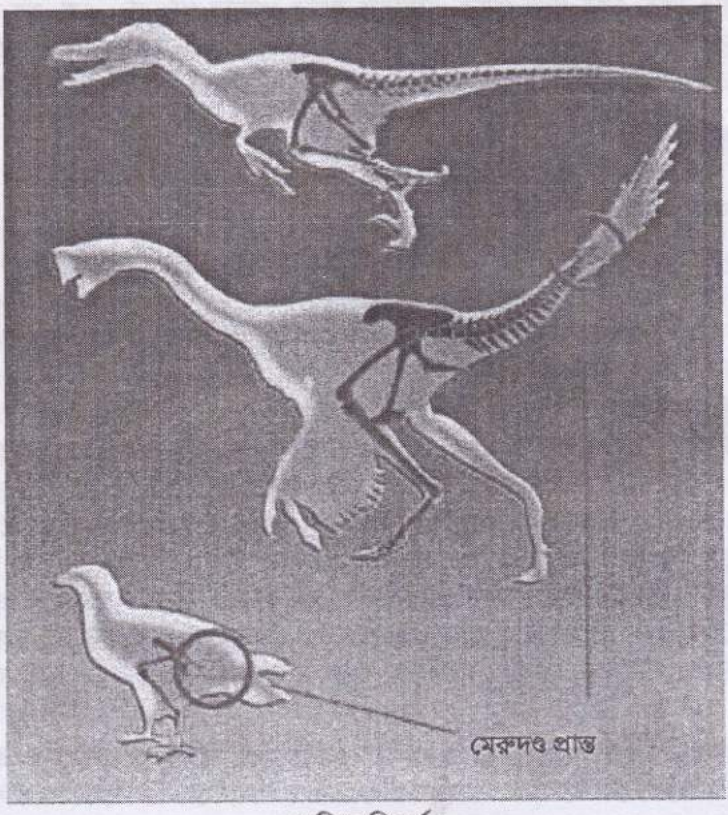
আকাশ বিজয়

প্রাণি উন্মুক্ত আকাশে ডানা বিস্তার করে উড়া শুরু করেছে ট্রায়াসিক যুগের শেষের দিকে, তবে পাখি হিসাবে নয়, উড়ুক্কু সরীসৃপ হিসাবে। সরীসৃপের এরকম একটি শাখা এ সময় আকাশমুখি হয়েছিল, তাদের বলা হয় টেরোসর। এদের সব চেয়ে পরিচিত উদাহরণ হলো টেরোডেকটাইল। ডানার এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ১৫ মিটার লম্বা, দীর্ঘ লেজ, দাঁতালো টেরোডেকটাইল ফসিল পাওয়া গেছে। পরে অপেক্ষাকৃত ছোট দাঁতহীন বেঁটে টেরোসর ফসিলও পাওয়া গেছে। টেরোসরের ডানা পালকের ছিলনা, ছিল চামড়ায় গড়া। এর সামনের উপাঙ্গে চতুর্থ আঙ্গুলটি অনেক লম্বা হয়ে ডানার সামনের কিনারা তৈরি করতো, আর ডানার পেছনের কিনারাটি পায়ের সঙ্গে আটকানো থাকতো। এদের গায়ে পশম ছিল– শরীরের তাপ রক্ষায়। মনে করা হয় যে ইতোমধ্যে এরা উষ্ণ রক্তের অধিকারী হয়ে উঠেছিল। ডানা পায়ের সঙ্গে আটকানো বলে এরা সাবলীল ভাবে হাঁটতে পারতোনা। আসলে হাঁটার জন্য এই ডানা ও পেছনে পা দুটি– চারটি অঙ্গই ব্যবহৃত হতো। মঙ্গোলিয়ায় সম্প্রতি আবিষ্কৃত পূর্ণাঙ্গ টেরোসর ফসিল থেকে এই ব্যাপারগুলো স্পষ্ট হয়েছে।

টেরোসরের এবং পরে পাখির আকাশ বিজয় জীবের ইতিহাসে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ যে সব ভূবন এতদিন জীবের প্রায় অব্যবহৃত ছিল সেই আকাশ বিচরণের ফলে সেগুলোর দখল তারা নিতে পেরেছে– যেমন গাছের উচ্চ মগডালে, শামিয়ানায় ইত্যাদি। ফলে সৃষ্টি হয়েছে নূতন নূতন জীবনযাত্রা, উপর থেকে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ইত্যাদি। আর এসবের সুযোগে ওদের মধ্যে এসেছে নূতন প্রাণিবৈচিত্র। কিন্তু ঐ সরীসৃপ



ট্রায়াসিক যুগের শেষদিকে উড়ুক্কু সরীসৃপ টেরোডাকটাইল



পাখির বিবর্তন

কেন উড়ার চেষ্টা করতে গিয়েছিল, আর এভাবে আকাশে ডানা মেলার বিবর্তন সুবিধাই বা কী ছিল? খুব সম্ভব তাদের ডানা বিবর্তিত হয়েছিল গাছের উপরের শাখা থেকে নিচের শাখায় লাফ দিয়ে নামার সময় ডানায় ভর করে গ্লাইডিং করে নামার সুবিধা। এটি ঠিক ওড়া ছিলনা, বাতাসে ভেসে ধীরে ধীরে দূরে গিয়ে নামা মাত্র। পতঙ্গভোজী এই সরীসৃপগুলোর এভাবে পতঙ্গের খোঁজে গাছে গাছে বিচরণের সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। এই গ-াইডিং ক্ষমতা থেকে পরে ডানার ওড়ার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছিল। টেরোসররা অবশ্য শেষ পর্যন্ত টেকেনি, পাখিদের কাছেই তাদেরকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল আকাশের অধিকার।

এই পাখির আবির্ভাব হয়েছে আরো পরে জুরাসিক যুগে। এরপর এক সময় টেরোসর-রা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও পাখিরা পরবর্তীকালে দারুণ উন্নতি করেছে- সমসাময়িক অনেক গোষ্ঠির চেয়ে বেশি বৈচিত্রে বিকশিত হতে পেরেছে। টেরোসরের সঙ্গে পাখির বেশ কিছু তফাৎ রয়েছে। পালক বিবর্তিত হয়েছে পাখির মধ্যেই। তাছাড়া তাদের ক্ষেত্রে সামনের দুটি অঙ্গ সম্পূর্ণ স্বাধীন ডানায় বিবর্তিত হয়েছে এবং পেছনের দুটি স্বাধীন পায়ে। ওড়ার সময় এখন শুধু ডানাই নড়েছে আর হাঁটার সময় ব্যবহৃত হয়েছে শুধু পা। কাজেই তারা ওড়া ও হাঁটা দুটিই সাবলীলভাবে করতে পেরেছে। এটি সম্ভব হয়েছে পালকের গুণে। প্রত্যেকটি পালক খুব হালকা কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ দৃঢ় এর নলাকৃতি দণ্ডের কারণে।



মধ্য জুরাসিক যুগে আদি পাখির ফসিল (~ ১৭ কোটি বছর)
আর্কিওপটেরিক্সঃ পালকের ডানা সহ পাখি-সদৃশ প্রথম ফসিল

পালকে গড়া ডানাকে তাই সামনের কিনারায় লম্বা আঙ্গুল আর পেছনের কিনারায় পা দিয়ে সাপোর্ট দিতে হয়নি টেরোসরের মত। চীনে আবিষ্কৃত দশ কোটি বছরের পুরানো ফসিলে প্রথম পাখি সদৃশ প্রাণির হদিশ পাওয়া গেছে– যার নাম দেয়া হয়েছে আর্কিওপট্রিক্স। এতে পালকে গড়া ডানার স্পষ্ট ছাপ দেখা গেছে এবং সেই সঙ্গে ছোট থেরোপড ডাইনোসরের আদলে লম্বা গলা, ছোট মাথা, লম্বা লেজ, ডানার সামনে নখর (সামনের পা থেকে বিবর্তিত বলে), ঠোঁটের সঙ্গে দাঁত। এতে আজকের পাখির আদল যেমন আছে, সেদিনের ডাইনোসরেরও। এর থেকে মনে করা হয় যে ছোট থোরাপড ডাইনোসরদের একটি গোষ্ঠিই ধীরে ধীরে পাখিতে বিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ আজ ডাইনোসর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত বটে, কিন্তু আমাদের চোখের সামনেই তাদের পাখি উত্তরসূরিরা প্রতি মুহূর্ত তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আর্কিওপট্রিক্সের কালের আগের বহু থেরোপড ডাইনোসরদের যে পালক ছিল সেই প্রমাণ পাওয়া গেছে, যদিও সে পালক উড়ার জন্য ছিলনা। তবে পাখির উৎস নিয়ে কিছুটা বিকল্প মতও রয়েছে। সেই মতে পাখিরা ঐ থেরোপডদের সরীসৃপ পূর্বসূরিদের থেকে একটি ভিন্ন শাখায় সরাসরি বিবর্তিত হয়েছে। কাজেই সেই থিওরি মতে পাখি ডাইনোসরের নিকট জ্ঞাতি, তাদের সাক্ষাত উত্তরসূরি নয়। পাখির পূর্ববর্তীদের মধ্যে যে পালক বিবর্তিত হয়েছিল উড়ার জন্য নয়, অন্য কোন কারণে, এটি বুঝা যায় ফসিল থেকে তাদের দেহ গঠনে পালকের অবস্থান দেখে। হয়তো শরীরে তাপ রক্ষার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল এটি। অথবা হয়তো কীট পতঙ্গ

থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, কিংবা যৌন প্রজননে আকর্ষণীয় হবার জন্য। সে যাই হোক, এক পর্যায়ে এগুলো উড়ার মত কাজেও সুবিধাজনক হওয়াতে ধীরে ধীরে সেদিকেই বিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে খুব সম্ভব শুধু গাছ থেকে গাছে, বা মাটিতে লাফ দেবার সময় দিক ঠিক রাখার জন্য বাতাসে হালের মত ব্যবহার করেছে ডানাকে। পরে সত্যি সত্যি উড়ার কাজেই লেগেছে। আমরা আগেও দেখেছি বিবর্তন সব সময় নূতন ব্যবস্থা তৈরি করেনা, ইতোমধ্যে থাকা ব্যবস্থাকে নূতন নূতন কাজে লাগায়। উড়ার জন্য পাখিকে অবশ্য উষ্ণ রক্তের হতে হয়েছে, টেরোসরকেও তাই হতে হয়েছিল। উড়ার জন্য যে পেশী চালনা করতে হয়, এবং শরীরের নানা চলৎ ব্যবস্থার যে সমন্বয় দরকার, তার জন্য দেহতাপ সমান রাখা খুবই জরুরী। এদিক থেকে স্তন্যপায়ীর সঙ্গে পাখির কিছু সাযুজ্য রয়েছে।

আর্কিওপট্রিক্সের দিন থেকে পাখির মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন এসেছে। এর মুখের দাঁত মিলিয়ে গেছে। দীর্ঘ লেজের মধ্যে মেরুদণ্ডের যে বিস্তৃতি ছিল তা ক্রমে কমে এসেছে। সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে নিজেদের মধ্যে প্রচুর প্রজাতি বৈচিত্র। সপুষ্পক উদ্ভিদের বৈচিত্রের সঙ্গেই তাল রেখেছে এরা, কারণ গাছে গাছে বিচরণকারী পাখির সঙ্গে ফুল-ফলের সম্পর্ক ছিল অতি নিকট। কাজেই সপুষ্পক উদ্ভিদের সৃষ্ট হাজারো ভূবনের সুযোগ নিয়ে পাখিবৈচিত্র ডানা মেলেছে। একই ঘটনা ঘটেছে পতঙ্গের ক্ষেত্রে আরো সফল ভাবে– তাদের বৈচিত্র আরো অনেক বেশি। বিভিন্ন সময়ে পাখির যত প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে তার মোট সংখ্যা দেড় লক্ষের মত। আজ অবশ্য আমাদের জানা পাখি প্রজাতির সংখ্যা দশ হাজার, কীটপতঙ্গ ছাড়া অন্য যেকোন প্রাণি গোষ্ঠি থেকে বেশি।

সাড়ে ছয় কোটি বছর আগের সেই ক্রেটাশিয়াস যুগ শেষে– স্থলে ডাইনোসর প্রাধান্য টিকে থাকলেও অনেকের মতে তাতে ইতোমধ্যে ভাটা পড়তে আরম্ভ করেছিলো। ওদিকে আকাশে টেরোসররা তখনো বিরাজ করছিল যদিও পাখিদেরও সেখানে যথেষ্ট উপস্থিতি ইতোমধ্যে। ফুল ফোটার ঐ দিনগুলোতে স্তন্যপায়ীরাও ছিল। এমনকি তাদের মধ্যে বেশ একটু বিশিষ্ট হয়ে বানর-পূর্বসূরি প্রাইমেটও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ওরা সবাই ছোট, আনাচে কানাচে অনেকটা লুকিয়ে থাকা, প্রধানত ডাইনোসরদের ভয়ে। এমনি একটি দিনে পৃথিবীতে আছড়ে পড়েছিল একটি ভয়ঙ্কর বিশাল উল্কা– যা এনেছিল ক্রেটাশিয়াস-টারশিয়ারি গণবিলুপ্তি বা কে-টি বিলুপ্তি। এটি আমাদের জানা সর্বশেষ প্রাকৃতিক গণবিলুপ্তি, যা আমাদের আসাকে হয়তো ত্বরান্বিত করেছিল।

সেই বিধ্বংসী উল্কা ও তারপর

কে-টি'র রহস্য উদ্ধার

যে ঘটনাটি অল্প কিছু দিনের মধ্যে পৃথিবীর স্থলের প্রধান প্রাণিকূল ডাইনোসরদের এবং সমুদ্রের প্রধান প্রাণিকূল এমোনয়েডদের, ও আরো অনেক গোষ্ঠির যবনিকা টেনে দিয়েছিল তা ঘটেছিল সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে। এক বসন্ত দিনে মেক্সিকোর ইউকাতান নামক স্থানের সাগর পারে তার সূত্রপাত। রীতিমত গোয়েন্দা কাহিনীর মত কিছু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে আমরা এখন এই ঘটনাটি সম্পর্কে বেশ ভাল ভাবেই জানি। আসলে অতীতের পাঁচটি গণবিলুপ্তির মধ্যে এই একটি সম্পর্কেই আমরা সব সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে প্রায় নিখুঁতভাবে বুঝতে পেরেছি।

১৯৮০ সালে ভূতত্ত্ববিদ লুই আলভারেজ ইতালীর রোমের কাছে পাওয়া কিছু শিলার উপর গবেষণা করছিলেন যেটি মনে হচ্ছিল পর পর দুই ভূ-তাত্ত্বিক যুগের দু'স্তর শিলার একটি সংযোগ স্থল। প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল শিলাটির বয়স নির্ণয় করা। শিলাখণ্ডের বয়স নির্ণয় করতে সাধারণত পদার্থবিদ্যার পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়– তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবক্ষয়ের হার এবং শিলাতে এরকম পদার্থের বিভিন্ন আইসোটোপের অনুপাত



কে-টি গণ-বিলুপ্তির কারণ সন্ধান

ক্রেটাশিয়াস ও টারশিয়ারি স্তরের সংযোগ স্থলে ইরিডিয়াম

থেকে বয়স পাওয়া যায়। পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ রকম পদ্ধতি আমরা দেখেছি। আলভারেজ এটি করতে সাহায্য চাইলেন তাঁর বাবা পদার্থবিদ ওয়াল্টার আলভারেজের। এটি করতে গিয়ে বাবা আলভারেজ স্পষ্ট প্রমাণ করলেন যে স্তরদুটির একটি ক্রেটাশিয়াস যুগের ও অন্যটি এর পরের টারশিয়ারি যুগের। আর তিনি লক্ষ্য করলেন এর দুইয়ের সংযোগ স্থলে ৩০-৪০ মিলিমিটার পুরু অংশটিতে বিরল ধাতু ইরিডিয়ামের ঘনত্ব আশ্চর্যজনকভাবে বেশি। বয়সের হিসাবে ঐ সংযোগ স্থলটির বয়স হচ্ছে এখন থেকে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগের। ইরিডিয়াম পৃথিবীর শিলায় আসে শুধু বাইরের মহাশূন্য থেকে– প্রধানত উল্কাপাত, ধূমকেতু ইত্যাদির দ্বারা বাহিত হয়ে। ঐ জায়গায় ইরিডিয়ামের পরিমাণ শিলার উপর-নিচ নানা বিন্দুতে মেপে বুঝা গেল শিলাস্তর দুটির ঐ সংযোগ স্থলে ইরিডিয়ামের ঘনত্ব দ্রুত অনেক বেড়ে গিয়েছিল, তার থেকে সামান্য উপরে ও নিচের শিলায় এটি অনেক কম। তাতে মনে হয়েছে যে বড় রকমের একটি উল্কাপাতে ঠিক এ সময়টিতেই সাময়িক ভাবে ইরিডিয়াম বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আবিষ্কারের অল্প কিছুদিনের মধ্যে ইতালী থেকে অনেক দূরে নিউজিল্যাণ্ডে, ডেনমার্কে একই রকম ক্রেটাশিয়াস ও টারশিয়ারির সংযোগ স্থলের অর্থাৎ ঠিক একই সময়ের শিলা আবিস্কৃত হয়েছে, এবং তাতেও ইরিডিয়াম ঘনত্বের হঠাৎ স্বল্পস্থায়ী এরকম উর্ধ্বগতি দেখা গেছে। শুধু তাই নয় পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে এরকম হুবহু ৩২টি নমুনা খুঁজে পাওয়া গেল। স্পষ্ট বুঝা গেল উল্কাপাতটির প্রভাব পৃথিবীব্যাপী হয়েছিল। এর ফলে যে ধূলি-মেঘের সৃষ্টি হয়েছিল তা বিশ্বময় ছড়িয়ে সেই সময়ের শিলাতে একই ভাবে সর্বত্র ইরিডিয়াম ছড়িয়েছে। ইরিডিয়ামের ঘনত্বের পরিমাণ এবং পৃথিবীব্যাপী এর বন্টন নানা নমুনা থেকে হিসেব করে উল্কাটির আকার, তার অভিঘাতের তীব্রতা ইত্যাদি বেশ ভালভাবেই নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এতে বুঝা গেছে উল্কাটির ব্যাসকে প্রায় ১০ কিলোমিটার হতে হবে, আর এর সৃষ্ট খাদকে হতে হবে অন্তত ১০০ কিলোমিটার ব্যাসের।

এসব জানার পর পৃথিবীর নানা জায়গায় এরকম উল্কা-সৃষ্ট খাদের অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। ঐ বিশেষ উল্কার দ্বারা সৃষ্টি হতে হলে এরকম খাদের আকার ও তার বয়স মিলে



মেক্সিকো উপসাগরে যেখানে উল্কাপাতটি হয়েছিল



উল্কা-সৃষ্ট প্রকাণ্ড গর্তটি (৩০০ কিলোমিটার ব্যাস)

যেতে হবে। পৃথিবীর নানা জায়গায় আবিস্কৃত এ রকম কিছু খাদ এ সব শর্ত পূরণের কাছাকাছি গেলেও নিঁখুত ভাবে শর্ত পূরণ করা খাদটি পাওয়া গেল বেশ কিছু দিন পর ১৯৯২ সালে– মেক্সিকোর ইউকাতানে চিক্সালুব খাদ। বর্তমানে খাদটি ইউকাতানের সমুদ্রতীরে, অংশত সাগরের মধ্যে। কিন্তু ঐ উল্কাপাতের সময় মেক্সিকোর সমুদ্রতীর আরো পশ্চিমে ছিল, তাই উল্কাপাতটি পুরা সমুদ্রের মধ্যেই হয়েছিল। অভিঘাতের ফলে গঠিত এই খাদের শিলাখণ্ডগুলোর বয়স নির্ণয় করে পাওয়া গেল ঠিক সাড়ে ছয় কোটি বছর। খাদটির ব্যাস ৩০০ কিলোমিটার। এর প্রভাব পাওয়া গেল অনেক দূর-দূরান্তে। যেমন সৃষ্ট উত্তাপে বালি গলে গিয়ে তৈরি হওয়া অসংখ্য কাচের দানা ও ডেলা এর অভিঘাতে ছিটকে গিয়ে পড়েছে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো ও কলরাডো অঞ্চল পর্যন্ত। এটি যে কত বড় একটি আঘাত ছিল এবং এর প্রভাব সেদিনের জীবজগতের উপর কীভাবে পড়েছিল তা সাম্প্রতিক গবেষণায় বেশ বুঝা যাচ্ছে।

কে-টি গণবিলুপ্তি কীভাবে ঘটলো ?

উল্কাটির অভিঘাতের ফলে যে ভূমিকম্প দেখা দিয়েছিল তার শক- তরঙ্গের বিস্তৃতি গিয়েছিল অনেক দূর। একদিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অন্যদিকে ইউরোপে কোয়ার্টজ স্ফটিকের উপর এই শক্-তরঙ্গের স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ভূমিকম্পের সঙ্গে এসেছে সমুদ্রে সুনামি যা এক উপকূল থেকে অন্য উপকূলে চলে গেছে বিস্তৃত জলোচ্ছ্বাস ঘটিয়ে। আর এসেছে থার্মাল ব্লাষ্ট বা তাপাঘাত– যার প্রভাবে ব্যাপক বনাঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী দাবানল সৃষ্টি হয়েছিল। এ সবের ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই ধ্বংস হয়েছিল অনেক জীবকূল। তারপর এসেছে আরো ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী ধ্বংস প্রক্রিয়া। উল্কাপাতে সৃষ্ট ধূলি-মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল পৃথিবী। এটি অনেকদিনের জন্য সূর্যকে ঢেকে ফেলেছিল, সর্বত্র নেমে এসেছিল অন্ধকার ও শৈত্য। এ ধরনের একটি দৃশ্যপট এক সময় ব্যাপক পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণেও হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যা 'নিউক্লিয়ার শৈত্য' নামে পরিচিত। সাড়ে ছয় কেটি বছর আগে এ ধরনের পরিস্থিতি বাস্তবে ঘটেছিল ঐ উল্কাপাতের ফলে।

ধূলি-মেঘে দীর্ঘ সময় সূর্য ঢাকা পড়ার পরিণতি জীবজগতে ভয়াবহ ভাবে এসেছিল। এতে সালোক-সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, উদ্ভিদ ধ্বংস করে যা প্রাণির খাদ্য চেইন কেটে দিয়েছিল। ধূলি-মেঘের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডে সৃষ্ট ভস্ম কণার মেঘ। তাছাড়া ব্যাপক ভাবে চুণাপাথর বাষ্পীভূত হয়েও বায়ুমণ্ডলে কার্বনের আধিক্য ঘটিয়েছিল। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে ক্রমাগত এসিড বৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর বিস্তৃত অঞ্চলে। এসবের ফলে ব্যাপক হারে উদ্ভিদ ও প্রাণি মারা গিয়েছিল। এই প্রক্রিয়াটি চলেছিল কয়েক বছর ধরে এবং এসময়েই ঘটেছিল কে-টির সব চেয়ে ভয়াবহ বিলুপ্তিগুলো।



কে-টি গণবিলুপ্তিতে ধ্বংস হয়েছে স্থলের প্রধান প্রাণি ডাইনোসররা
জলের প্রধান প্রাণি এমোনয়ডরা

কিন্তু বিজ্ঞানীরা মনে করছেন উল্কাপাত আর তার কয়েক বছরের মারাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলোই এই পুরো গণবিলুপ্তির একমাত্র কারণ ছিলনা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মেয়াদের আরো কিছু বিষয়। এ সময় গুরুতর জলবায়ু পরিবর্তন ও ব্যাপক আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাতেরও কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তারও বেশ কিছু অবদান বিলুপ্তিতে ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সব চেয়ে বড় অবদান যে ঐ উল্কাপাতের সেটি এখন নিঃসন্দেহ।

ধ্বংসের পর স্তন্যপায়ী বিকাশ

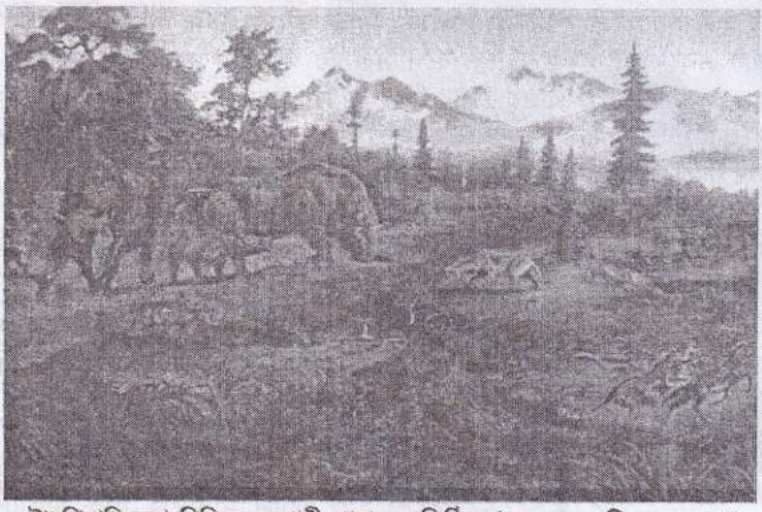
কে-টির ধ্বংসযজ্ঞের পর শুরু হয়েছে ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের টারশিয়ারি যুগ এবং তারপর এসেছে কোয়াটারনারি যুগ। এই দুই মিলে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে থেকে আজ অবধি সময়ের ইতিহাস। নানা কারণে এটি আমাদের পরিচিত পৃথিবীর ইতিহাস, কিছুটা আমাদের নিজেদের ইতিহাসও বটে। কে-টি বিলুপ্তি থেকে বেঁচে গিয়ে এবং আরো বিবর্তিত হয়ে এতে যারা নানা কালে বাস করেছে তাদের অধিকাংশের উত্তরসূরিদের এখনো আমরা আমাদের চার পাশে দেখতে পাই। সপস্পুক উদ্ভিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বেঁচে যাওয়াতে পরে ওদের আরো বড় সমারোহ সৃষ্টি হতে পেরেছে, যেমন হয়েছে পাখির আর কীট পতঙ্গের। তাছাড়া স্থলে সরীসৃপ ও উভচরের অনেক প্রজাতি, এবং জলে মাছের ও অন্যান্য প্রাণির বহু প্রজাতি বেঁচে গিয়ে নূতন প্রাণ পেয়েছে। তবে সব চেয়ে বড় কথা এটি স্তন্যপায়ীদের প্রাধান্যের যুগ, যাদের সঙ্গে আমরা জীবতাত্ত্বিক একই শ্রেণিতে রয়েছি। এ যুগের শুরুটায় অবশ্য তাদের অবস্থা ছিল খুব কাহিল। এর আগে ডাইনোসরদের দাপটে এই ছোট বিনীত স্তন্যপায়ীরা বেশির ভাগই গুহায়, বা গর্তে

লুকিয়েই বাস করতো। কে-টি ধ্বংসযজ্ঞের ধাক্কা তাদের উপর দিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু ছোট বলে এবং গর্তে লুকানো ছিল বলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ তারা কম হয়েছে। কে-টি বিলুপ্তির দুঃসময়টি কেটে যাওয়ার পর কিন্তু তাদের জন্য এসেছে সুবর্ণ সময়। বনভূমি ও ছোট ছোট প্রাণির প্রাচুর্য যখন আবার ফিরে এসেছে, অনুকূল পরিবেশে, উন্নততর মস্তিষ্ক ও উষ্ণ রক্তের অধিকারী, অধিক দক্ষ এই স্তন্যপায়ীরা তখন দ্রুত বিস্তার লাভ করতে ও প্রজাতি বৈচিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছে। এই ঘটনাটি আমাদের দিক থেকে অত্যন্ত ভাগ্যের একটি বিষয়– কে-টিতে স্তন্যপায়ীর বেঁচে যাওয়া ও তাদের পরবর্তী বিকাশ। আরো বড় ভাগ্যের কথা ঐ বেঁচে যাওয়া স্তন্যপায়ীদের মধ্যে ছিল আদি কিছু নগণ্য প্রাইমেট, যারা স্তন্যপায়ীদের সুবিধাজনক অবস্থানের মধ্যে আরো বেশি সুবিধায় নিজেদেরকে নিয়ে যেতে পেরেছিল, তাদের উন্নততর মস্তিষ্কের ও সামাজিক চিন্তনের সুবাদে। তারাই ছিল আমাদের অপেক্ষাকৃত সরাসরি পূর্বসূরি।

অন্যান্য প্রাণির সঙ্গে তুলনায় স্তন্যপায়ীদের বৈশিষ্টগুলো কোথায়? আমাদের সঙ্গেও তাদের অধিক মিলের জায়গাটিও বা কোথায়? স্পষ্টত স্তন্যপায়ীরা প্রাণি বিবর্তনে অন্যান্যদের থেকে কিছু ভিন্ন কৌশল অনুসরণ করেছে। তাদের একটি গুরুত্ব ছিল উন্নততর মস্তিষ্কের দিকে যাওয়া। সব স্তন্যপায়ীদের মধ্যে মস্তিষ্কের সার্বিক গঠনে যথেষ্ট মিল রয়েছে, যা অন্যদের সঙ্গে নাই। মানুষের মস্তিষ্কের মৌলিক গঠনও এর সঙ্গে অভিন্ন। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশগুলো, তাদের পরস্পর সংযোগ ও কাজ ইত্যাদিতে আমরাসহ সব স্তন্যপায়ীদের প্রচুর ঐক্য রয়েছে। উষ্ণ রক্তের অধিকারী হয়ে তার পূর্ণ সুযোগগুলো স্তন্যপায়ীরা নিয়েছে যা আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি। এ সবের ফলে তাদের সকল কাজে এমন সব দক্ষতা এসেছে যা অন্যদের মধ্যে বিরল। স্তন্যপায়ীদের এ সব গুণগুলোই প্রাইমেটের মধ্যে আরো অনেক উচ্চকিত হয়েছে, এবং প্রাইমেটের এক সদস্য মানুষের মধ্যে অভাবনীয় রকমে বিকশিত হয়েছে। মানুষের সঙ্গে অন্য স্তন্যপায়ীদের ঐক্য সহজেই স্পষ্ট হয় যখন আমরা দেখি আমাদের নিজেদের সম্পর্কে অনেক শারীরবৃত্তীয় গবেষণা চলে অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের উপর– বিশেষ করে ইঁদুর, গিণিপিগ ও বানরের উপর। এমন কি বুদ্ধিমত্তার, আচরণের ও শেখার পদ্ধতি ইত্যাদি উচ্চতর গুণাগুণেরও গবেষণা মানুষের উপর করার আগে করা হয় এসব প্রাণির উপর। আমাদের দেহগত সিষ্টেমগুলোর সঙ্গে তাদের সিষ্টেমের মিল আছে বলেই এটি সম্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের ডায়াবেটিস রোগে একসময় শূকরের প্যানক্রিয়াজ থেকে নিয়ে ইনসুলিন দিতে হতো। আমাদের জন্য নূতন ওষুধ আবিস্কৃত হলে তা প্রথমে প্রয়োগ করা হয় ইঁদুর, গিণিপিগ বা বানরের উপর। আমাদের অনুরূপ রোগ তাদের মধ্যেও দেখা যায়, তাদের উপর ওষুধের প্রতিক্রিয়া দেখে আমরা আমাদের উপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারি।

পৃথিবীর চেহারায় পরিবর্তন

এ সময় লরেশিয়া আর গণ্ডোয়ানাল্যান্ডের মহাদেশগুলো অনেকটা আলাদা হয়ে ক্রমে ক্রমে আজকের অবস্থানে চলে এসেছিল। ভারত গণ্ডোয়ানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইউরেশিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া ও আন্টার্কটিকা একত্রাবস্থায় গণ্ডোয়ানা



টারশিয়ারি যুগে বিচিত্র স্তন্যপায়ী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত (৬.৫-২ কোটি বছর আগে)
এ সময় অনেক স্তন্যপায়ী বিশালকায় হয়ে উঠেছিল

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। চার কোটি বছর আগে পর্যন্ত পরস্পর সংলগ্ন থেকে ঐ সময় এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দক্ষিণ আমেরিকা গণ্ডোয়ানা থেকে এবং উত্তর আমেরিকা লরেশিয়া থেকে আগেই বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। সাত কোটি বছর আগে পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা সংযুক্ত থাকলেও এই সময় এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে এখন থেকে মাত্র ৩৫ লক্ষ বছর আগে তারা আবার সংযুক্ত হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। বেরিং প্রণালীতে এশিয়া আর উত্তর আমেরিকা বার বার সংযুক্ত হয়েছে, আবার বিচ্ছিন্ন হয়েছে। শেষবার ১২ হাজার বছর আগে যখন সংযুক্ত ছিল খুব সম্ভব তখনই মানুষ প্রথমবারের মত উত্তর আমেরিকায় প্রবেশ করেছে এশিয়া থেকে। এর আগে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় কোন মানুষ ছিলনা। পরে শিগ্‌গির এশিয়ার সঙ্গে সংযোগ আবার বিচ্ছিন্ন হয়েছে এখন যেমনটি আছে। এই সব সংযুক্তি ও বিচ্ছিন্ন হওয়া পৃথিবীতে জীব জগতের অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক বিবর্তন ও বন্টনের উপর অনেক প্রভাব রেখেছে।

মহাদেশগুলো বিচ্ছিন্ন হবার আগে আগে লরেশিয়াতে আজকের পরিচিত বনভূমিগুলো- যেমন পাইন জাতীয় কনিফার বন, তুন্দ্রা বন, নাতিশীতোষ্ণ বন ইত্যাদি মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। নিরক্ষীয় গণ্ডোয়ানাতে রেইন ফরেষ্ট বা বাদলবনগুলো এক সঙ্গে একইভাবে গড়ে উঠেছিল। আজ বিভিন্ন মহাদেশে আমরা সে সব বনের উত্তরসূরিদের পাচ্ছি। এর মধ্যে পালাক্রমে বরফের যুগ এসেছে এবং গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই পরিবর্তনগুলো ঘটেছে। বরফের যুগে মেরু অঞ্চলের জমা বরফ হিমবাহ হয়ে নেমে এসেছে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দিকে। দক্ষিণ ইউরোপের মত যে সব অঞ্চল সাধারণত বেশ মৃদু আবহাওয়ায় থাকে তাও তখন তীব্র শীতের আওতায় চলে গিয়েছিল। এর প্রভাব দেখা গেছে উষ্ণতর অঞ্চলেও। সেখানে বনভূমি সংকোচিত হয়ে স্থানে স্থানে উন্মুক্ত হয়ে গেছে, এবং সেসব জায়গায় বিস্তীর্ণ তৃণভূমি সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও কোথাও তৃণভূমি একেবারে বৃক্ষহীন– যেমন উত্তর আমেরিকার প্রেইরি, উত্তর আমেরিকা ও উত্তর এশিয়ার ষ্টেপস। আবার কোথাও কোথাও তৃণভূমির সঙ্গে আছে

ছড়ানো বৃক্ষ আর ঝোপ– যেমন আফ্রিকার সাভানা। তৃণভূমির সৃষ্টি স্তন্যপায়ী বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। গত প্রায় তিন কোটি বছর ধরে নানা রকম তৃণভূমিই হয়েছে স্তন্যপায়ীদের বড় লালন ভূমি। তৃণভোজিরা ঐ তৃণ খাওয়ার সুবিধা পেয়ে এবং মাংসাশি শিকারিরা ঐ তৃণভোজিদের খাওয়ার সুবিধা পেয়ে ওখানে বিকশিত হয়েছে।

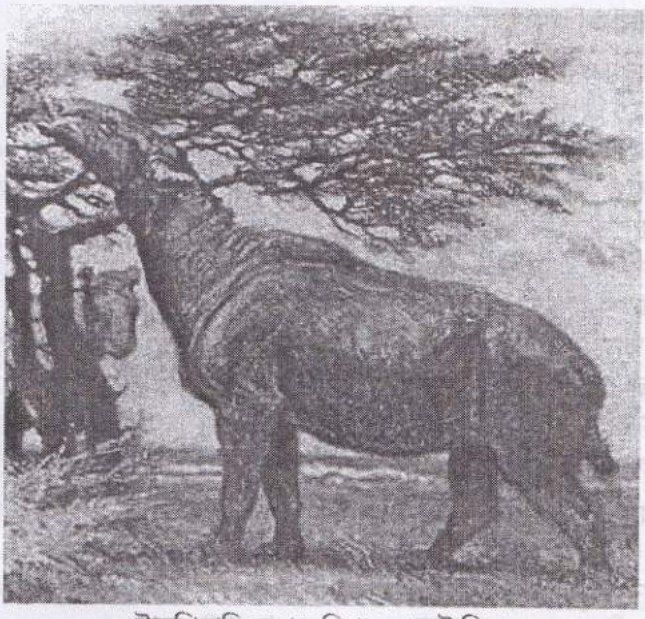
স্তন্যপায়ী ইতিহাস

বেজোড় আর জোড় আঙ্গুলের তৃণভোজিরা

স্তন্যপায়ীদের এখনো যারা আমাদের সঙ্গে বেশ ভালভাবে জড়িত বড়সড় প্রাণি তারা তৃণভোজি, এবং তৃণভূমির বাসিন্দা। ওদের সাধারণ নাম হলো উংগুলেট। পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা জোড় না বেজোড় তার উপর নির্ভর করে এদের দুই দলে ফেলা যায়। বেজোড় আঙ্গুলের দলে আছে ঘোড়া, জেব্রা, টাপির, গণ্ডার ইত্যাদি। আর জোড় আঙ্গুলের দলে আছে গরু, ভেড়া, হরিণ, জিরাফ, উট, শূকর ইত্যাদি। শুধু আঙ্গুলের ব্যাপারে নয় এই প্রত্যেক দলের সদস্যদের নিজেদের মধ্যে আরো বহু সাদৃশ্য রয়েছে।

বেজোড় আঙ্গুলের সদস্যদের কথা বলতে গেলে এদের মধ্যে ঘোড়া, গাধা, জেব্রা কাছাকাছি, একই উপদলে পড়ে। আদিতে এরা কুকুর সাইজের ছোট প্রাণি হিসেবে বিবর্তিত হয়েছে, তারপর কালক্রমে আকারে বড় হয়েছে। ঘোড়া উত্তর আমেরিকায় উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু ৫০ লাখ বছর আগে সেখান থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ভাগ্যিস এর আগে বর্তমান বেরিং প্রণালীর জায়গায় স্থল-সেতু দিয়ে উত্তর আমেরিকা ও এশিয়া যুক্ত থাকার কারণে সেই পথে কিছু ঘোড়া এশিয়ায় ও পরে আফ্রিকায় ও ইউরোপে গিয়েছিল। তাই এটি টিকে আছে। ২ কোটি বছর আগে ঘোড়া বৈচিত্রের তুঙ্গে ছিল, অন্তত ৩০টি বিভিন্ন প্রজাতি ছিল এর। বেজোড় আঙ্গুলের অন্য একটি উপদলে আছে টাপির আর গণ্ডার। এরা কিন্তু টারশিয়ারি যুগে ২ কোটি বছর আগে পর্যন্ত অতি বিশাল ছিল। পরে ক্রমে আকারে ছোট হয়ে বর্তমানের আকার পেয়েছে। টাপিরও উত্তর আমেরিকায় উদ্ভূত, কিন্তু পরে সেখান থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যদিও ইতোমধ্যে অন্যত্র গিয়েছে বলে টিকে আছে।

জোড় আঙ্গুলের উঙ্গুলেটরাও আমাদের খুবই পরিচিত। এদের মধ্যে শূকর জাতীয় প্রাণিরাই বোধ হয় সব চেয়ে প্রাচীন। এদের ৫ কোটি বছরের পুরানো ফসিল পাওয়া গেছে। এদের একটি শাখা পরে জলহস্তী হিসেবে পানিতে ও ডাঙায় সমানে স্বচ্ছন্দ রয়েছে। গো-মহিষাদি সব প্রাণিও এই জোড় আঙ্গুলের দলে পড়ে। তা ছাড়া উট, হরিণ এরাও রয়েছে। এদের একটি বৈশিষ্ট হলো দু'একটি ছাড়া ওরা সবাই জাবর কাটে। উটও উত্তর আমেরিকায় সৃষ্টি হয়ে সেখানে বিলুপ্ত আর একটি প্রাণি। ইতোপূর্বেও আমরা দেখেছি কী ভাবে এটি এখন নানা জায়গায় নানা প্রজাতি হিসেবে পাওয়া যায় এককুঁজি উট, দুইকুঁজি উট, লামা, আলপাকা ইত্যাদি। আদিতম উটের ফসিল উত্তর আমেরিকায় পাওয়া গিয়েছে– ৪ কোটি বছর পুরানো। ২ কোটি বছর আগে তার প্রচুর প্রজাতি



টারশিয়ারি যুগের বিশালকায় ট্যাপির

বিচ্ছুরণ ঘটেছিল। ১০ লক্ষ বছর আগে তখনকার স্থল-সেতু দিয়ে এটি এশিয়ায় এসেছিল, আর মাত্র ১৫ হাজার বছর আগে জন্মভূমি উত্তর আমেরিকা থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জোড় আঙ্গুল দলের সদস্যদের মধ্যে গো-মহিষাদি আমাদের ঘনিষ্ঠতম হলেও এগুলো বিবর্তিত হয়েছে অন্য সবার পর। এই জাতীয় প্রাণির প্রথম ফসিল ২ কোটি বছর আগের এবং তাও উত্তর আমেরিকায় পাওয়া গেছে। তবে এদের প্রকৃত বিকাশ হয়েছে এশিয়ায় ও ইউরোপে। হরিণ গোষ্ঠির প্রাণিরা অবশ্য প্রথমে ইউরেশিয়ায় ৩ কোটি বছর আগে উদ্ভূত হয়ে পরে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছে।

উঙ্গুলেটদের মধ্যে যারা এখনো আছে তাদের কোন কোনটির কথা এখানে উল্লেখ করলাম। অন্য অনেকগুলো আগেই সারা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জলহস্তী জাতীয় এ দলের একটি প্রাণি ৪ কোটি বছর আগে ক্রমে পানিতে থাকার উপযুক্ত হয়ে বিবর্তিত হয়েছে। এরা ক্রমেই বাহ্যিকভাবে মাছের মত হয়ে উঠেছে স্তন্যপায়ীর বাকি সব বৈশিষ্ট বজায় রেখে। এরাই আজকের তিমি, শুশুক আর ডলফিনের পূর্বসূরি। এরকম পানিতে ফিরে যাওয়া অন্য গোষ্ঠিরও কিছু স্তন্যপায়ী আছে। যেমন ভালুক জাতীয় কিছু প্রাণী দুই কোটি বছর আগে থেকে এভাবে বিবর্তিত হয়ে সীল ও সিন্ধুঘোটক হয়েছে। পানিতে থাকার কিছু বিবর্তনগত সুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল বলেই এরা এভাবে বিবর্তিত হয়েছে। হয়তো সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হওয়ার ফলে এদের আবাস অগভীর সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল, তাই এভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে তাদের সুবিধা হয়েছিল। পরিবর্তনগুলো যথারীতি খুব ধীরে ধাপে ধাপে হয়েছে। মধ্যবর্তী অনেকগুলোর ফসিলের মধ্যে অতীতের স্থলবাসী স্তন্যপায়ীর আদল ও মাছের আদলের একটি মিশ্রণ পাওয়া গেছে। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় এরা স্থল ও জল উভয় স্থানে তখন বিচরণ করতো। সীল ও সিন্ধুঘোটকের ক্ষেত্রে সেই ভাব এখনো কিছু রয়ে গেছে।

অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ আমেরিকার মারসুপিয়ালরা

আট কোটি বছর আগে ক্রেটাশিয়াস যুগে স্তন্যপায়ীরা প্ল্যাজান্টাল ও মারসুপিয়াল এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। ভাঙ্গনরত গণ্ডোয়ানার সর্বত্র উভয়েই কমবেশি ছিল। সেখানে প্ল্যাসেন্টাল স্তন্যপায়ীরা বেশি বিকশিত হয়ে উঠার আগেই অস্ট্রেলিয়া ও আন্টার্কটিকা পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় গণ্ডোয়ানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ায় আর প্ল্যাসেন্টালরা তেমন এগোয়নি, বরং সেখানে মারসুপিয়ালরা বিকশিত হয়েছিল নানা বৈচিত্রে। আজকের ক্যাঙ্গারু, ওয়ালাবি, কোয়ালা, ওয়াম্বাটরা এ ভাবেই এসেছে। বলতে গেলে অন্যত্র প্ল্যাসেন্টালদের যত রকমের বৈচিত্র আছে– উংগুলেট, ইঁদুর জাতীয়, খরগোস জাতীয় সবগুলোর হুবহু প্রতিপক্ষ মারসুপিয়ালদের মধ্যেও আছে। আলাদা জায়গায় ভিন্ন গোষ্ঠির প্রাণি হিসেবে বিবর্তিত হলেও প্রতিপক্ষগুলো একই পরিবেশে একই নির্বাচনী চাপে একই রকম হয়ে উঠেছে, যাকে আমরা বিবর্তনের একাভিমুখিতা হিসেবে আগে দেখেছি।

মারসুপিয়ালরা দক্ষিণ আমেরিকাতেও যথেষ্ট বিকশিত হয়েছে প্রায় একই কারণে। সাত কোটি বছর থেকে দক্ষিণ আমেরিকা উত্তর আমেরিকা থেকেও বিচ্ছিন্ন ছিল। এ সময় দক্ষিণ আমেরিকা খুব সমৃদ্ধ স্তন্যপায়ী বৈচিত্রের অধিকারী হয়েছে যার অনেকখানিই তার একান্ত নিজস্ব। মারসুপিয়ালরা তো বটেই, সেখানে এই বিচ্ছিন্নতার সময় আরো অনেক প্রাণি বিবর্তিত হয়েছিল যাদের একান্ত নানা বৈশিষ্ট ছিল। কিন্তু ৩৫ লক্ষ বছর আগে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বর্তমান সংযুক্তির পর উভয় আমেরিকার মধ্যে ব্যাপক প্রাণি চলাচল ও বিনিময় ঘটে যা গ্রেট আমেরিকান ইন্টারচেঞ্জ নামে পরিচিত। এই বিনিময়ে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার প্রাণিকূল। অধিকতর আগ্রাসী উত্তরের প্রাণিদের চাপে তাদের অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

অন্যান্য নানা গোষ্ঠির স্তন্যপায়ী

তৃণভোজি বড় আকারের স্তন্যপায়ীর মধ্যে হাতির কথা উল্লেখ করতেই হয়। স্থলের প্রাণির মধ্যে এখন এটিই সর্ব বৃহৎ। হাতির ইতিহাসও বেশ সমৃদ্ধ। ২ কোটি বছর আগে হাতি গোষ্ঠির প্রাণির বৈচিত্র তুঙ্গে উঠে, তখন ১৬০টি বিভিন্ন প্রজাতির হাতি ছিল। প্রকাণ্ড ম্যামথ থেকে শুরু করে এক মিটার উঁচু বামন হাতি এর পরেও বিভিন্ন সময় ছিল। এখন শুধু দুটি হাতির প্রজাতি টিকে আছে– আফ্রিকান হাতি ও এশিয়ান হাতি। হাতি উত্তর আফ্রিকাতে উদ্ভূত হয়ে অস্ট্রেলিয়া ও আন্টার্কটিকা ছাড়া সব মহাদেশেই নানা রূপে ছড়িয়েছিল এক দিন। ৩৫ লক্ষ বছর আগে বেরিং স্থল-সেতু দিয়ে এশিয়া থেকে বিশাল ম্যাস্টডন্টগুলো উত্তর আমেরিকা গিয়েছিল– বর্তমান হাতি থেকে যা অনেক বড়, সারা গা লালচে পশমে ঢাকা, দাঁত অনেক লম্বা ও বাঁকানো। দশ লক্ষ বছর আগে একই ভাবে একই পথে ম্যামথরা এশিয়া থেকে উত্তর আমেরিকায় ঢুকেছিল– তারাও বর্তমান হাতির চেয়ে বড় ছিল। এখন আমেরিকার নানা জায়গায়ও ম্যাস্টডন্ট ও ম্যামথের ফসিল পাওয়া যায়। মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগেও বরফে ঢাকা সাইবেরিয়া ও কানাডায় খুব লম্বা পশমধারী পশমী ম্যামথ বাস করতো। পরে তারাও বিলুপ্ত হয়েছে। বরফের নীচে পার্মাফ্রস্টের মধ্যে হিমায়নে সংরক্ষিত এরকম ম্যামথের আস্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে



পশমধারী ম্যামথ (বিলুপ্ত)

বেশ কিছু।

খুব বড় থেকে খুব ছোট স্তন্যপায়ীতে এলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠি ইঁদুর গোষ্ঠি এবং খরগোশ গোষ্ঠির কথা বলা যায়। এরা নিভৃতচারী, প্রধানত নিশাচর, মাটির গর্তে বা ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকাই স্বভাব। দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে যেখানেই গেছে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে।

খাদ্যের জন্য তৃণভোজি প্রাণিদের উপর নির্ভর করে তাদের শিকারি মাংসাশিরা। এই মাংসাশিরা চোয়াল, দাঁতের গঠন, শরীরের ক্ষিপ্রতা ও শক্তি ইত্যাদি গুণে শিকারির উপযুক্ত হয়েই বিবর্তিত হয়েছে। এই দলে বিড়াল গোষ্ঠি ও কুকুর গোষ্ঠি দুটি বড় ও প্রধান গোষ্ঠি। বিড়াল গোষ্ঠিতে সাধারণ বিড়াল থেকে শুরু করে বাঘ, চিতা বাঘ, জাগুয়ার, লিওপার্ড, সিংহ, পুমা, মাউন্টেন লায়ন অনেকেই রয়েছে। মাংসাশির রীতিমত রাজকীয় ষ্টাইলটি এদেরই করায়ত্ত। কুকুর গোষ্ঠির মধ্যে রয়েছে কুকুর, শিয়াল, নেকড়ে ইত্যাদি। বড় বড় তৃণভোজি উংগুলেটরা আর মাংসাশি শিকারিরা তৃণভূমি অঞ্চলে প্রায় একই সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে এবং একে অপরের বিবর্তনকে প্রভাবিত করেছে। শিকারি মাংসাশিদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য তৃণভোজিরাও বিকশিত করেছে নানা কৌশল। হাতি, মোষ, বাইসন বিশাল আকার নিয়েছে। কিন্তু অতি বিশাল হলে হাড়ের উপর চাপ বাড়ে, ক্ষিপ্রতা কমে, তাই বড় হবার একটি উচ্চ সীমা রয়েছে। প্রতিরক্ষার জন্য অনেকে শিং, বের হওয়া বড় দাঁত গজিয়েছে। হরিণের মত অনেকে ক্ষিপ্রও হয়েছে। এসব অধিকাংশই তৃণভূমির উপযুক্ত ব্যবস্থা। অবশ্য ঘন বনে, বৃক্ষশাখায়, পর্বতের উপরেও যে শিকার ও শিকারির কোন কোনটি স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠেনি তাও নয়।

পরিচিত স্তন্যপায়ীদের কোন কোনটির খুব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি কীভাবে মহাদেশগুলোর চলাচল এবং জলবায়ু পরিবর্তন এ ইতিহাসকে বিপুলভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এসব স্তন্যপায়ী নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে,

বিশ্বময় ছড়িয়েছে, কোন কোনটি স্থানীয়ভাবে বিলুপ্ত হয়েছে, কোন কোনটি সারা দুনিয়া থেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অন্যগুলো আজো জীববৈচিত্রে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে আছে। অবশ্য এদের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গোষ্ঠিকে আমরা এপর্যন্ত উল্লেখ করিনি। তারা প্রাইমেট– প্রধানত বানর ও এইপ গোষ্ঠির। গুরুত্বপূর্ণ বলেই এদের কথা আমরা পরবর্তী আলাদা অধ্যায়ে নিয়ে গেলাম।

প্রাইমেট বিকাশে মানুষের পদধ্বনি

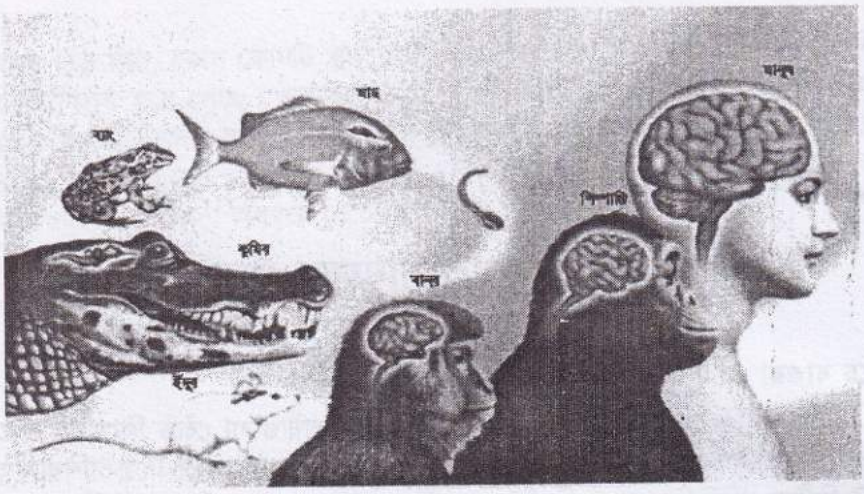
বেঁচে যাওয়া ছোট্ট বৈশিষ্টময় প্রাণিটি

কে-টি গণবিলুপ্তি থেকে ছোট লুকিয়ে থাকা যে স্তন্যপায়ীগুলো বেঁচে গিয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল অপেক্ষাকৃত বিশিষ্ট গোষ্ঠির কিছু প্রাণি– আদি প্রাইমেটরা। ক্রেটাশিয়াস যুগে খুবই বিনীত পরিস্থিতির মধ্যে বিবর্তিত হয়েছিল এরা। আকারে ছিল ছোট্ট ইঁদুরের মত, কিন্তু লম্বা লেজ, বৃক্ষ শাখার অধিবাসী। আজকাল বোর্ণিও দ্বীপে টারশিয়ার শ্রেণীর যে প্রাইমেট দেখা যায় তার সঙ্গে এদের সাদৃশ্য রয়েছে। যতটুকু আন্দাজ করা যায় এরা পতঙ্গভূক ছিল। প্রথম যুগের প্রাইমেটরা প্রায় সবাই তাই ছিল।

টারশিয়ারি যুগে ডাইনোসরবিহীন পৃথিবীতে স্তন্যপায়ীরা যখন বিকশিত হচ্ছিল সে সময় এখন থেকে ৫ কোটি বছর আগে প্রাইমেটরা দুটি প্রধান গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আজকের লেমুর শ্রেণীর প্রাণিরা এদের একটির উত্তরসূরি। আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডের পূর্বের দ্বীপ মাদাগাস্কারে (মালাগাসি) ও কমরো দ্বীপপুঞ্জে লেমুরদের দেখা যায়। আর অন্য গোষ্ঠির উত্তরসূরি হলো আজকের সব বানর আর এইপ্‌গুলো, এবং আমরাও। প্রথম প্রাইমেটের থেকে শুরু করে বিবর্তন পরম্পরায়ে যে বৈশিষ্টগুলো তাদের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে সবার আগে আসে মস্তিষ্কের উন্নয়নের কথা। স্তন্যপায়ী মাত্রেই মস্তিষ্ক একটি বিশিষ্টতা পেয়েছিল এবং উন্নত হয়েছিল সে কথা আগেই বলেছি। অমেরুদণ্ডী প্রাণিদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত স্নায়ু ঠিক গড়ে ওঠেনি, স্নায়ু ব্যবস্থা ছিল দেহে ছড়ানো– অন্তত অধিকাংশের ক্ষেত্রে। মেরুদণ্ডী প্রাণিতে মস্তিষ্ক দেখা দিলেও, এবং তা সরীসৃপে ও পাখিতে কিছু কিছু বাড়লেও, এর সত্যিকার বিকাশ ঘটেছে স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রাইমেটে সেটি কয়েকগুণে বেড়ে আরো বিকশিত হয়েছে। প্রাইমেটের মধ্যে মস্তিষ্কের আকার



ক্রেটাশিয়াস যুগে প্রথম প্রাইমেটের আবির্ভাব
(~ ৭ কোটি বছর)



বুদ্ধির অগ্রযাত্রা : মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধি লক্ষণীয়

ক্রমাগত বেড়েছে, তাছাড়া এর জটিলতাও বেড়েছে। মস্তিষ্কের আকার বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দেহের আয়তনের সঙ্গে মস্তিষ্কের আকারের অনুপাত। সরীসৃপ ও অন্যান্যদের চেয়ে গড়পড়তা স্তন্যপায়ীতে এসে এটি প্রায় চার পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি একটি বড় উল্লম্ফন। কিন্তু গড়পড়তা স্তন্যপায়ীর থেকে সাধারণ প্রাইমেটে এটি আবার দ্বিগুণ। এইপ্‌দের মধ্যে সাধারণ প্রাইমেটের চেয়ে এটি আবার দ্বিগুণ হয়েছে, আর সবচেয়ে মস্তিষ্কবান এইপ্‌ের চেয়ে মানুষের ক্ষেত্রে এটি আবারো প্রায় তিনগুণ। আয়তনে বড় হবার সুযোগে মস্তিষ্কের জটিলতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধিও একই ভাবে ঘটেছে অভাবনীয় রকম। বুদ্ধির এই অভিযাত্রায় প্রথম পদক্ষেপটি নিয়েছিল সেই প্রথম যুগের প্রাইমেটরা। মস্তিষ্কের জায়গা করে দিতে প্রাণির সামনের দিকে লম্বাটে হয়ে থাকা চোয়াল প্রাইমেটের ক্ষেত্রে কমে কমে চেপ্টা হয়েছে, এতে তার গন্ধ নেবার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কমে গেছে।

প্রাইমেটের অন্য বড় বৈশিষ্ট এসেছে তার হাত ও পায়ের আঙ্গুলে। চারপেয়ে প্রাণি বিবর্তনের গোড়া থেকে পাঁচ আঙ্গুলই সাধারণ মৌলিক ব্যবস্থা ছিল যদিও নানা প্রাণিতে তার সংখ্যা প্রায়শ কমেছে, আকৃতি বদলিয়েছে। প্রাইমেটে সেই মৌলিক ব্যবস্থাটাই কায়েম হয়েছে তবে ঐ পাঁচ আঙ্গুলের মধ্যে বুড়ো আঙ্গুলটি বেশ বিশিষ্টতা পেয়েছে। অন্য চারটির থেকে এটি পৃথক ও স্বাধীন হয়ে, স্বাধীনভাবে বেশি নড়াচড়ার উপযুক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয় বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে অন্য সব আঙ্গুলকে ছোঁয়ার যে ক্ষমতা প্রাইমেট অর্জন করেছে সেটি কোন কিছুকে ধরতে খুবই সহায়ক। এ সব ক্ষমতা প্রাইমেটের হাত ও পা উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে, কাজেই পা'কেও সে ধরার কাজে কিছুটা ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া নখরের পরিবর্তে আঙ্গুলে এসেছে চেপ্টা নখ। আর এসেছে আঙ্গুলের ডগায় স্পর্শের বিশেষ অনুভূতি। এই সব কিছু হাতের কার্যকারিতা বাড়িয়েছে, যে কার্যকারিতা ও কুশলতা প্রাইমেটের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়েছে। লেজ বিশিষ্ট প্রাইমেটদের অনেকে লেজকেও কিছু ধরার বা গাছ থেকে ঝুলার কাজে, বা ভারসাম্য রাখার কাজে ব্যবহার করতে পেরেছে।

প্রাইমেটদের মস্তিষ্কের উন্নয়নে একটি বড় ভূমিকা রেখেছে তার দৃষ্টির ভাল ক্ষমতা, বা

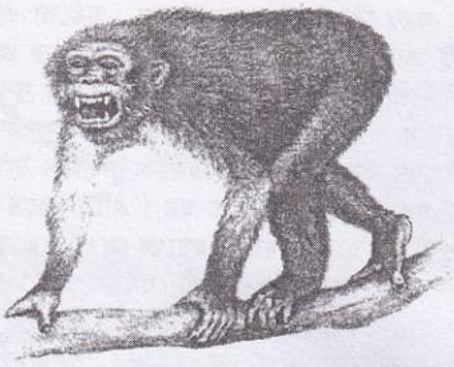
যা দেখছে তাকে ভাল করে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। হয়তো একেবারে শুরু থেকেই এরকম বিশ্লেষণ করাটি তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল খাদ্যের জন্য ছোট ছোট পতঙ্গ ধরতে পারার উপর নির্ভরশীল হবার কারণে। ছোট পতঙ্গরা দ্রুত পালিয়ে যেতে চায় এবং সে অবস্থায় এদেরকে ধরতে চোখকে তাদের গতি অনুসরণ করতে হয়। একটি গতিশীল ইমেজকে বিশ্লেষণ করার জন্য মস্তিষ্ককে দৃশ্যমান ইমেজের বিভিন্ন বিন্দুকে সূক্ষ্মভাবে পৃথক করার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। এটি করতে গিয়ে মস্তিষ্কের দর্শন অঞ্চলকে অনেক বড় ও জটিল হতে হয়েছে। হয়তো সেখান থেকেই প্রাইমেটে মস্তিষ্কের উন্নয়ন শুরু হয়েছিল। অন্যান্য অনেক স্তন্যপায়ী যেখানে চলাফেরা ও বাইরের দুনিয়ার খবর নেবার কাজে গন্ধকে বিশেষভাবে ব্যবহার করে, প্রাইমেটরা সেখানে দেখার উপর নির্ভরশীলতা অনেকগুণে বাড়িয়ে নিয়েছিল। এদের তুলনামূলকভাবে বড় দু'চোখ উভয়েই সামনের দিকে, তাই একই দৃশ্য দু'চোখে এক সঙ্গে দেখতে পেয়ে উভয়ের সম্মিলনেই এক একটি দৃশ্যের দর্শনবোধ এদের তৈরি করে। এর ফলে তাদের পক্ষে একটি বস্তু অন্য বস্তুর কত পেছনে বা সামনে আছে সেটি, অর্থাৎ দৃষ্টির গভীরতা লাভ করা সম্ভব হয়। তাছাড়া প্রাইমেটের চোখ দৃশ্যকে তার যথাযথ রঙে দেখতে পায়, অন্যদের বেশির ভাগই তা পারেনা। এটিও একটি বড় উন্নতি।

প্রাইমেট বিবর্তন

৫ কোটি বছর আগে প্রাইমেটের যে গোষ্ঠিটি লেমুর জাতীয়দের বিবর্তনের দিকে এগিয়েছে– সেটি অপেক্ষাকৃত কম বিস্তার লাভ করেছে। আজ এদের উত্তরসূরিরা শুধু মাদাগাস্কার আর কমোরো দ্বীপপুঞ্জেই টিকে আছে। তবে এই অল্প ভূখণ্ডেও লেমুরের বৈচিত্র কম নাই। ছোট থেকে বড়, দেখতে বানর সদৃশ থেকে কাঠবিড়ালী সদৃশ, নানা রঙের নানা আদলের অনেক রকম লেমুর রয়েছে। কিন্তু তাদের সবার প্রাইমেট বৈশিষ্টগুলো বজায় রয়েছে।

প্রাইমেটের অন্য শাখাটি অর্থাৎ বানর ও এইপ শাখাটি আগে থেকেই পৃথিবীময় ছড়িয়ে নানা মহাদেশে টিকে রয়েছে। বিবর্তনে এরা অনেকদূর এগিয়েছে– এবং বলা যায় অনেক দিক থেকেই এরা সব চাইতে সফল প্রাণিগোষ্ঠি। ওদের মধ্যে বানরদের কথা বলতে গেলে আজ সব বানরকে ওল্ড ওয়ার্ল্ড ও নিউ ওয়ার্ল্ড বানর হিসেবে দু'ভাগ করা হয়– উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট কিছু পার্থক্য আছে বলে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলের বিচিত্র বানর প্রজাতিগুলো নিউ ওয়ার্ল্ড বানর হিসেবে পরিচিত। এরা সবাই গাছে বিচরণ করে, সব সময় সেখানেই থাকে। ওল্ড ওয়ার্ল্ড বানর হলো এশিয়া ও আফ্রিকার বানর। এশিয়ায় মেকাক, হনুমান, কোলোবাস এসব গোষ্ঠির এবং আফ্রিকার বেবুন জাতীয় বানরের প্রাচুর্য অনেক। এদের মধ্যে গাছে বিচরণকারী বানর যেমন আছে, তেমনি মাটিতে বিচরণকারী বানরও রয়েছে। শেষেরগুলোও অবশ্য রাতটি গাছের শাখাতে কাটাতেই বেশি অভ্যস্ত। গাছে বিচরণকারী বানরের লেজ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, যেমন হনুমানের।

বানরদের কোন কোন গোষ্ঠি বাদাম ইত্যাদি ভাঙ্গার জন্য হাতিয়ার ব্যবহারে, শত্রুকে চালাকির মাধ্যমে প্রতিরোধ করতে, নিজেদের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করতে, পরস্পর



ঈজিপটোপিথেকাসঃ প্রথম যুগের এইপ (৩ কোটি বছর আগে)
এর পর আড়াই কোটি বছর প্রাইমেটদের মধ্যে এইপরাই মথা

যোগাযোগ রক্ষা করতে অভাবনীয় বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকে।

পাঁচ কোটি বছর আগে লেমুর জাতীয় প্রাইমেট থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর প্রাইমেটের এই শাখা ক্রমান্বয়ে বহুতরো বানর প্রজাতি হিসেবেই বিবর্তিত হয়েছে। তারপর তিন কোটি বছর আগে প্রাইমেটের একটি বড় বিবর্তন ঘটেছে– এইপ বা নরবানরে। এরা আকারে বানরের চেয়ে অনেক বড়, লেজ-বিহীন, মস্তিষ্কের আকারে ও বুদ্ধিমত্তায় গড়পড়তা বানরের চেয়ে এরা আরো বেশ কিছু ধাপ উপরে। তিন কোটি বছর আগের যে এইপের সর্বপ্রাচীন ফসিল পাওয়া গেছে তার নাম দেয়া হয়েছে ইজেপটোপিথেকাস– যার অর্থ মিশরের নরবানর। দুই কোটি বছরের মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা- এ সব জায়গায় এইপের বিপুল সমারোহ দেখা দিয়েছিল যার ফলে প্রাইমেটদের মধ্যে তো বটেই, পুরো প্রাণিকূলেই তারা বেশ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। সে সময়ের অনেক এইপ অনেক বড় আকার লাভ করেছিল, যেমন তাদের একটির নাম দেয়া হয়েছে জিগান্টোপিথেকাস অর্থাৎ প্রকাণ্ড নরবানর। এদের প্রাচুর্য মাত্র ২০ লক্ষ বছর আগেও প্রবল ছিল। এমনকি আমাদের পূর্বসূরি প্রজাতির মানুষ হোমো ইরেকটাসদেরকে তাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে সে রকম প্রমাণ রয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত মাত্র চার রকমের এইপই টিকে আছে যাদের দুটি আফ্রিকাতে– শিম্পাঞ্জি ও গরিলা, আর দুটি এশিয়াতে– ওরাং ওটাং আর উল্লুক। এরা সবাই এখন অল্প জায়গাতেই সীমাবদ্ধ আছে– শিম্পাঞ্জি ও গরিলা মধ্য আফ্রিকার কয়েকটি মাত্র জায়গায়, ওরাং ওটাং ইন্দোনেশিয়াতে, আর উল্লুক বাংলাদেশ-সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কিছু জায়গায়। আজ এরাও প্রায় সবগুলো বিলুপ্তির হুমকির মুখে চলে এসেছে। কিন্তু তিন কোটি বছর ধরে বড়, ছোট, মাঝারি নানা রকম এইপের প্রাচুর্য পৃথিবীতে বাস করেছে, এবং এইপ্‌রাই জীব বিবর্তনে আমাদের নিকটতম জ্ঞাতি।

সেই প্রকাণ্ড এইপদের যুগ শেষ হয়ে গেলেও উল্লুক ছাড়া আজকের বাকি তিনটি এইপ বানরের চেয়ে অনেক বড়, এদের তাই বলা হয় গ্রেট এইপ। এদের পায়ের আঙ্গুলও বেশ লম্বা। মাটিতে যখন হাঁটে তখন চার পায়ে হাঁটলেও এদের মাথাসহ সামনের ভাগটি অনেক উঁচু হয়ে থাকে, যেন খানিকটা খাড়া হয়েই হাঁটছে। উল্লুক অবশ্য মাটিতে নামলে দুই পায়েই হাঁটে। উল্লুক আর ওরাং ওটাং প্রায় সব সময় গভীর বনে গাছে গাছেই থাকে।



২০ লক্ষ বছর আগেও বিচিত্র প্রকাণ্ড এইপের সমারোহ
তাদেরই পূর্বধারা থেকে বিবর্তিত মানুষ হোমো ইরেকটাস তখন দৃশ্যপটে (বামে)

গরিলা বনে থাকলেও মাটিতেই কাটায় প্রায় সব সময়। শিম্পাঞ্জি গভীর বনেও যেমন থাকে, তেমনি গাছ আছে এরকম তৃণ ভূমিতেও থাকে– গাছেও কাটায়, মাটিতেও কাটায়। এদের মধ্যে গরিলা আকারে বেশ বড় হতে পারে– বিশেষ করে পুরুষ গরিলা। ওরাং ওটাং ও শিম্পাঞ্জি মাঝারি আকারের। এরা সবাই প্রধানত ফলমূল পাতা খাওয়া নিরীহ প্রাণি, অতি সামাজিক এবং সেই সুবাদে কাজে কর্মে প্রায়শ বুদ্ধির পরিচয় দেয়। বিশেষ করে গরিলা সম্পর্কে ভয়ঙ্কর হবার যে কাহিনীর প্রচলন আছে তা নেহাতই অমূলক।

প্রাইমেটদের জীবন, প্রাইমেটদের মন

প্রাইমেটরা গোড়াতে পতঙ্গভুক থাকলেও শিগ্‌গির তারা সর্বভূক হয়ে উঠেছিল। সুযোগের সদ্ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে তাদের নমনীয়তা বেশি ছিল। বেশিরভাগ বানরের ক্ষেত্রে তাই দেখা যায় তারা সুবিধামত যা পায় তাই খায়– পাখির ডিম, পাখি, ফুল, ফল পাতা, ঘাস, বাদাম, কীট-পতঙ্গ সবকিছু। কোন কোন বড় বানর সদ্যজাত হরিণ শাবক ধরে খেয়েছে এমন ঘটনা বিরল নয়। এইপ্‌দের মধ্যেও এই সর্বভূক হবার প্রবণতাটি রয়েছে। অবশ্য অধিকাংশ বানর, এবং শিম্পাঞ্জি, উল্লুক ও ওরাং ওটাং এর ক্ষেত্রে টসটসে লোভনীয় রঙীন ফল সমূহই খাদ্যে একটি বড় স্থান করে নিয়েছে। তাদের দর্শন ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের দর্শন অংশ ফলের পরিপক্কতার বিভিন্ন অবস্থার– তার রঙ, আকার, আকৃতির প্রতি– সাড়া দেবার উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছিল সেটি তাদের বিবর্তনে একটি বড় ভূমিকা রেখেছে।

যে সব প্রাইমেট সব সময় গাছে থাকে তাদের শত্রু কম। শুধু ঈগল বা বাজ পাখি ছোঁ মেরে তাদের ছোট বাচ্চা নিয়ে যাওয়াটাই তাদের বড় আশঙ্কা। এ ছাড়া অন্য শিকারির

থেকে ভয় কম। অন্য দিকে মাটিতে যারা থাকে, চলাফেরা করে, তাদের বিপদ অনেক। চিতা, হায়েনা, শেয়াল, সিংহ সব কিছুই তাদের আক্রমণ করতে পারে। তাদেরকে অনেক সময় বৃক্ষ আশ্রয়হীন অঞ্চলেও দলে দলে ঘুরতে হয়। এক্ষেত্রে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তারা প্রধানত নানা বুদ্ধি ও কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। একটি কৌশল হলো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ধারালো দাঁত বিকশিত করে, সমস্বরে বিকট শব্দ তুলে শিকারিকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়া। এ ভাবে কাজ না হলেই তারা আক্রমণের চেষ্টা করে। প্রাইমেটদের নিরাপত্তার আরেকটি রক্ষা কবচ হলো তাদের সামাজিক সংগঠন– এক নেতার নেতৃত্বে সম্মিলিত ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যবস্থা। ভূমিতে বিচরণকারী প্রাইমেটদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার প্রয়োজন বেশি বলে এদের সামাজিক সংগঠনেও গাছের প্রাইমেটদের চেয়ে বেশি কড়াকড়ি। এখানে ঝগড়া, বিশৃঙ্খলা থামাবার জন্য প্রধানত নেতার সঙ্গে আরো কয়েকটি সহকারী নেতা– সবলদেহী পুরুষ প্রাইমেট– কাজ করে। অধিকাংশ প্রাইমেট পুরুষের দেহ স্ত্রীদের চেয়ে অনেক বড়। নেতৃস্থানীয়রা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের শাস্তি দেয়, অন্য দলের কারো অনুপ্রবেশ রোধ করে, আক্রমণ ঘটলে এগিয়ে গিয়ে লড়াই করে দলের বাকিদেরকে বিশেষ করে মা-প্রাইমেট ও বাচ্চাদেরকে নিরাপত্তা দেয়। এসব কাজে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের নানা পদ্ধতি প্রাইমেটদের মধ্যে বিকশিত হয়েছে।

বড় এইপ্‌দের ক্ষেত্রে তো মনে হয় নেহাৎ ভাষাটাই তারা সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে নানা অঙ্গভঙ্গি, মুখের দাঁতের ভঙ্গি এবং নানা পরিস্থিতিতে নানা ধরনের বিচিত্র ধ্বনি তুলে তারা পরস্পরের সঙ্গে সংবাদের ও ভাবের যথেষ্ট আদান প্রদান করতে সক্ষম। বানরের ক্ষেত্রে এবং আরো বেশি শিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রে একটি বড় সক্ষমতা হলো ওরা কাউকে কিছু করতে দেখলে নিজে নিজেই সেটি অনুকরণ করতে পারে। মস্তিষ্কের মিরর নিউরন (আয়না-স্নায়ুকোষ) নামক একটি অংশ এর জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। মানুষের মস্তিষ্কে ঠিক অনুরূপ অংশ মানুষের বাকশক্তির নিয়ন্ত্রণ করে বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে অঙ্গভঙ্গি করা থেকেই প্রাইমেট ধারার বিবর্তনে ভাষার প্রস্তুতি এগিয়ে গেছে। বুদ্ধিমত্তার কিছু কিছু পরিচয় প্রাইমেট ছাড়া অন্যান্য কোন কোন প্রাণির মধ্যেও দেখা যায়। কিন্তু নানা পরিস্থিতিতে উপযুক্ত করণীয় ভেবে বের করতে প্রাইমেটদের বুদ্ধির যে ব্যাপ্তি দেখা যায় তা অন্যদের মধ্যে অনুপস্থিত। এটি বেশি স্পষ্ট যেখানে পরস্পরের মনোজগতের বিষয় জড়িত রয়েছে সেখানে।

এক সঙ্গে থাকার ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য দল গঠন এবং তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম যোগাযোগ ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য যে সামাজিকতার বিকাশ প্রাইমেটদের মধ্যে হতে হয়েছে, একেও তাদের মস্তিষ্ক বিকাশের অন্যতম কারণ মনে করা হয়। এটি করতে গিয়ে তাদেরকে অন্যের মনকে কিছুটা বুঝতে হয়েছে, সেই অনুযায়ী কাজ করতে হয়েছে। প্রাইমেট বহির্ভূত প্রাণিরা তাদের নানা ইন্দ্রিয় দিয়ে বাইরের জগতের খবর যে ভাবে পায়, সে ভাবেই নিয়ে সরল সাড়া দেবার চেষ্টা করে– যেমন বিপদ দেখলে পালানো, বা যুদ্ধ করা ইত্যাদি। কিন্তু প্রাইমেটরা ইন্দ্রিয়ের দেয়া বাইরের দুনিয়ার খবরকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করে। বিশেষ করে এইপ্‌রা ইন্দ্রিয়ের এ সমস্ত খবরকে মস্তিষ্কের উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে বাইরের দুনিয়ার একটি ইমেজ তাদের নিজের মত করে তৈরি করতে পারে–

সেই ক্ষমতা সরল সাড়া দেয়া অন্য প্রাণিদের নাই। আধুনিক গবেষণায় বানরের মস্তিষ্কে ইলেকট্রোড সংযোগের মাধ্যমে এরকম ইমেজ সৃষ্টি উদ্ঘাটিত হয়েছে। সামাজিক কারণে প্রাইমেটদেরকে অন্যের মনের ভাব বুঝে ওদেরকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে হয়েছে। এজন্য এক ধরনের পারিবারিক বা গোষ্ঠিগত মানসিক দ্বন্দ্বে তাদেরকে প্রায়শ লিপ্ত থাকতে হচ্ছে। দলের নেতৃত্বের ছোট বড় স্থির করা থেকে শুরু করে পারিবারিক সম্প্রীতি রক্ষা– সব কাজে এসব দরকার হয়েছে। তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত, দলগত আনুগত্য, জোট, উপজোট ইত্যাদি গড়া ও ভাঙ্গা– এসবের প্রবণতা যথেষ্ট দেখা যায়। উকুন বাছার ভঙ্গিতে পরস্পরের লোম খোঁটার যে অভ্যাস, তার ভেতরেও ঐ ধরনের আনুগত্য, পরস্পর সখ্যতা ইত্যাদি প্রকাশের চেষ্টা রয়েছে।

মনে করা হচ্ছে যে প্রাইমেটদের বিবর্তনে এই ক্রম বিকশিত কগ্‌নিটিভ ক্ষমতা বা মন অনুসরণের ক্ষমতা তাদের মনোজগতকে অন্য সবার থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত করেছিল। আজকের শিম্পাঞ্জিদের সুদূর পূর্বসূরির অতীত কোন শাখা থেকে বিবর্তনের এক ভিন্নমুখি যাত্রা ঘটেছিল। এই ভিন্নমুখিতা ছিল আরো বড় আরো জটিল মস্তিষ্কের দিকে, আরো সূক্ষ্ম কগ্‌নিটিভ ক্ষমতার দিকে। তারো আগে দুই পায়ে খাড়া হয়ে মুক্ত হাত আরো কুশলি হাতের দিকে এগিয়েছে। এই হাত মস্তিষ্ক খাটিয়ে পাথরের সূক্ষ্মতর হাতিয়ার তৈরি করতে শিখেছিল। এই ভিন্নমুখি যাত্রা থেকেই আমাদের অতীত পূর্বসূরি প্রথম মানব-সদৃশরা উদ্ভূত হয়েছিল। এই মানব-সদৃশরা অবশ্য শুধু একটি প্রজাতি থাকেনি, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তাদের বিভিন্ন প্রজাতি বিবর্তিত হয়েছে, বিলুপ্ত হয়েছে। তাদের সবাইকে আমরা এখন হোমিনিড বা (নিজেদের সদৃশ) বলি। তাদের ধারাবাহিক বিকাশ আমাদের আগমনে অবদান রেখেছে। তাদের একটি শাখা থেকে ধীরে ধীরে আরো বিবর্তিত হয়ে আমরা আজকের মানুষ হোমো সেপিয়েন্সরা এসেছি প্রায় দেড় লক্ষ বছর আগে।

অর্ধকোটি বছরেরও বেশি সময় ধরে পৃথক ধারায় বিবর্তন আমাদেরকে আজকের নিকটতম জ্ঞাতি শিম্পাঞ্জির কাছ থেকে অনেক ভিন্ন অনেক উন্নত করে তুলেছে বটে, কিন্তু জীবতাত্ত্বিক দিক থেকে আমরাও মূল প্রাইমেট গোষ্ঠিরই একটি শাখা। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে যে মৌলিক শ্রেণিবিভাজনকে অর্ডার বলা হয়, এর ভিত্তিতে আমরা প্রাইমেট অর্ডারের অন্তর্ভূক্ত। আর যদি সে কথাই বলি, শুধু প্রাইমেটরাই কেন আমরা তো সেই আদি প্রাণের পুরাটা ধারার সঙ্গেও এক এবং অভিন্ন, যার শুরু হয়েছিল চারশত কোটি বছর আগে এককোষী সরল ব্যাকটেরিয়া হিসাবে, তারপর বিবর্তনে বিকশিত হয়েছে হাজারো সমৃদ্ধির মধ্যে। একটি দাবী আমরা অত্যন্ত গর্ব করে করতে পারি, তাদের সবার মধ্যে শুধু আমরাই নিজেদের আগমনের ইতিহাসটি উন্মোচন করতে পেরেছি, তা নিয়ে ভাবতে পেরেছি– আমাদের জ্ঞান দিয়ে, বিজ্ঞান দিয়ে, যে কারণে আমরা 'হোমো সেপিয়েন্স'।

মানুষ, পৃথিবী ও প্রাণ

মানুষের বিবর্তনে কিছু মাইল ফলক

মানুষের বিবর্তন এবং এই অধ্যায়ের অন্যান্য প্রায় সব কিছু অনেক সবিস্তারে বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণ দিয়ে আমরা ভিন্ন বইতে আলোচনা করবো। কিন্তু পৃথিবী ও প্রাণের চারশত কোটি বছরের কাহিনীকে আপাতত একটি সম্পূর্ণতা দিতে গেলে এর মধ্যে মানুষের আগমন, মানুষের প্রবল হয়ে উঠা, এবং তাদের দ্বারা পৃথিবী ও প্রাণ উভয়কে বিপুলভাবে বদলে ফেলার বিষয়গুলো কিছুটা হলেও উল্লেখ করতে হবে। বর্তমানের এইপ্‌দের ও মানুষের অভিন্ন সাধারণ প্রাইমেট পূর্বসূরি বসবাস করেছে আজ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ কি তারো বেশ খানিকটা আগে আফ্রিকায়। সেই সময় আমাদের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে সূত্রপাত করেছে নূতন বৈশিষ্টময় মানব ধারার। এই ধারার মধ্যে শাখা-প্রশাখা কম আসেনি। ঐ পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে অন্য এইপ্ জ্ঞাতিদের সঙ্গে তাদের অমিলের চেয়ে মিলই বেশি ছিল। তবুও তারা দুই পায়ে খাড়া হয়েছে, হাতের কুশলতা বাড়িয়েছে, বন ছেড়ে বৃক্ষ-বিরল অঞ্চলে বসবাস করেছে। এরপর প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে ঐ আফ্রিকাতেই ঐ মানব ধারার কিছু প্রজাতির মস্তিষ্কের দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল, সে কারণে তারা অনেক বেশি আমাদের মত হয়ে উঠেছিল। তাদের মত সবাইকে তাই আমরা নাম দিয়েছি 'হোমো' অর্থাৎ 'আমরা'।

তাদের মধ্যে প্রথমে ছিল হোমো হাবিলিস (কুশলি মানুষ) যারা পাথরকে ভেঙ্গে ঘষে হাতিয়ারের মত করে নিতে শুরু করেছিল। এরপর ছিল হোমো ইরেকটাস (খাড়া মানুষ) যাদের মস্তিষ্ক পূর্ববর্তী মানব-সদৃশের থেকে আরো বড়। খাড়া পশমহীন দীর্ঘাঙ্গী দেহ, উন্নততর হাতিয়ার, শিকারি জীবনযাত্রা তাদেরকে দূর দূরান্তে নিয়ে গেছে। তাদের কেউ কেউ আফ্রিকা থেকে বের হয়ে বহু প্রজন্ম পর এশিয়ার নানা প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের ফসিল আমরা পেয়েছি ইন্দোনেশিয়ায় 'জাভা মানুষ' হিসেবে, চীনে 'পিকিং মানুষ' হিসেবে আর ককেশাসে 'জর্জিয়া মানুষ' হিসেবে। তারা মাত্র ষাট হাজার বছর আগেও কোন কোন স্থানে টিকে থাকলেও আফ্রিকায় তাদের আদি নানা শাখা প্রশাখা ইতোমধ্যে অন্যান্য মানব প্রজাতি হিসেবে বিবর্তিত হয়েছিল। তাদেরই একটি ৫ লক্ষ বছর আগে থেকে ভিন্ন ভাবে বিবর্তিত হয়ে এক পর্যায়ে মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপে অনেকটা আমাদের মতই হয়ে উঠেছিল– যাদেরকে আমরা নিয়েনডার্থাল বলে জানি। আবার প্রায় একই সময় আরেকটি শাখা, তাও আফ্রিকায়, বিবর্তিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের নিজেদের মানব প্রজাতি– হোমো সেপিয়েন্স (জ্ঞানী মানুষ), প্রায় দেড় লক্ষ বছর আগে। অন্যেরা যা পারেনি, আমরা তা পেরেছি– ভাষার অধিকারী হয়েছি। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের

কুশলতা ও মানসিক ক্ষমতা বেড়ে যেতে পেরেছে অনেক অনেক বেশি।

শুরুতে আমাদের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বাস করেছে পৃথিবীর নানা স্থানে অন্য বেশ কয়েকটি মানব প্রজাতি। আমরা হোমো সেপিয়েন্সরাও এক সময় আফ্রিকা ছেড়ে বের হয়ে এসেছি। আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্যে, ইউরোপে, এশিয়ার নানা জায়গায় আমাদের সঙ্গে অন্যান্য মানবপ্রজাতিগুলোর সহ-অবস্থানও বজায় ছিল অনেক দিন। তবে সেই প্রজাতিগুলো একে একে বিলুপ্ত হয়েছে। গত ৩০ হাজার বছর থেকে শুধু আমরাই রয়ে গেছি একক মানব প্রজাতি হোমো সেপিয়েন্স– এর আগেপরে সব মহাদেশে ছড়িয়ে।

আমরা শুধু সব মহাদেশেই ছড়াইনি, সর্বত্র একক মানব প্রজাতি হইনি, বরং আমরা অন্য সব প্রাণির চেয়ে অনেক বেশি উন্নততর মস্তিষ্ক ও কুশলতার জোরে অন্য অনেক প্রাণির ভূবনগুলোও বেদখল করে নিয়েছি। সব শেষে আমরা উন্নততর মস্তিষ্কের সাহায্যে সভ্যতা, কালচার, আর প্রযুক্তি গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পৃথিবীর পুরো জীবজগতের উপর নিজেদের অপ্রতিরোধ্য আধিপত্য গড়ে তুলেছি। শুধু তাই নয় জীব জড় মিলিয়ে পৃথিবীর নানা ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটিয়েছি নিজেদের কর্মকাণ্ডের ফলে।

মানুষের জীবনযাত্রায় নানা মোড়

অন্য এইপ্‌দের থেকে ভিন্ন যাত্রায় গিয়েও মানুষের পূর্বসূরিরা তাদের মতই সর্বভূক ছিল, তবে প্রথমে প্রধানত ছিল উদ্ভিদভোজি– বনের ফলমূল বাদাম ইত্যাদি খেয়ে। হোমো ইরেকটাসের আমল থেকে মানুষ প্রধানত শিকারি ও মাংসভোজি হয়ে উঠেছিল। অন্য প্রাণির শিকার করা প্রাণিও সে খেত শিকারি প্রাণিকে তাড়িয়ে দিয়ে, তাছাড়া ফলমূল শস্য সংগ্রহ করে খাওয়ার অভ্যাসও বাদ দেয়নি। কাজেই তখন থেকে দীর্ঘ বহু লক্ষ বছর মানব প্রজাতিগুলোর জীবনযাত্রা ছিল শিকারি সংগ্রাহকের জীবনযাত্রা। আগুনের আবিষ্কার ও ভাল পাথরের হাতিয়ার তৈরি করতে পারা তাদের জন্য সহায়ক হয়েছে। আমরা হোমো সেপিয়েন্সরাও বরাবর শিকারি সংগ্রাহকই ছিলাম। আমরা (এবং আমাদের আগে অন্যরকম মানুষরা) যে ক্রমাগত স্থানান্তরে গিয়েছিলাম দূর দূরান্তে বিস্তৃত হয়েছিলাম তাও এক এক জায়গায় শিকার ও সংগ্রহের উৎসগুলো ফুরিয়ে যাচ্ছিল বলে।

এই অবস্থার অবসান হয়েছে মাত্র আট হাজার বছর আগে। বর্তমান ইরাক ও লেবাননের কিছু অংশ নিয়ে গড়া একটি ছোট অঞ্চলে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি এসেছিল। মানুষ সেখানে ধীরে ধীরে বন্য শস্যকে পোষ মানিয়ে সেগুলোকে মৌসুমী চাষের শস্যে পরিণত করেছে। আর বন্য কিছু প্রাণিকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত প্রাণিতে পরিণত করেছে। এভাবে কিছু মানুষ অন্তত শিকারি সংগ্রাহকের জীবন বাদ দিয়ে কৃষিজীবী হয়ে উঠেছিল। পরে এই আদি কৃষিজীবীরা এই জীবনযাত্রাকে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছিল। তখন থেকে প্রায় সর্বত্রই মানুষ ক্রমে কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে– এখনো অনেকাংশে তাই আছে।

তবে এরও আগে প্রায় ত্রিশ হাজার বছর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মানুষের মধ্যে এসেছিল বড় সৃজনশীলতার একটি জোয়ার। পাথর, হাড়, গাছের ডাল, লতা ইত্যাদি

দিয়ে কার্যকর হাতিয়ার তৈরিতে তো বটেই, বরং শীতের পোষাক তৈরিতে, বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে এমনকি ছবি আঁকা, মূর্তি তৈরি এবং নানা আচার অনুষ্ঠানে তারা মানব সভ্যতার উন্মেষ ঘটাচ্ছিল। এই প্রক্রিয়া পরবর্তীতে মানুষকে নিজেই নিজেদের জীবন উন্নয়নের কাজে অনেক দূর নিয়ে গেছে যেগুলো জীব-বিবর্তনের ফলে ঘটেনি। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষকে অনেক ক্ষমতাও দিয়েছে। ধাতুর আবিষ্কার আর ব্যবহার এতে বড় সহায়তা দিয়েছে। জীবনযাত্রাকে শিকারি সংগ্রাহকের অনিশ্চয়তা থেকে কৃষিজীবীর নিশ্চয়তার ও তুলনামূলক সমৃদ্ধির মধ্যে নিয়ে আসার ফলে সভ্যতার এই বিকাশ আরো দ্রুততর হয়েছিল। এসেছে নগরায়নের মাধ্যমে বড় বড় ঘনসবতির কেন্দ্র গড়ে তোলা, ধাতুর ব্যবহার করে যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ারকে খুবই কার্যকর করে তোলা।

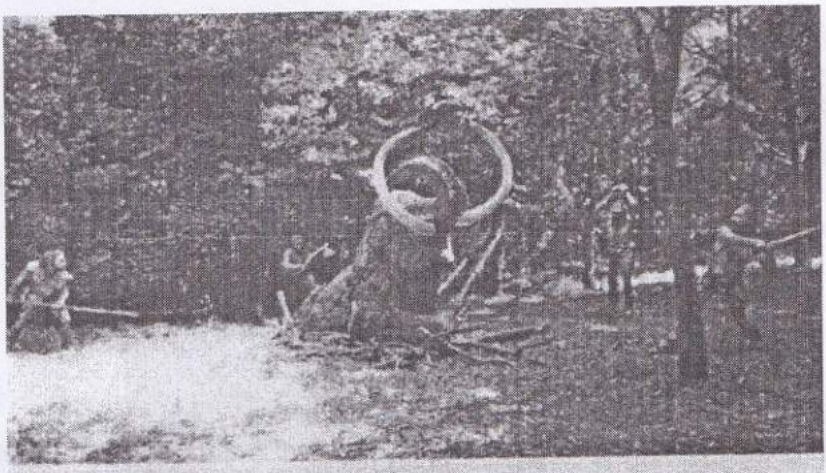
এরই ধারাবাহিকতায় গত তিন শত বছরে মানুষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এত দ্রুত উন্নতি হয়েছে যে সমাজ, সভ্যতা, নগরায়ন ইত্যাদির সঙ্গে তার সহযোগে দেখা দিয়েছিল শিল্প বিপ্লব যা দফায় দফায় উন্নততর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে জোরদার হয়ে মানুষের জীবনযাত্রাকে একেবারেই বদলে দিয়েছে। আর এটি তুঙ্গে উঠেছে গত প্রায় দেড় শত বছরে।

মানুষের নিজের জীবন যাত্রার এ সব বড় বড় মোড় নেয়া কিন্তু তাদের নিজেদের জন্য যেমন তেমনি বাকি জীব জগতের জন্য এবং পৃথিবীর জন্য অত্যন্ত বড় বড় প্রভাব নিয়ে এসেছে, এমনই শক্তিশালী মানুষের উপস্থিতি।

মানুষের সৃষ্ট গণবিলুপ্তি

পৃথিবীর জীব বৈচিত্র সম্পর্কে আধুনিক গবেষণা থেকে এটি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে জীব জগত আর একটি গণবিলুপ্তির মধ্য দিয়ে এখন যাচ্ছে। এর আগে গত ৫৫ কোটি বছরে পাঁচটি গণবিলুপ্তির কথা আমরা বলেছি। এও সেরকম অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ব্যাপক প্রজাতি ধ্বংসের একটি ঘটনা–ষষ্ট গণবিলুপ্তি। তবে আগের পাঁচটির থেকে এটির একটি বড় পার্থক্য আছে। আগেরগুলো যেখানে প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে হয়েছে বর্তমানটির জন্য দায়ী শুধু মানুষ– জীব জগতেরই সব চেয়ে সফল সদস্য। পরিতাপের বিষয় হলো যে তার উন্নত মস্তিষ্ক এবং সাফল্যকে মানুষ ব্যবহার করেছে এমনভাবে যাতে ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে জীববৈচিত্রকে সে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। বিভিন্ন সময় মানুষের জীবন যাত্রার প্যাটার্নই এই বিলুপ্তির কাজটিকে এগিয়ে দিয়েছে। অতীতে শিকারি মানুষের অভ্যুদয়ের পর থেকেই এটি শুরু হয়েছে এবং শিকারের মাধ্যমে এক একটি জায়গায় প্রাণিকূল, বিশেষ করে বড় আকারের প্রাণিদের, সম্পূর্ণ ধ্বংসের কাজটি সে কয়েক শত বছর আগে পর্যন্ত চালিয়ে গেছে– ক্ষেত্র বিশেষে আরো সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত।

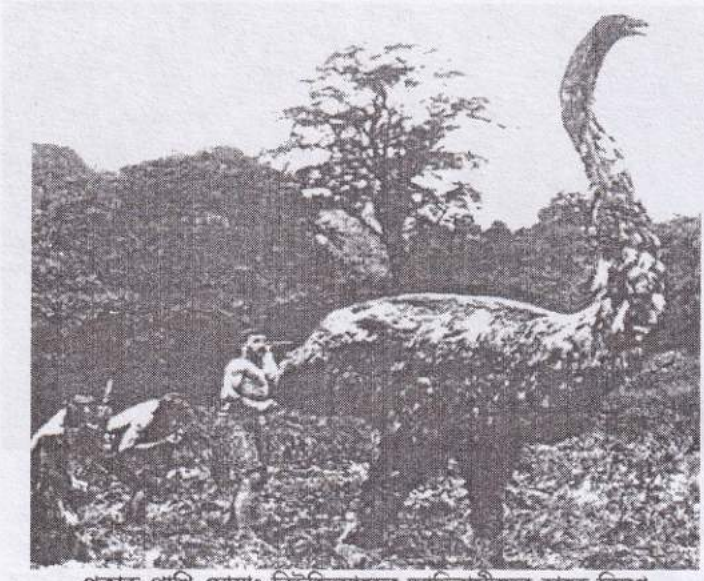
বিশ হাজার বছরের মত আগে উন্নত হাতিয়ার হিসেবে দূর থেকে নিক্ষেপের বর্শা তৈরি করতে পারার পর থেকে মানুষের দলবদ্ধ শিকারের শক্তি অনেক গুণে বেড়ে যায়। সেই থেকে এই সেদিন পর্যন্ত মানুষ ব্যাপক শিকারের মাধ্যমে বড় বড় অনেক প্রাণির বিলুপ্তির কারণ ঘটিয়েছে। বার হাজার বছর আগে উত্তর আমেরিকায় যাওয়ার পর থেকে সে ঐ মহাদেশে ম্যামথ ও অন্যান্য হাতি গোষ্ঠি, ঘোড়া, বাইসনের অনেক প্রজাতি, উট ইত্যাদি



ম্যামথ বিলুপ্তির কারণ
বুদ্ধিমত্তা ও হাতিয়ার প্রয়োগে প্রাচীন মানুষের ব্যাপক শিকার

বড় সড় মোট ২৮টি শ্রেণীর প্রাণি বিলুপ্ত করেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছার পর সেখানে বিলুপ্ত করেছে প্রায় কয়েক হাজার প্রজাতি যার মধ্যে রয়েছে জায়ান্ট স্লথ ও আর্মাডিল্লোর মত প্রাণি। তার আদি অধিবাসীদের হাতে অষ্ট্রেলিয়ায় বিলুপ্ত হয়েছে আজকের সেখানকার প্রাণিদের বৃহদাকার পূর্বসূরিরা– জায়ান্ট ক্যাঙ্গারু, জায়ান্ট আর্মাডিল্লো, স্লথ ইত্যাদি। নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী মাওরিরা ওখানকার উটপাখির ধরনের বিশাল পাখি মোয়াকে বিলুপ্ত করেছে আরো সাম্প্রতিক কালে। এশিয়া ও ইউরোপে শিকারের মাধ্যমে শেষ হয়ে গেছে ম্যামথ, বড় গণ্ডার, কয়েক রকমের ভালুক। মাদাগাস্কার দ্বীপে আগন্তুক মানুষের হাতে শেষ হয়ে গেছে বিশাল প্রাইমেট জায়ান্ট লেমুর, বিশাল না-উড়া পাখি এলিফেন্ট বার্ড। লক্ষণীয় হলো শিকারের বড় লক্ষ্য ছিল বড় বড় প্রাণিরা, আর এভাবে বিলুপ্তি বেশি ঘটেছে যে সব জায়গায় মানুষ পরে নূতন গিয়ে পৌঁছেছিল সেখানে। আফ্রিকায় যেখানে মানুষ গোড়া থেকেই ছিল সেখানে এরকম বিলুপ্তি খুব কম হয়েছে। নানা বড় স্তন্যপায়ীর সঙ্গে একই জীবতাত্ত্বিক পরিবেশ বরাবর ভাগাভাগি করে বাস করেছে বলে সহ-অবস্থানটি এখানে সব সময় বজায় থেকেছে।

নতুন জায়গার আগন্তুক মানুষরা আরো একভাবে প্রাণিদের বিলুপ্ত করেছে। প্রাণি পোষ মানাবার পর এভাবে যারা দূরে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে গিয়ে বসত স্থাপন করেছে, সঙ্গে তাদের পোষা প্রাণিদেরও নিয়ে গেছে। এভাবে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে অথবা মরিশাসে বসতি স্থাপনকারীরা সাথে নিয়ে গিয়েছিল তাদের কুকুর, শূকর ইত্যাদি পোষা প্রাণি। তাছাড়া তাদের লটবহরের সঙ্গে ইঁদুর, বেজি ইত্যাদিও চলে যেতে পেরেছিল। এসব বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আগে কোন শিকারি প্রাণি না থাকাতে সেখানকার আদি প্রাণির– প্রধানত পাখির ও কীট পতঙ্গের– তেমন কোন ভয়ভীতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি ওখানকার অনেক পাখি উড়তে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। নূতন নিয়ে যাওয়া শিকারিরা খুব সহজে এদের বংশ ধ্বংস করে দিতে পেরেছিল। এভাবে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে পলিনেশিয়ানরা বসতি স্থাপনের পর গত ১৫০০ বছরে অন্তত এক হাজার প্রজাতির বিলু-



প্রকান্ড পাখি মোয়াঃ নিউজিল্যান্ডের আদিবাসীদের হাতে বিলুপ্ত

প্তি ঘটেছে, যার মধ্যে ছিল এমন জীববৈচিত্র যা শুধু হাওয়াইয়েরই বৈশিষ্ট ছিল্। মরিশাসে তুলনামূলক ভাবে সাম্প্রতিকতর কালে বিলুপ্ত হয়ে গেছে ডোডোর মত না-উড়া পাখি।

মানুষের শিকারি জীবনযাত্রা যেমন দ্রুত বহু প্রাণির বিলুপ্তি ঘটিয়েছে, তার কৃষি জীবনযাত্রাও বিলুপ্তি প্রক্রিয়াকে আরো বিস্তৃত ও ত্বরান্বিত করেছে। এক সময় পৃথিবীর যে বিশাল ভাগ বনাঞ্চলে ও তৃণভূমিতে ভর্তি ছিল নানা জীবের আবাসস্থল হয়ে, তা কৃষি সম্প্রসারণের ফলে তাদের থেকে বেহাত হয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ ব্রাজিলে এক সময় যে বাদল বন (রেইন ফরেষ্ট) ছিল এখন তার মাত্র দুই শতাংশ অবশিষ্ট আছে। বনের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে অসংখ্য রকমের কীট-পতঙ্গ, পাখি, সরীসৃপ, উভচর ও স্তন্যপায়ী। কৃষির অনুসঙ্গ হিসাব পশুচারণ, ব্যবসায়িক গাছের বাগান, কাঠসহ বনজ সম্পদ আহরণ ইত্যাদিও অসংখ্য প্রজাতিকে বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়েছে। একই প্রকারে বন বিনষ্টির কারণ হয়েছে মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান বসত, বিশেষ করে নগরায়ন।

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর শিল্পায়নের সঙ্গে এসেছে পরিবেশ দূষণ। এর নানা বিষময় ফল মানুষের নিজের উপর যেমন পড়েছে, তেমনি আরো মারাত্মক হয়ে পড়েছে জীববৈচিত্রের উপর। একেবার আধুনিক কালে এসে স্থল ও জলভাগের রাসায়নিক দূষণ জীব জগতের খাদ্য চেইনকে বিপর্যস্ত করে অসংখ্য বিলুপ্তির কারণ ঘটিয়ে চলেছে। এটি কীট-পতঙ্গ থেকে শুরু করে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণি, স্তন্যপায়ী ইত্যাদিসহ সব কিছুকে অনেক ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে গেছে।

কী হারে বিলুপ্তি ঘটলে আমরা তাকে জীবের গণবিলুপ্তি বলতে পারি? কয়েক লক্ষ বছরের মধ্যে যদি অর্ধেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায় তা হলে সে রকম বিলুপ্তিকে গণবিলুপ্তির পর্যায়ে ফেলা যায়। অতীতের পাঁচটি গণবিলুপ্তিতে তাই ঘটেছিল– এ রকম সময়ের মধ্যে অর্ধেকের বেশি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছিল, কোন কোনটিতে অনেক বেশি। দৃশ্যপটে

মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে অর্থাৎ লাখ খানেক বছরের আগে থেকে আজ পর্যন্ত বিলুপ্তির জানা বিভিন্ন তথ্যকে ব্যবহার করে কম্পিউটার মডেলিং থেকে বিলুপ্তির হার নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে স্পষ্ট একটি গণবিলুপ্তিরই নমুনা দেখা যাচ্ছে। আর বিলুপ্তির হারটি তুঙ্গে উঠছে মানুষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে– মানুষের জীবন-যাত্রা এবং তার কাজই এই বিলুপ্তির পেছনে প্রধান কারণ। আজ এ মুহূর্তে যত রকমের প্রাণিকে বিপন্ন বা হুমকির মুখে মনে করা হচ্ছে তাতে এই হার শিগ্‌গির বাড়বে বই কমবেনা। এরকম বিপন্ন ও হুমকির মুখে থাকা প্রাণিদের চিহ্নিত করার কাজ যতই জোরদার হচ্ছে ততই পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে আৎকে উঠতে হচ্ছে।

পৃথিবীকে নিজের বাসের অযোগ্য করে ফেলতে পারি

মানুষের সৃষ্ট গণবিলুপ্তিতে আপাতত মানুষ নিজে হয়তো বিলুপ্তির হুমকিতে নাই। কিন্তু এটি নিশ্চিতভাবে মানুষের নিজের জন্যও বিপদ ডেকে আনছে। পৃথিবীর জটিল ও বিস্তৃত জীববৈচিত্রের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা বিশাল। আমাদের সকল প্রযুক্তি দিয়েও যদি আমরা এই নির্ভরতার বিকল্প সৃষ্টি করতে চাই তবে সেটি শুধু অসম্ভব রকম ব্যয়বহুল হবেনা, কার্যতও হয়তো অসম্ভব হবে। কাজেই জীববৈচিত্র ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের জীবনযাত্রার প্রকৃত মানকে অবক্ষয়িত করে চলছি, এবং শিগ্‌গির একদিন হয়তো জীবনযাত্রাকে অসম্ভব করে তুলে নিজেদের ধ্বংসের পথ করে দেবো।

তাছাড়া অন্য আরো নিশ্চিতভাবেও আমরা পৃথিবীকে আমাদের জন্য বাসের অযোগ্য করে তুলছি। আমাদের যে জীবন যাপন প্রণালী, নিজেদের অতি-লোভ এবং দূষণ সৃষ্টি বশত কয়েক শত বছর ধরে জীব-বিলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করছে, তাই আবার ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতা বাড়িয়ে দিয়ে নানা ভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ডেকে আনছে। যে প্রধান প্রক্রিয়ায় আমরা এটি করছি তা হলো তেল-কয়লা ইত্যাদি ফসিল জ্বালানির দহনের মাধ্যমে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের উদ্গীরণ, সেই সঙ্গে আরো কিছু গ্যাসের যাদেরকে বলা হয় গ্রীন হাউজ গ্যাস। বনাঞ্চল বিনষ্টি উদ্ভিদের কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ কমিয়ে ফেলে এই প্রক্রিয়ায় অবদান রাখছে। এসব গ্যাস বায়ুমণ্ডলে গিয়ে এমন একটি আবরণ তৈরি করছে যা সূর্যের উত্তাপে উষ্ণ পৃথিবীপৃষ্ঠকে ঠান্ডা হতে বাধা দেয়। তাই একটু একটু করে গত কয়েক শত বছর ধরে ভূ-পৃষ্ঠের গড় উত্তাপ বাড়ছে, এবং ক্রমেই এই বৃদ্ধির হার দ্রুততর হচ্ছে। এর থেকেই বাকি সব ঘটছে– জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে, সাগরপৃষ্ঠ উঁচু হচ্ছে, বন্যা-ঘূর্ণিঝড় বাড়ছে, খরা-অতিবৃষ্টি বাড়ছে। বর্তমান গবেষণা বলছে- এই প্রক্রিয়া বজায় থাকলে চক্রবৃদ্ধি হারে এসব বেড়ে গিয়ে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই পৃথিবী আমাদের বাসযোগ্যতার বাইরে চলে যাবে। আমাদের একটি মাত্র পৃথিবী, এটিই আমাদের ও পুরো জীব জগতের এক মাত্র আবাস। আমরাই কি তবে নিজেদের ও অন্য সকল জীবের যবনিকা টানার কারণ হবো?

জীব বির্বতনের ইতিহাস আলোচনায় আমরা এর মধ্যে অনেক বার বড় বড় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দেখেছি। বিশেষ করে বেশ ক'টি গণবিলুপ্তির পেছনে এরকম জলবায়ু পরিবর্তনের হাত ছিল। সেই জলবায়ু পরিবর্তনগুলো প্রাকৃতিক কারণে ঘটেছিল। কয়েক কোটি কিংবা তারো চেয়ে বেশি সময় পর পর এরকম বড় পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেছে।

এরকম পরিবর্তন ভবিষ্যতে দীর্ঘ মেয়াদে আরো হয়তো হবে। আমরা সহ পৃথিবীর জীব জগত এগুলোর শিকার হলেও হতে পারি। কিন্তু বর্তমানে সুনিশ্চিত ভাবে যে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে– তা হচ্ছে অল্প কিছু দিনের মধ্যে– দু'এক শত বছরের প্রক্রিয়ায়, এবং তুঙ্গে উঠছে অতি সাম্প্রতিক সময়ে। এবং এর একমাত্র কারণ আমরা মানুষেরাই। অতীতের পৃথিবীর দুর্যোগ ও বিলুপ্তির সঙ্গে বর্তমানটির পার্থক্য এখানেই। এতে যা ঘটছে তা দ্রুত ঘটছে, দ্রুত এর পরিণতি ডেকে আনবে।

সমাধান মানুষের হাতেই

মানুষ এভাবে আত্ম-বিনাশের ক্ষমতা যেমন দেখিয়েছে, তেমনি মানুষেরই ক্ষমতা আছে– সমস্যাগুলো বুঝবার, উপলব্ধি করার এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করার। গণ-বিলুপ্তিই হোক এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীকে বাসের অযোগ্য করার পথে নিয়ে যাওয়াই হোক– এগুলোর রাশ টানার ক্ষমতা মানুষের সমাজ ব্যবস্থায় এবং মানুষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাতে রয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে যার কোন কোনটি ফিরিয়ে আনার অতীত। কিন্তু এখনো ব্যবস্থা নিলে শেষ রক্ষা করা সম্ভব। বিশ্ববাসী এখন তাই করার চেষ্টা করছে। সব মানুষের এসব কিছু বুঝা, উপলব্ধি করা এবং প্রতিকার প্রক্রিয়ায় হাতে লাগানোটি এর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ জন্যই বিশ্বচরাচরের সঙ্গে, পৃথিবী ও প্রাণের সঙ্গে, আমাদের সম্পর্কটি সবার সঠিকভাবে বুঝার চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১: পৃথিবীর শৈশবের খুঁটিনাটি আমরা জানতে পারলাম কী ভাবে?

উত্তর : এগুলো পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদির সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলোকে তখনকার জানা পরিস্থিতির উপর প্রয়োগ করে আমরা আন্দাজ করতে পারি। কিছু কিছু বর্তমান সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতেও পেরেছি– যেমন উল্কার অভিঘাতের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো থেকে তখনকার অবস্থা হিসেব করে বের করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ চাঁদ সৃষ্টির যে মডেল এখন প্রতিষ্ঠিত, সেটি অনুযায়ী পৃথিবীর শৈশবে তার থেকে চাঁদের দূরত্ব এখনকার দূরত্বের তিন ভাগের একভাগ ছিল। সেক্ষেত্রে চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর জলরাশি জোয়ারে কতখানি ফুলে উঠার কথা তা আমরা অনায়াসে হিসাব করে বের করতে পারি এবং সেই জোয়ার ভাটার প্রচণ্ড উত্থাল স্বরূপও আন্দাজ করতে পারি।

প্রশ্ন ২: আপনি বলেছেন গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার বাধা থাকাতে আদিতে পৃথিবী মঙ্গলের মত ঠাণ্ডায় জমে যেতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বরফের যুগে পৃথিবী ঠিকই জমে গিয়েছে। সেটি কেন?

উত্তর : পৃথিবীর শৈশবে ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ ছিল বেশি, এখানে পানি গরম ছিল কিন্তু এত গরম নয় যে বাষ্পীভূত হয়ে যেতে পারে। বরফ যুগ অনেক পরের কথা। তখন ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ অনেক কমে গিয়েছে, সময় সময় এত কমে গেছে যে এর একটি বিশাল অংশ বরফে ঢাকা পড়েছে। কিন্তু পুরো পৃথিবীটি কখনোই একেবারে জমে যেতে পারেনি।

প্রশ্ন ৩: ধূমকেতু পৃথিবীতে পানি এনেছে। ধূমকেতুতে পানি আসলো কোথা থেকে?

উত্তর : ধূমকেতুর পানি মহাজাগতিক পানি। বিভিন্ন তারার ফাঁকে ফাঁকের জায়গায় বিভিন্ন মৌল জমে যে নানা যৌগ সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে পানিও একটি। ঐ মহাজাগতিক উপাদান থেকেই সৌর মণ্ডলে গ্রহগুলো, গ্রহাণু, ধূমকেতু ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। তাই অন্য অনেক কিছুর মত পানি পৃথিবীতেও এসেছে, ধূমকেতুতেও এসেছে। পৃথিবীর জন্মের সময় উত্তাপের কারণে ভূপৃষ্ঠে পানি থাকতে পারেনি, যদিও অভ্যন্তরে ছিল বেরিয়ে যেতে না পেরে। ধূমকেতু সৌরমণ্ডলে সূর্যের থেকে অনেক দূরে বেশির ভাগ সময় থাকে বলে তাতে পানি বরফ হিসাবে জমা থাকে।

প্রশ্ন ৪: পৃথিবীর শুরুতে বায়ুমণ্ডলের চাপ বর্তমানের চেয়ে অনেকগুণ বেশি ছিল, পরে তা কমে গেল কেন?

উত্তর : শুরুতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বেশি ছিল কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ফর্মালডিহাইড,

ইত্যাদি গ্যাস। এদের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল বলেই চাপও ছিল বেশি। কিন্তু এসিড বৃষ্টি হিসাবে অনেক খানি কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভূপৃষ্ঠে এসে শিলায় আটকে গেছে। এ ভাবে ক্রমে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমেছে, বায়ুচাপও কমেছে। তবে একেবারে কমে যেতে পারেনি, কারণ আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মাধ্যমে কিছু কিছু কার্বন-ডাই-অক্সাইড আবার বায়ুমণ্ডলে গিয়ে শেষ অবধি একটি ভারসাম্য বজায় রেখেছে।

প্রশ্ন ৫: পৃথিবীর শৈশবের যে ছবি দেখলাম তাতে তখনকার পৃথিবীর রঙ কীভাবে ঠিক করা হয়েছে?

উত্তর : পৃথিবীর রঙ অনেকখানি কল্পনা করা গেছে বৈজ্ঞানিকভাবে জানা তার তখনকার পরিস্থিতি থেকে। সূর্যের তেজ অনেক কম ছিল। অন্য দিকে বায়ুমণ্ডলের চাপ বেশি ছিল। মেঘ বৃষ্টি ঝড় লেগেই ছিল, পানিও ছিল উত্তপ্ত। সব মিলেই তখনকার যে পরিস্থিতি তাতে সূর্যের আলোর শোষণ ইত্যাদিতে রঙের আভা যেমনটি হবার কথা তেমনই আন্দাজ করে নেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : ৬ পৃথিবীর দিবা রাত্রিটি কবে কী ভাবে ঠিক হলো?

উত্তর : পৃথিবী তার অক্ষের চারদিকে ঘোরার আহ্নিক গতি পেরেছে তার জন্ম থেকে, সূর্য ও তার সংগ্রহ চাকতিতে যে গতি ছিল তার অংশীদার হিসাবে। তবে আজকের ২৪ ঘন্টার যে দিনরাতে পৃথিবী অভ্যস্ত হয়ে গেছে তার পেছনে অন্য অবদানও রয়েছে। পৃথিবী জন্মের সময় যে বড় সংঘর্ষগুলো হয়েছিল তাই পৃথিবীর আহ্নিক গতির ধারা ঠিক করে দিয়েছে। আর চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর ঘোরা আর অক্ষের নির্দিষ্ট কোণে বাঁকা হয়ে থাকাকেও সুস্থির করে রেখেছে।

প্রশ্ন ৭: পৃথিবী সূর্যের থেকে সঠিক দূরত্বে আছে বলে এটি মঙ্গলের মত অতি শীতল হয়ে জমে যেতে পারেনি বা শুক্রের মত অতি উত্তপ্ত মরুতে পরিণত হতে পারেনি। তাই পৃথিবীতেই শুধু প্রাণ আসতে পেরেছে। এরকম প্রাণ আসার পরিস্থিতি কি আর কোথাও নাই?

উত্তর : থাকাটাই স্বাভাবিক এবং এটিই সবাই প্রত্যাশা করছে। আমাদের সৌর মণ্ডল শুধু একটি মাত্র তারা সূর্যের সঙ্গে জড়িত। এরকম কোটি কোটি তারা রয়েছে মহাবিশ্বের অসংখ্য গ্যালাক্সিতে। তাদের অনেকগুলোতেই পৃথিবীর মত প্রাণের অনুকূল পরিবেশ থাকবে এটি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যাটি হলো আমাদের পক্ষে সেটি জানতে পারা ও ওখানে কোথাও বুদ্ধিমান প্রাণ থাকলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারা। আমাদের অপেক্ষাকৃত কাছে সৌরমণ্ডলের কোন গ্রহের কোন উপগ্রহে যেমন তা হতে পারে তেমনি বহু আলোক-বর্ষ দূরের তারার কোন গ্রহেও তা হতে পারে। কাছের সম্ভাবনাগুলো যাচাই করার জন্য সৌর মণ্ডলের দূরবর্তী প্রদেশে জরীপের জন্য গ্যালেলিও নামের যে মহাশূন্যযান পাঠানো হয়েছিল তাতে আমাদের দেহের প্রতিচ্ছবি ও আমাদের সভ্যতার কিছু নিদর্শন দিয়ে দেয়া হয়েছিল পাছে কোন বুদ্ধিমান প্রাণির হাতে পড়লে তাদেরকে আমাদের সম্বন্ধে জানানোর জন্য। আজকাল অবশ্য বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা

উদ্যোগ চালু রয়েছে পৃথিবীর বাইরে প্রাণের সন্ধানে। প্রধানত বাইরে থেকে পাওয়া রেডিও সিগন্যালগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে এরকম গবেষণা চলছে। এরকম গবেষণাকে বলা হয় SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) অর্থাৎ পৃথিবী বহির্ভূত বুদ্ধিমানদের অনুসন্ধান।

প্রশ্ন ৮: আদিতে ডিএনএ ছিলনা, আরএনএ দিয়েই প্রাণের উন্মেষ হয়েছিল, যেটি ছিল আরএনএ জগত। শুরুতে যে আরএনএ নিজে ভাঁজ হয়ে এনজাইমের কাজ করেছিল সেটি কি একটাই ছিল?

উত্তর : অনুকূল পরিস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয় বিক্রিয়ার মাধ্যমে এমনটি ঘটার স্পষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে বলেই আরএনএ জগতের তত্ত্বটি দেয়া হচ্ছে। সম্ভাবনা শুধু একটি হবার নয়, বরং যথেষ্ট সংখ্যক ক্ষেত্রে তা হওয়ার, যাতে স্বয়ংক্রিয় নানা পরীক্ষা নিরিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রাণের সৃষ্টি হতে পেরেছিল।

প্রশ্ন ৯: আমরা ক্ষুদ্র ফসিল বা অন্যান্য আলামত পেয়েছি সর্বপ্রাচীন ৩৮০ কোটি বছর আগের। এমন কি হতে পারেনা যে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে আরো অনেক আগে, আমরা তার ফসিল এখনো খুঁজে পাইনি।

উত্তর : সেটি হতে পারে, তাই আমরা মনে করছি প্রাণের উন্মেষ হয়েছে মোটামুটি চার শত কোটি বছর আগে। এর চেয়ে খুব বেশি আগে তা হওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ তখন পৃথিবীর একেবারেই শৈশব। সাড়ে চার শত কোটি বছর আগে পৃথিবী জন্মের পর প্রথম প্রায় ৫০ কোটি বছর পর্যন্ত পৃথিবীর পরিস্থিতি প্রাণের অনুকূল ছিলনা। তাই সেদিক থেকে চার শত কোটি বছরটিই প্রাণের বয়স হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন ১০: প্রাণের উন্মেষ হবার জন্য কী ধরনের উত্তাপ পৃথিবীতে প্রয়োজন হয়েছিল বলে মনে হয়?

উত্তর : এখন প্রমাণিত হয়েছে যে আদি প্রাণি যে ব্যাকটেরিয়া তা যথেষ্ট উত্তাপ সহ্য করতে পারতো। তা ছাড়া প্রথম জীবের সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত শক্তি-উৎস উত্তপ্ত পানির প্রস্রবণের কাছ থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যাতে পানি ফুটতে থাকতে ও বাষ্পীভূত হতে পারতো। কাজেই এখানে উত্তাপের একটি আন্দাজ এসে গেছে।

প্রশ্ন ১১: আদিম যে এককোষী জীবের মাধ্যমে প্রথম প্রাণের সূচনা হয়েছিল তা কি উদ্ভিদ ছিল না প্রাণি ছিল?

উত্তর : প্রাণের উন্মেষের পর দীর্ঘকাল যে এককোষী জীবগুলো ছিল তারা ব্যাকটেরিয়া– তাদেরকে প্রাণি বা উদ্ভিদ কোনটাই বলা যায় না। তবে ধীরে ধীরে এককোষী জীবের মধ্যে নানা জটিলতর রূপ এসেছে– যেমন প্রোকারিয়োট থেকে তারা নিউক্লিয়াস যুক্ত ইউকারিয়োট হয়েছে। এদের মধ্যে এক শ্রেণিতে প্রাণির মত উপাদান এসেছে যেমন মাইটোকোন্ড্রিয়া, অন্যগুলোতে উদ্ভিদের মত উপাদান ক্লোরোপ্লাষ্ট। প্রথমগুলোকে প্রাণির পূর্বসূরি মনে করা যায়, দ্বিতীয়গুলোকে উদ্ভিদের। উদ্ভিদ এসেছে অনেক পরে, সেটি প্রথম দেখা দিয়েছে স্থলে।

ততদিনে জীবের জন্য স্থলে বাস করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং কোন কোন প্রাণি স্থলে এসেও গেছে।

প্রশ্ন ১২: প্রাণের প্রথম উন্মেষকালে যে পরিবেশ ছিল তার জন্য আরএনএ জগতে সৃষ্টি হয়েছিল। এখন যদি ওরকম পরিবেশ আবার দেখা দেয় তা হলে কি আবার ডিএনএর বদলে আরএনএ ভিত্তিক জীবজগত সৃষ্টি হবে?

উত্তর : বিবর্তন একটি অনিশ্চিত ব্যাপার। পরিবেশের চাপে একবার যা ঘটে একই পরিবেশের চাপে হুবহু তাই আবার ঘটবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। তা ছাড়া মূল কোন অবস্থা থেকে পরিবর্তনের পরিবর্তনটি হচ্ছে তার উপরও এটি নির্ভর করে। প্রাণের উন্মেষের সময় এটি হয়েছিল কোন প্রাণ নাই এমন অবস্থা থেকে। আজকে হতে হলে তা হবে আজকের বিচিত্র ও জটিল প্রাণের থেকে শুরু করে। এই বিশাল জীবজগতও আজকের পরিবেশের অংশ। কাজেই সেই আদি পরিবেশও কোনদিন ফিরে আসার কথা নয় এমনকি বর্তমান জীবজগত সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হলেও হুবহু তা হবার নয়।

প্রশ্ন ১৩: আদি প্রাণের সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন এগুলো কোথা থেকে এসেছিল?

উত্তর : প্রয়োজনীয় মৌলগুলো পৃথিবীর জন্মের বহু আগেই মহাবিশ্বে তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম তৈরি হয়েছে বিগ্ ব্যাং এর পর পর। লোহা পর্যন্ত ভারী মৌলগুলো তৈরি হয়েছে তারার অভ্যন্তরে এবং তার চেয়ে ভারীগুলো সুপারনোভা হয়ে তারার বিস্ফোরণে। ঐ বিস্ফোরণে এসব মৌল মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে– এবং সব মৌল এভাবে তারার ফাঁকে ফাঁকের জায়গায় ও সেখান থেকে পরবর্তী প্রজন্মের তারার মধ্যে এসেছে। পৃথিবী এসব থেকেই সৃষ্টি হয়েছে– তাই পৃথিবীতে এরা গোড়া থেকেই ছিল।

প্রশ্ন ১৪: বিবর্তন যেহেতু একটি চলমান প্রক্রিয়া, বিবর্তনের ধারায় মানুষ কি আরো উন্নত কিছুতে পরিণত হতে পারে?

উত্তর : সাধারণত বিবর্তন খুব ধীর প্রক্রিয়া। আমরা হোমো সেপিয়েন্সের বয়স এখনো বড় জোর দেড় দুই লক্ষ বছর মাত্র। এত অল্প-সময়ে তাই বড় ধরনের কোন বিবর্তন ধারা মানুষের মধ্যে স্পষ্ট হয়নি। দীর্ঘতর মেয়াদে ভবিষ্যতে কী হবে তা এখন বলা সম্ভব নয় কারণ ভবিষ্যতের বিবর্তনের আন্দাজ এখন করা যাবেনা। আমরা যাকে উন্নত হওয়া বলি সে রকম পরিবর্তনই আসবে এমন কথাও নাই। কারণ বিবর্তন শুধু তাৎক্ষণিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে– 'উন্নত' হবার কোন গরজ তার নাই। বিবর্তনে মানুষের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রমও হতে পারে। কারণ পরিবেশের অনেক চাপ মানুষ তার প্রযুক্তির দ্বারাই অতিক্রম করতে পারবে, দেহগতভাবে বিবর্তিত হয়ে তা মোকাবেলা নাও করতে হতে পারে।

প্রশ্ন ১৫: একটি প্রজাতি ভৌগলিক ভাবে দুই জায়গায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তারা ভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হবার কথা। এশিয়া ও আমেরিকার মানুষের মধ্যে যে দীর্ঘদিন সমুদ্রের ব্যবধান ছিল তাদের প্রজাতি বদলে গেলনা কেন?

উত্তর : যে দীর্ঘদিনের কথা বলা হচ্ছে তা কিন্তু মোটেও দীর্ঘ নয়। আমেরিকায় প্রথম মানুষ গিয়েছে এশিয়া থেকে মাত্র ১২ থেকে ১৫ হাজার বছর আগে উভয়ের মধ্যে বেরিং প্রণালীতে তখন স্থলসেতু দেখা দিয়েছিল বলে। এরপর অবশ্য এই সেতু বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, তবে এই সময় বিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের কাছে কিছুই নয়। আফ্রিকাতে তার উৎপত্তি স্থল থেকে প্রায় ৮০ হাজার বছর আগে থেকে পৃথিবীর নানা জায়গায় ছাড়িয়ে পড়ার পরও মানুষ কিন্তু বরাবর প্রজননগত ভাবে নানা অঞ্চলের মধ্যে জিন বিনিময় বজায় রেখেছে এবং সব সময় একই প্রজাতি হিসাবে বজায় থেকেছে। কোন অঞ্চলের প্রজনন বিচ্ছিন্নতা কখনই খুব দীর্ঘকালের হয়নি।

প্রশ্ন ১৬: আমাদের মস্তিষ্কের তুলনায় কান ও নাক এত উপেক্ষিত কেন যে কারণে গন্ধ নেবার আর শব্দ শুনার ক্ষমতায় কুকুরের কাছেও আমরা পরাজিত।

উত্তর : মানুষ যার সদস্য সেই প্রাইমেট গোষ্ঠির বিবর্তনের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে মস্তিষ্কের ক্রম বিকাশ। পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এই বিকাশই তাদের সহায়ক হয়েছে। অন্যদের ক্ষেত্রে তা হয়েছে অন্য রকম, যেমন চিতা বাঘের ক্ষেত্রে বেশি বিকাশ হয়েছে পায়ের পেশির যা দৌড়তে সাহায্য করেছে। গন্ধ নেবার আর সূক্ষ্ম শ্রবণ ক্ষমতার বিকাশ কুকুরের এবং আরো কিছু প্রাণির ঐ রকম বিবর্তন কৌশল। মানুষ বা অন্য প্রাইমেট এপথে যায়নি। বরং মস্তিষ্ক বড় করার স্বার্থে তাকে নাকের গুণ অনেকটা বিসর্জন দিতে হয়েছে। মস্তিষ্কের জায়গা করে দিতে মাথার খুলিকে বড় করতে গিয়ে মুখ ও চোয়াল সামনের দিকে আর লম্বা থাকতে পারেনি চেপ্টা হতে হয়েছে। তাতে গন্ধ নেবার ক্ষমতা তার সীমাবদ্ধ হয়েছে। টিকে থাকার সংগ্রামে প্রাইমেটদের ও মানুষের অভিযাত্রা ছিল বুদ্ধির দিকে, অন্য কিছুর দিকে নয়।

প্রশ্ন ১৭: বিজ্ঞানীরা এক দিকে বলছেন মানুষের জন্য জীব-বৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে, অনেক জীব বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, অন্য দিকে বলছেন বিবর্তনের ফলে সব সময় কিছু জীবকে বিলুপ্ত হতেই হবে, তা হলে মানুষের দোষটি কোথায়?

উত্তর : এই দুটি পৃথক বিষয়। বিবর্তনের ফলে যে বিলুপ্তি সেটি দীর্ঘকালীন ব্যাপার– নূতন সৃষ্ট পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে না নিতে পারার ফলে সব সময় কিছু কিছু জীব বিলুপ্ত হচ্ছে। এগুলো বড় আকারে স্পষ্ট হতে অনেক সময় বহু লক্ষ বছর সময় লেগে যায়। অন্য দিকে মানুষের সৃষ্ট যে গণ-হারে জীববিলুপ্তির কথা বলা হচ্ছে তা অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটাচ্ছে। এটি শুরু হয়েছে কয়েক হাজার বছর আগে যখন থেকে মানুষের হাতিয়ার ও শিকারের প্রযুক্তি অনেক উন্নত হয়েছে তখন থেকে। আর এটি অতি বেশি তীব্র আকার ধারণ করেছে গত কয়েক শত বছরে যখন মানুষ সব ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে এবং বেপরোয়াভাবে অন্য জীবের আবাস ও জীবনকে ধ্বংস করে চলেছে নিজের আচরণ, কৃষি, শিল্প, নগরায়ন, দূষণ ইত্যাদির বিস্তারের মাধ্যমে। প্রথম ধরনের বিলুপ্তির বিষয়টি একেবারে প্রাকৃতিক, আমাদের করার কিছু নাই। কিন্তু দ্বিতীয়টির বিষয়ে আমাদের অনেক কিছু করার আছে।

প্রশ্ন ১৮: বর্তমান পৃথিবীতে যে তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। এরকম অনুপাত কি অতীতে সব সময় ছিল? এর সঙ্গে মহাদেশগুলো চলাচলের, বা নদীর ভাঙ্গা-গড়ার কোন সম্পর্ক কি আছে?

উত্তর : না, স্থল ভাগ ও জলভাগের এই অনুপাতটি বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয়েছে, যদিও পৃথিবীর সারাটি বয়সে তার মধ্যে মোট পানির পরিমাণ (বরফ সহ) একই রয়েছে। এটি প্রধানত হয়েছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উঠা নামার ফলে। আজকে মানব সৃষ্ট গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠ উঁচু হবার বিষয় আমরা দেখছি। কিন্তু সুদূর অতীতে প্রাকৃতিক ভাবে এর চেয়েও অনেক বড় বড় জলবায়ু পরিবর্তন ঘটেছে। এর ফলে এক এক সময় সমুদ্র পৃষ্ঠ অনেক উঁচু হয়ে স্থলের অনেক জায়গাকে ডুবিয়ে জলভাগে পরিণত করেছে, আবার অন্য সময় সমুদ্র পৃষ্ঠ অনেক নেমে গিয়ে বহু নূতন স্থল উন্মুক্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আগে যেসব ভূখণ্ড সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল তাদের মাঝখানে স্থলসেতু জেগে উঠেছে। এক একবার সমুদ্র পৃষ্ঠ ১৫০ মিটার পর্যন্ত উপরে উঠেছে আবার অন্য সময় ওরকমই নেমে গেছে, এমন প্রমাণও রয়েছে।

মহাদেশগুলোর চলাচল এরকম জলবায়ু পরিবর্তনে অবদান রেখেছে, সে হিসেবে স্থল ভাগ ও জলভাগের অনুপাত নির্ধারণেও তার ভূমিকা রয়েছে। তা ছাড়া মহাদেশ চলাচলে একটি টেকটোনিক প্লেইট যখন অন্যটিতে এসে ধাক্কা দেয় ও উভয়ের চাপে সংযোগ স্থলে পর্বত সৃষ্টি করে তখনো স্থলের কিছু বিস্তার কমে যায়। তবে নদীর ভাঙ্গা-গড়াতে মোটের উপর এই অনুপাতে তেমন রদবদল হয়না কারণ নদী একদিকে যেমন ভাঙ্গে অন্য দিকে তেমন গড়ে।

প্রশ্ন ১৯: তিমি যে স্থলের কোন স্তন্যপায়ী থেকে বিবর্তিত হয়ে জলের প্রাণিতে পরিণত হয়েছে তা আমরা কী ভাবে বুঝলাম? এটি বরাবর জলের প্রাণিই ছিল এমনওতো হতে পারে।

উত্তর : এটি আমরা জানি সেই স্থলের স্তন্যপায়ী ও তিমির মধ্যবর্তী আরো প্রাণির ফসিল থেকে। ঐ প্রাণিগুলো এখন বিলুপ্ত হয়ে গেলেও তাদের ফসিল থেকে আমরা জানতে পারছি কী ভাবে ধাপে ধাপে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে স্থলের কুকুর সদৃশ স্তন্যপায়ী থেকে মাছের মত দেখতে জলের স্তন্যপায়ীতে পরিণত হয়েছে। এরকম মধ্যবর্তী ফসিলগুলো যে সব ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না তখন বিবর্তনটিকে বুঝা বেশ দুরূহ হয়।

প্রশ্ন ২০: মহাদেশগুলো পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাবার ফলে পৃথিবীর আয়তন কি বড় হয়ে যাচ্ছে? আদিতে পৃথিবী যত বড় ছিল এখন কি তার চেয়ে বড়?

উত্তর : না, এমন কিছু ঘটেনি যাতে পৃথিবীর আয়তন পরিবর্তন হতে পারে। মহাদেশগুলো সরে গেলেও মোট আয়তনের কোন পরিবর্তন হচ্ছেনা। একদিকে সমুদ্রগর্ভ থেকে গলিত শিলা উঠে এসে সমুদ্র তলে বস্তু যোগ হচ্ছে, অন্যদিকে স্থলের কিনারার তলায় ঢুকে পড়ে বস্তু আবার ভূগর্ভে চলে যাচ্ছে। দু'য়ের মধ্যে সব সময় একটি ভারসাম্য বজায় থাকছে।

প্রশ্ন ২১: প্রাণের বয়সের প্রথম অর্ধেক প্রায় দু'শত কোটি বছর প্রাণ শুধু এককোষী ব্যাকটেরিয়া হিসাবেই রয়ে গেল। অথচ সাম্প্রতিক এক শত কোটি বছর বা এরকম সময়ে জীব অসংখ্য অদ্ভূত রকম বৈচিত্রে বিস্তৃত হয়েছে। প্রথম দিকে ধীর গতির এবং শেষের দিকে এই দ্রুত গতির বৈচিত্র সৃষ্টির কারণ কী?

উত্তর : হয়তো একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করলে ব্যাপারটি ভাল বুঝা যাবে। বিবর্তন কাজ করে পুরানো খসড়ার উপর, প্রয়োজনে সেই খসড়াতে অল্প কিছু পরিবর্তন এলেই তার কাজ এগোয়। পুরানো খসড়াগুলো যত বিচিত্র হবে, নূতন বৈচিত্র সৃষ্টির ব্যাপ্তিও তত বেড়ে যাবে– এটিই স্বাভাবিক। প্রথমদিকে সেই বৈচিত্র খুব কম ছিল– খসড়াগুলো ছিল একই রকম, আর অতি সাদামাটা। তাই এর থেকে তেমন চমকপ্রদ নূতন কিছু আশা করা কঠিন। এরপর ধীরে ধীরে যত বেশি বিচিত্র খসড়া সৃষ্টি হয়েছে আরো বৈচিত্র হবার সম্ভাবনা ততই বেড়েছে। এটি ঘটার কথা গুণোত্তর হারের মত– প্রথম দিকে খুবই স্থবির, তারপর ধীরে ধীরে হার বাড়ে। শেষে এসে বৈচিত্রের তীব্র ফুলঝুরি দেখা যাওয়ার কথা। প্রথম দিকে সেভাবেই ঘটেছে। কিন্তু পরে এই প্রত্যাশায় বাধ বেধেছে নিয়ন্ত্রণকারী জিনের বিবর্তনের ফলে। তাই জীবের ক্যাম্ব্রিয়ান 'বিস্ফোরণের' সময় প্রায় ৫৫ কোটি বছর আগে বিশাল সংখ্যায় বিচিত্র ধরনের প্রাণির উদ্ভব হয়েছিল। পরে কিন্তু বরং তাতে কিছুটা রাশ টেনে ধরেছে ঐ নিয়ন্ত্রণকারী জিনগুলো। এরপর বিবর্তনে পরিবর্তনগুলো ঘটতে পেরেছে কিছু কিছু নির্দিষ্ট খাতের মধ্যে। তাতেও অবশ্য বৈচিত্র কম সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু ঠিক ঐ গুণোত্তর হারের প্রত্যাশিত রূপে নয়।

প্রশ্ন ২২: যেই একই পরিবেশ বা ইকোসিষ্টেমে মানুষ বাস করেছে সেখানে অন্য প্রাণিও বাস করেছে। মানুষের ক্ষেত্রে মস্তিক উন্নয়নের দিকে বিবর্তন হলো, তাদের ক্ষেত্রে হলো না কেন?

উত্তর : পরিবেশ এক হলেও তার মধ্যে খাপ খাইয়ের জন্য পরিবর্তনগুলো আসতে পারে ইতোমধ্যে যে সব বৈচিত্র ঐ প্রজাতির জনগোষ্ঠির মধ্যে রয়েছে তার থেকেই। মানুষ বা তার পূর্বসূরি প্রাইমেটের মধ্যে মস্তিষ্কের উন্নয়ন ঘটেছে তাদের জনগোষ্ঠিতে সেদিকে যাওয়ার মত বৈচিত্র ইতোমধ্যেই ছিল বলে। পাশাপাশি অন্য প্রাণির মধ্যে সেই বৈচিত্রগুলো ছিল না, ছিল না তার পূর্ব-ইতিহাসের কারণে। কাজেই তাকে সাড়া দিতে হয়েছে ইতোমধ্যে যে বৈচিত্র ছিল তার ভিত্তিতে। বিবর্তন ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে হয় বলেই এমনটি হয়।

প্রশ্ন ২৩: প্রাণের উন্মেষের কালে অধিক উত্তাপ সহ্যকারী থারমোফাইলিক ব্যাকটেরিয়া ছিল, যাদের থেকে বিবর্তনের নানা ধাপে মানুষ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে। ওরকম ব্যাকটেরিয়া এখনো রয়েছে– যেমন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েলোষ্টোন পার্কে। আজকের এইগুলো বিবর্তিত হয়ে কি মানুষের মত প্রাণি আবার স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করতে পারবে?

উত্তর : এ প্রশ্নের জবাব পেতে আমাদেরকে হয়তো আরো শত শত কোটি বছর অপেক্ষা করতে হবে, কারণ বিবর্তনের ভবিষ্যৎ আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। তা ছাড়া গত চারশত কোটি বছর পৃথিবীর পরিবেশ যেই পথে এগিয়েছে সামনেও সেই পথে

এগুবে এমন কোন কারণ নাই। এদের বিবর্তন নির্ভর করবে সামনের পরিবেশে পরিবর্তনগুলোর কারণে কী রকম নির্বাচনী চাপ তাদের উপর সৃষ্টি হয় তার উপর।

প্রশ্ন ২৪: আদি ব্যাকটেরিয়া থেকে আজকের প্রাণি কী ভাবে বিবর্তনের ফলে আসলো তা বুঝা গেল, কিন্তু আজকের উদ্ভিদ আসলো কিসের থেকে?

উত্তর : তাও ঐ আদি ব্যাকটেরিয়া থেকেই। ব্যাকটেরিয়াদের কোন কোনটির উদ্ভিদসদৃশ গুণ ছিল যেমন নীলসবুজ ব্যাকটেরিয়ার সালোক সংশ্লেষণ করার ক্ষমতা। পরে যখন উন্নততর এককোষী জীব এসেছে তাদের কোন কোনটির মধ্যে ঐ রকম ব্যাকটেরিয়া অঙ্গীভূত হয়েছে ক্লোরোপ্লাষ্ট হিসাবে যা তাকে আরো উদ্ভিদসদৃশ গুণ দিয়েছে। এদেরকেই উদ্ভিদের পূর্বসূরি বলে মনে করা হয়েছে। এদের থেকে বিবর্তিত হয়েছে এককোষী আলজি, বহুকোষী আলজি– সবই পানিতে। প্রকৃত উদ্ভিদ এসেছে স্থলে– প্রথমে অপুস্পক উদ্ভিদ ফার্ন, মস ইত্যাদি হিসাবে, অনেক পর ডাইনোসরের আমলে সপুস্পক উদ্ভিদ হিসাবে।

প্রশ্ন ২৫: স্থলভাগে প্রাণি সৃষ্টি হবার পক্ষে বড় বাধাটি যদি হয়ে থাকে প্রথম দিকে ওজোন স্তরের অভাবে স্থলে আলট্রাভায়োলেটের আধিক্য– তা হলে দিনে পানিতে থাকা, রাতে স্থলে থাকা জীবের অভ্যুদয় হলোনা কেন?

উত্তর : হ্যাঁ সে সময় এটি একটি বিকল্প হতে পারতো বৈ কি। তবে শুধু রাতে থাকার জন্য স্থলে আসা খুব সুবিধাজনক হতো না। কারণ সব প্রাণিই তখন শীতল রক্তের প্রাণি। রাতে স্থলের তাপমাত্রা কমে যায় বলে নিশাচর হিসাবে খাদ্য সংগ্রহ, চলাফেরা, প্রজনন ইত্যাদি করার জন্য যথেষ্ট উত্তাপ তাদের দেহে বজায় রাখা যেতনা। শীতল রক্তের প্রাণিতে বাইরের উত্তাপেই দেহের উত্তাপ। কাজেই রাতের বেলায় স্থলে গেলেও তাদেরকে গর্ত, গুহায় বা অন্য কোন নিরাপদ স্থানে নিষ্ক্রিয়ভাবেই রাতটা কাটিয়ে দিয়ে সক্রিয় হবার জন্য আবার পানিতেই ফিরে আসতে হতো। বিবর্তনের জন্য এটি তাই সুবিধাজনক কোন বিকল্প হতোনা।

প্রশ্ন ২৬: ডাইনোসররা যদি উল্কাপাতের ফলে বিলুপ্ত না হতো তা হলে স্তন্যপায়ীরা কি আদৌ বিকশিত হতে পারতো? আর তা যদি তারা না পারতো তা হলে প্রাইমেটদের অগ্রযাত্রা ঘটে মানুষ আসতো কী ভাবে?

উত্তর : এখন পেছনের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে সেই দারুণ উল্কাপাতটি হয়ে স্তন্যপায়ী বিকাশের জন্য ভালই হয়েছিল। কিন্তু বিষয়টি দৈবক্রমে ঘটেছে। দৈবক্রমে এটি না হয়ে হয়তো অন্য কোন কিছু ঘটতে পারতো যা প্রাইমেটদের বিকাশকে হয়তো আরো ত্বরান্বিত করতো। কাজেই এটি না হলে মানুষ আসতোইনা এমন করে বলা যাবেনা। যেটুকু বলা যায় তা হলো ডাইনোসরদের বিলুপ্তি এতে সহায়ক হয়েছে।

প্রশ্ন ২৭: যৌন প্রজননের শুরুটা কী ভাবে হলো?

উত্তর : এটিও বিবর্তনেরই আর একটি ফল। আদি এক কোষী ব্যাকটেরিয়া যখন অনেক সংখ্যার এক জায়গায় ঘন সংলগ্ন হয়ে বাস করতো তখন তাদের মধ্যেও ডিএনএ

বিনিময় হতো ইতস্তত। কিন্তু অনেক পর জটিলতর জীবে বিবর্তনগত সুবিধার কারণেই পুরুষ ও স্ত্রী বিভাজন সৃষ্টি হয়ে যৌন প্রজনন চালু হয়েছে। যে সব অনুভূতি ও আচরণ বৈশিষ্ট যৌন প্রজননে সহায়ক হয়েছে সেগুলোই টিকে গেছে বেশি, কারণ তার ফলশ্রুতি পরিবেশে খাপ খাওয়াতে বেশি কাজে এসেছে, অধিকতর জেনেটিক সাফল্য দিয়েছে।

প্রশ্ন ২৮: আমরা দেখেছি অতীতে যতবার বড় বিলুপ্তি এসেছে, তার পরেই নূতন জীবের সমারোহ এসেছে। বিলুপ্তদের ভূবনগুলো খালি থাকেনি, বরং প্রাণিকূল উন্নততর হয়েছে। তা হলে বর্তমান জীববৈচিত্র বিলুপ্তি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন হচ্ছি কেন?

উত্তর : ঐ যে বিলুপ্তির পর নূতন সমারোহ সেটি দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাপার– লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যায় তার ফল আসতে। আমরা উদ্বিগ্ন হচ্ছি বিশাল আকারে জীব বৈচিত্র বিনষ্টি এখন যা ঘটছে, বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ে। এতে পৃথিবীর জীব জগতের ভারসাম্য এমনভাবে বদলে যাবে যে মানুষের জীবন যাত্রাই বিপন্ন হয়ে পড়বে কারণ এই ভারসাম্যের উপর আমাদের অনেক নির্ভরশীলতা রয়েছে। একই কথা অন্যান্য অনেক জীবের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিবর্তনের ফলে আবার সমারোহ আসার অনেক আগেই এতে পৃথিবী আমাদের জন্য বাসের অযোগ্য হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন ২৯: আমরা দেখেছি এক এক যুগে এক এক প্রাণি পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এখন মানুষরাই ভীষণ প্রতাপশালী। ভবিষ্যতে মানুষের জায়গা কি অন্য কেউ দখল করবে?

উত্তর : যেহেতু বিবর্তনকে এভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়না, কাজেই তার কোন নিশ্চিত উত্তর নাই। এটি নির্ভর করবে বর্তমানে যারা প্রধান অবস্থায় আছে তাদের, অর্থাৎ মানুষের সম্ভাব্য বিলুপ্তির অথবা অবক্ষয়ের উপর। বিবর্তনগত ভাবে এটি হবার সম্ভাবনা অনেক দীর্ঘ মেয়াদে। তাও মানুষের ক্ষেত্রে তার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কারণে তা প্রতিরোধ করার সুযোগ অনেক বেশি। কিন্তু মানুষের নিজের ভুলে বা দৈব দুর্ঘটনায় তেমনটি অনেক আগে ঘটাও বিচিত্র নয়।

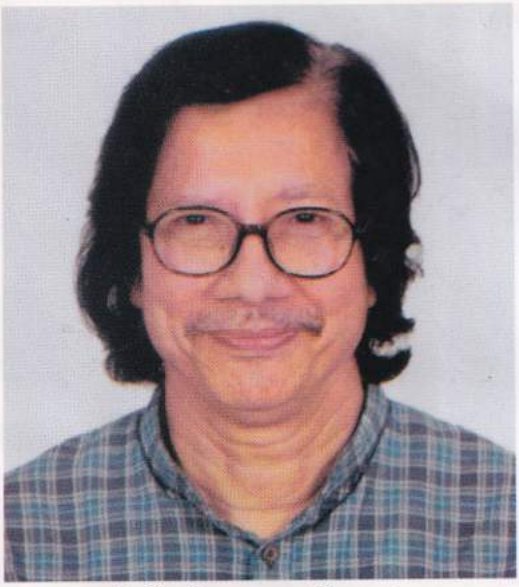
প্রশ্ন ৩০: স্থলের প্রাণির চেয়ে সমুদ্রের প্রাণির বিশালদেহী হবার সুযোগ বেশি, কারণ স্থলের প্রাণিকে তার দেহের পুরো ভার নিজের হাড়ের দ্বারা বহন করতে হয়, পানির প্লবতার কারণে সমুদ্রের প্রাণিকে তা করতে হয়না। বিশালতম প্রাণি তিমি তাই সমুদ্রেই থাকে। কিন্তু ডাইনোসরদের মধ্যে নয় দশটি হাতীর সমান অতি বিশাল প্রাণি স্থলেই কেমন করে সম্ভব হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ ডাইনোসরদের কোন কোনটি অতিকায় আকারের ছিল। তারা বড় হওয়াটাকেই আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে নিয়েছিল। কিন্তু এই কৌশল সমস্যামুক্ত ছিলনা। এত বিশাল দেহভার নিয়ে চলাফেরা করা ও পুষ্টি বজায় রাখা দুরূহ ছিল, টিকে থাকার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক ছিলনা। হয়তো ডাইনোসর বিলুপ্তিতে এই অতিকায় হওয়াটিও ভূমিকা রেখেছে। পরে স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রেও কোন কোনটি তত বড় না হলেও অতিকায় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই

ধারাটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যেমন এক সময় অত্যন্ত বিশালকায় এইপের বেশ প্রাচুর্য ছিল– জিগান্টোপিথেকাস ইত্যাদি। কিন্তু পরে বৃহৎ এইপদের দেহ একটি সীমার মধ্যে থেকেছে আজকের গরিলা বা শিম্পাঞ্জির মত। স্থলের প্রাণিতে এই সীমাটি শেষ পর্যন্ত এসে যায়।

প্রশ্ন ৩১: প্রাইমেটদের বিবর্তনে মানুষে এসে আমরা পশমহীন হয়ে গেলাম কেন?

উত্তর : পশম হচ্ছে প্রধানত প্রাণির দেহ তাপ সংরক্ষণ করার একটি কৌশল। শুরুর দিকের মানব সদৃশদেরও পশম ছিল। কিন্তু পরে হোমো ইরেকটাসরা উচ্চ বড়দেহী হয়ে দ্রুতগতির শিকারি হিসাবে গড়ে উঠছিল। তারা শরীরকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য ঘাম নি:সরণের কৌশলের দিকে গিয়েছে। এতে সুবিধার জন্য তখন থেকে পশম ত্যাগের প্রবণতা গড়ে উঠে। হোমো ইরেকটাসরা পরে শীতপ্রধান অঞ্চলে গেলেও তাদের মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নের ফলে আগুন, পশুচর্ম ইত্যাদি দিয়ে তারা দেহ উত্তাপ রক্ষা করতে পেরেছে। মানুষের পশম হারানোর ব্যাখ্যা সম্পর্কে এই তত্ত্বটিই বহু দিন যাবত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু অনেকে এ সম্পর্কে সন্দেহ শোষণ করছেন কারণ একই পরিস্থিতিতে অন্য অনেক প্রাণি ঠাণ্ডা হবার জন্য পশম ত্যাগ করেনি। ফলে বিষয়টি এখনো গবেষণার মধ্যে রয়েছে। এ সম্পর্কে বেশ কিছু বিকল্প তত্ত্বও দেয়া হচ্ছে যার কোনটিই এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।



ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে এবং দেশের তরুণ তরুণীদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক করার ক্ষেত্রে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। এজন্য তিনি লেখালেখি, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যবহার, বিজ্ঞান সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান বক্তৃতা ইত্যাদি সব মাধ্যম ব্যবহার করেছেন গত পাঁচ দশক ধরে। 'মহাশূন্যে মানুষ' এই পুস্তকমালাটিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেয়া তাঁর একটি বিজ্ঞান বক্তৃতামালার ভিত্তিতেই রচিত। ষাটের দশকে তিনি এদেশের প্রথম জনপ্রিয় বিজ্ঞান মাসিক 'বিজ্ঞান সাময়িকীর' প্রতিষ্ঠা করেন, যা তাঁরই সম্পাদনায় এখনো প্রকাশিত হচ্ছে। সত্তরের দশকের শেষের দিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস), নিজে কর্ণধার থেকে যাকে তিনি পল্লী-বাংলার সুবিধাবঞ্চিত তরুণ তরুণীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা ও হাতে কলমে জীবিকামুখি প্রযুক্তির বিস্তারে একটি সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন।

বিজ্ঞান সাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার সহ বিভিন্ন স্বীকৃতি প্রাপ্ত এই লেখকের লেখনী শুধু তাঁর নিজের বিষয় পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং আধুনিক বিজ্ঞানে অতি ফলপ্রসূ বিভিন্ন শাখার অগ্রগতি নিয়ে তাঁর বুঝিয়ে বলার প্রচেষ্টা ও লেখার স্বচ্ছন্দ গতি রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক বই এবং প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক। বাংলাদেশে বিজ্ঞান চেতনা, বিজ্ঞান সাহিত্য, তরুণ তরুণীদের সক্রিয় বিজ্ঞান আন্দোলন কী ভাবে এগিয়েছে, তাঁর সম্পাদিত 'বিজ্ঞান সাময়িকীতে' এবং তাঁর রচনায় তার একটি ধারাবাহিক আলেখ্য পাওয়া যায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক।